যুগপ্রবর্ত্তক বিবেকানন্দ

(ধারাবাহিক জীবনী-গ্রন্থ)

স্বামী অপূর্বানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাঁকুড়া

প্রকাশকের নিবেদন

যুগাচার্য যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকীর প্রস্তুতি ও উদ্যোগ চলিতেছে। এই উপলক্ষে সারা বিশ্বে মানবপ্রেমিক স্বামীজীর জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলাপ অলোচনা বক্তৃতা গবেষণাদি চলিতে থাকিবে। শুধু ভারতে নয়, পাশ্চাত্যের আমেরিকা ইওরোপ প্রভৃতি দেশেও তাঁহার জীবনী ও বাণী প্রকাশিত হইতেছে। তথাপি আমাদের মনে হয় স্বামীজীর বহুমুখী প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অতি সামান্য তথ্যই প্রকাশিত হইবে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাঁহার দেবচরিত্র ও কর্মবহুল জীবন এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে তাঁহার অবদানের একটি অতি সুন্দর ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

কবি রবীন্দ্রনাথ স্বামীজীর গুরু রামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন : "বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা, ধেয়ানে তোমার মিলিত হ'য়েছে তারা। তোমারি জীবনে অসীমের লীলাপথে, নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।" এই নূতন তীর্থ আর কিছুই নয়, ইহা সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী ও শিবজ্ঞানে জীবসেবা। যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ গুরুর এই দুইটি মহান আদর্শ জগতে প্রচার করিয়াছেন। ধর্মসমন্বয়ের বাণী সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে; শিবজ্ঞানে জীবসেবা দ্বারা বেদান্ত কর্মজীবনে রূপায়িত হইয়াছে—বনের বেদান্ত ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত 'জীবে দয়া' এবং যীশু-কথিত 'প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসা'র আদর্শের উপর স্বামীজীর 'জীবশিব'বাদ এক অপূর্ব ও অভিনব আলোকসম্পাত করিয়াছে। তাই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন : "বহুরূপে

সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥"

স্বামীজীর স্বদেশ-প্রেমও ছিল অনুপম। ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তিনি কতই না ভাবিতেন। উদাত্তকণ্ঠে বলিয়াছেন : "আগামী পঞ্চাশ বৎসর দেশমাতৃকাই তোমাদের ভগবান হউক ; অন্যান্য দেবতারা এখন ঘুমাইতেছেন।" আমেরিকায় ভোগৈশ্বর্যের প্রাচুর্যের মধ্যে তিনি আরামের বিছানা ছাড়িয়া ঘরের মেজেতে কত বিনিদ্র রজনী কাঁদিয়া কাটাইয়াছেন স্বদেশের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে! তাঁহার অগ্নিগর্ভ বাণী পাঠ করিয়া অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ, পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতি বিংশ শতকের কত স্বদেশপ্রেমিক স্বদেশসেবায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, কত শত বীর বিপ্লবী স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন!

সর্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় লিখিত তত্ত্ব ও তথ্যবহুল এই পুস্তকখানি স্বামীজীর শতবর্ষ-জয়ন্তীর প্রস্তুতি হিসাবে সর্বত্র সমাদৃত হইলে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করিব। এই গ্রন্থের সমগ্র আয় বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের শ্রীশ্রীঠাকুর-সেবাতে উৎসর্গ করা হইল।

প্রকাশক

প্রস্তাবনা

স্বামী বিবেকানন্দ ষাট বৎসর হ'ল পৃথিবী থেকে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর জীবন ও বাণীর প্রেরণা এখনও সজীব রয়েছে এবং উত্তরোত্তর দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হচ্ছে ও সকল স্তরের মানুষকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। মাত্র উনচল্লিশ বৎসর তিনি বেঁচে ছিলেন। এই অল্প পরিমিত জীবনে তিনি যা সম্পন্ন ক'রেছিলেন তা সত্যই অমানুষিক। তাঁর গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সম্বন্ধে যে সব অলৌকিক দর্শন ক'রেছিলেন তা যে আদৌ কাল্পনিক নয়, স্বামীজীর জীবনী-অনুসন্ধিৎসু এবং চিন্তাশীল পাঠকের কাছে তা সহজেই প্রতিভাত হ'বে।

স্বামীজীর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনা পরিব্রজ্যা, তাঁর অপূর্ব পবিত্র চরিত্রগভীর পাণ্ডিত্য বাগ্মিতা প্রখর স্বদেশ প্রেম, দীন দরিদ্র নির্যাতিত ও অবহেলিতের প্রতি তাঁর উদ্বেল সহানুভূতি, তাঁর তেজ বীর্য জ্ঞান বৈরাগ্য মানব-সেবা, তাঁর ভারতীয় জাতীয়তার উদ্বোধন, বিশ্বহিতে আত্মনিয়োগ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে চিন্তাজগতে তাঁর অবদান ইত্যাদির প্রত্যেকটিই স্বকীয় মহত্ত্ব সৌন্দর্য ও গভীরতা নিয়ে আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে। তাঁর অপূর্ব জীবন সকল দেশের সর্বকালের অনুশীলনযোগ্য। সমাজের নানাস্তরের লোক তা থেকে প্রচুর শিক্ষা ও উদ্দীপনা লাভ করতে পারে। একাধারে এত শক্তি ও সদ্‌গুণের সমাবেশ বিরল কোনও ব্যক্তিতে দেখা যায়। স্বামীজী ছিলেন প্রকৃতই একজন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ।

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বাংলাদেশের, তেমনি ভারতবর্ষের, তেমনি সারা জগতের। তাঁর জীবনে ভৌগলিক কোন গণ্ডি-রেখা ছিল না। চিন্তা ভাব

ও কার্যের গভীরতা ও ব্যাপকতা পাশাপাশি তাঁর চরিত্রে যেরূপ লক্ষিত হয়, তা একান্তই দুর্লভ। তিনি যেন এক নূতন যুগের আদর্শ-মানুষের ছাঁচ। কি তরুণ কি প্রবীণ, কি পুরুষ কি নারী, কি ভারতীয় কি বৈদেশিক প্রত্যেকের জন্য তাঁর একাধিক সুস্পষ্ট কল্যাণবাণী রয়েছে। তাঁর মতে লোকশিক্ষক পৃথিবীর ইতিহাসে বেশী পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন যুগপ্রবর্তক।

স্বামীজীর আবির্ভাব ঘটেছিল বহুশতাব্দীর জন্য নিপীড়িত ভয়ত্রস্ত বিদ্বেষ ও ঘৃণায় বিচ্ছিন্ন মানুষকে মুক্তি অভয় ও একতার আলোক দেখাবার জন্য। এই আলোক যেমন ভারতে প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পৃথিবীর সর্বত্র। এই আলোক তিনি এনেছিলেন তাঁর মহানগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন থেকে, ভারতবর্ষের বেদান্ত বা উপনিষদ থেকে—যা জীমূতমন্দ্র স্বরে ঘোষণা করে মানবাত্মার শাশ্বত মহিমা। প্রত্যেক মানুষই ভগবানের প্রতীক—ভগবানের অংশ—'জীব-শিব'। মানবাত্মা চিরমুক্ত এবং সর্বভয় ও মোহের অতীত, মানবাত্মার প্রতিষ্ঠা সর্বাবগাহী আত্মীয়তায়, ভালবাসায়। স্বামীজীর নিজের জীবন ছিল এই উপনিষদ্‌বাণীর উজ্জ্বল উদাহরণ।

স্বাধীন ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর ভূয়িষ্ঠ আলোচনা ও অনুশীলন আজ একান্ত আবশ্যক। পনর বৎসর স্বাধীনতা লাভ করবার পরও যে সকল সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনকে চেপে রেখেছে এবং কিছুতেই যার সমাধান আমরা খুঁজে পাচ্ছিনে, ঐ সকল সমস্যা মীমাংসার বহু সঙ্কেত আমরা স্বামীজীর জীবন ও বাণী থেকে লাভ করতে পারি। তিনি যদিও রাজনৈতিক ছিলেন না, তথাপি ভারতীয় জাতীর সংগঠন একতা ও বলাধানের জন্য তিনি সুচিন্তিত অনেক নির্দেশ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। দেশ-কর্মী ও দেশনেতাদের অনেক সাবধানবাণীও তিনি শুনিয়েছেন। এগুলিও বিশেষভাবে অনুধাবনের সময় এসেছে।

স্বামী বিবেকানন্দকে পুরাণো ইতিহাসের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখা কিছুতেই সঙ্গত নয়। বিংশ শতাব্দীর অপরার্ধে যে সকল ভাবধারা ও ঘটনাপরম্পরার সূচনা দেখা যাচ্ছে স্বামীজী যেন তাঁর সবগুলিকেই তাঁর অলৌকিক দূরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ ক'রেছিলেন, শুনিয়েছিলেন সতর্কবাণী এবং দিয়েছিলেন পথের নির্দেশ। তাই এ যুগের মানুষের তিনি একজন অন্তরঙ্গ কল্যাণ-সহচর। আমাদের সম্মুখযাত্রা সংগ্রাম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সমূহের মধ্যে এই অলোক-সামান্য শক্তিমান পুরুষপ্রবরকে নিয়ে যদি আমরা চলি তা'হলে আমাদের লাভ ছাড়া লোকসান নেই। স্বামীজীকে যুগপ্রবর্তক বলা আলঙ্কারিক প্রয়োগ নয়, উহা আক্ষরিক ভাবে সত্য।

বর্তমান গ্রন্থখানি স্বামী বিবেকানন্দের আসন্ন জন্ম শত বার্ষিকীর প্রাক্‌কালে বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাকে এই মহামানবের প্রতি কিছুমাত্রও আকৃষ্ট করলে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধন ক'রে দিয়ে আমাদের উৎসাহিত ক'রেছেন। তাঁর কাছে আমরা বিশেষ ঋণী। এ গ্রন্থ-প্রণয়নে আরো অনেকের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। সকলকেই অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্বামী অপূর্বানন্দ

বিঃ বিঃ—সাড়ে তিন মাস পূর্বে গ্রন্থখানি যখন প্রেসে দেওয়া হয় তখন 'যুগাচার্য বিবেকানন্দ' নামেই দেওয়া হ'য়েছিল। এবং ঐ নামটি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজই মনোনয়ন ক'রেছিলেন। কিন্তু বই ছাপা যখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে তখন উদ্বোধন, শারদীয়া সংখ্যায় 'যুগাচার্য বিবেকানন্দ' নামে একখানি বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখে এ গ্রন্থখানির নাম পরিবর্তন ক'রে "যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ" রাখতে হ'ল। ১৩ ফর্মা হ'তে ঐ নামই ব্যবহার করা হ'য়েছে।

—গ্রন্থকার

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ১

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥২

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথ
বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মোপনিষদং।
মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ-
নিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে
য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥৩

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥৪

যুগাচার্য বিবেকানন্দ

এক

একটি বিশাল বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে যখন ওর বিপুল পরিধির দিকে আমরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি, তখন কি ভাবতে পারি যে একদিন একটি সর্ষপ-পরিমিত ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে এই বৃক্ষটি লুকিয়ে ছিল? তেমনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুআরি (বাংলা ১২৬৯, ২৯শে পৌষ) কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে কলিকাতা সিমলা পল্লীতে বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবীর প্রথম পুত্ররূপে যে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল কে তখন জানতো যে ভবিষ্যতে তার ৩৯ বৎসরের জীবনে এমন আশ্চর্য প্রতিভা ও মহাশক্তি বিকশিত হবে, যার প্রভাব দেশ ও কালের গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে না—যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেষ্টনীতে বিভিন্ন নরনারীর প্রাণে জাগিয়ে যাবে নির্ভীক কল্যাণসাধনার আবেদন, মানবাত্মার শাশ্বত মহিমা, সত্য ন্যায় মৈত্রীর জীবন্ত অনুপ্রেরণা।

কমনীয় কান্তি ঐ দেবশিশুটি ক্রমে যখন প্রিয়দর্শন প্রতিভামণ্ডিত শৌর্য বীর্য পরাক্রমে নরশার্দূলতুল্য ও সৌরভময় তরুণ যুবকরূপে রূপান্তরিত হ'ল, তখনো কেউ ভাবতে পারেনি যে, এই নরেন্দ্রনাথ দত্তই হবে বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ।

১৮ বৎসরের নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু চিনেছিলেন। তিনি জেনেছিলেন নরেন্দ্র কে এবং কেন জন্মেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যোগ-দৃষ্টির সামনে নরেন্দ্রের সমগ্র জীবনের চিত্রটি দিবালোকের মতো প্রকাশিত হয়ে উঠেছিল।...

একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরে কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মনেতারা বসে আছেন। যুবক নরেন্দ্রনাথ, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি অনেক ভক্তও উপস্থিত। নানা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হল।... কেশব বিজয় প্রভৃতি বিদায় নেবার পরে নরেনের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, "দেখলুম, কেশব যে শক্তিবিশেষের উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হয়েছে, নরেনের ভিতর তেমনি আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।..." আরো বললেন, "দেখলুম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আর নরেনের ভিতর জ্ঞান-সূর্য উদিত হয়ে মায়া মোহের লেশ পর্যন্ত বিদূরিত করেছে।"

নরেন্দ্রনাথ তা শুনে তাঁর মুখের উপরই প্রতিবাদ ক'রে বলেছিলেন, "মশাই, করেন কি? এসব কথা বললে লোকে আপনাকে পাগল বলবে নিশ্চয়। কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব সেন, মহামনা বিজয় গোস্বামী, আর কোথায় আমার মতো নগণ্য একটা কলেজের ছোকরা! আপনি এঁদের সঙ্গে তুলনা করে আর কখনো এমন সব কথা বলবেন না।"

স্মিতহাস্যে ঠাকুর বললেন, "কি করব রে! তুই কি ভাবিস্ আমি ওরূপ বলছি! মা (জগদম্বা) আমায় দেখালেন, তাই তো বলেছি।"

নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক অলৌকিক দর্শন হয়। তা থেকেই তিনি নরেন্দ্রের স্বরূপসম্বন্ধে জানতে পারেন। তিনি বলেছিলেন, "...একদিন দেখছি মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময়বর্ত্মে ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে। চন্দ্রসূর্য-তারকামণ্ডিত স্থূল জগৎ সহজে অতিক্রম ক'রে মন প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হ'ল।...নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তি পথের দু'পাশে অবস্থিত দেখলুম। ক্রমে মন উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উপনীত হ'ল। সেখানে দেখলুম এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান

প্রসারিত থেকে খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করে রেখেছে।...কিন্তু পরক্ষণেই দেখতে পেলাম দিব্যজ্যোতিঃঘনতনু সাতজন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হয়ে বসে আছেন। বুঝলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে এঁরা মানব তো দূরের কথা দেবদেবীদের পর্যন্ত অতিক্রম করেছেন। বিস্মিত হয়ে এঁদের মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করছি, এমন সময় দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্র-বিরহিত সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হয়ে দিব্যশিশুর আকারে পরিণত হ'ল। ঐ দেবশিশু এঁদের অন্যতমের নিকট আগমন পূর্বক সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা তাঁর কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করল; পরে বীণাবিনিন্দিত নিজ অমৃতময়ী বাণীতে সাদরে আহ্বান ক'রে তাঁকে সমাধি থেকে প্রবুদ্ধ করার অশেষ প্রযত্ন করতে লাগল। সুকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হতে ব্যুত্থিত হলেন এবং অর্ধস্তিমিত নির্নিমেষ লোচনে দেখতে লাগলেন সেই অপূর্ব বালককে। ঋষির মুখের প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব দেখে মনে হ'ল, বালক যেন তাঁর বহুকালের পরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেবশিশু তখন অসীম আনন্দ প্রকাশ ক'রে তাঁকে বললেন, 'আমি যাচ্ছি, তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

ঋষি তার ঐ অনুরোধে কোন কথা না বললেও তাঁর প্রেমপূর্ণ নয়ন অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করল। পরে ঐরূপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে তিনি পুনরায় সমাধিমগ্ন হলেন। তখন বিস্মিত হয়ে দেখি, তাঁরই শরীর-মনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হয়ে বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করছে। নরেন্দ্রকে দেখবামাত্রই বুঝেছিলাম, এই সেই ঋষি।" *

* শ্রীরামকৃষ্ণদেবই স্বয়ং ঐ দেবশিশুর আকার ধারণ ক'রে সপ্তর্ষি-মণ্ডলের অন্যতম ঋষির গলা জড়িয়ে ধরে তাঁকে তাঁর লীলাসহচররূপে নরদেহে অবতরণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

আরো বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, "নরেন্দ্র যেন সহস্রদল কমল। এত সব লোক এখানে আসছে, নরেন্দ্রের মতো কিন্তু আর একজনও এল না।"...

* * *

কণ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশীপুর উদ্যানে অবস্থান করছেন। জীবকল্যাণরূপ কাজ সমাপ্ত ক'রে তিনি এবার মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুত। ঐ কঠিন অসুখের মধ্যেও তাঁর বিশ্রাম নেই। বিশেষ ক'রে ত্যাগী শিষ্যদের যুগচক্রপরিচালনার জন্য প্রস্তুত করছেন—সাধনভজন ত্যাগতপস্যার মাধ্যমে। নরেন্দ্রনাথের মনেও তখন নির্বিকল্প সমাধিতে অধিরূঢ় হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তিনি শ্রীঠাকুরকে নেহাৎ পেড়াপীড়ি করে বললেন, "আমার ইচ্ছা হয় শুকদেবের মতো একেবারে পাঁচ ছয় দিন সমাধিতে ডুবে থাকি। তারপর শুধু দেহরক্ষার জন্য একটু নীচে নেমে এসে আবার সমাধিতে ডুবে যাই।"

নরেন্দ্রের আর্তি শুনে অকস্মাৎ শ্রীঠাকুরের ভাবান্তর হ'ল। তিনি তিরস্কারের সুরে বললেন, "ছি ছি! তুই এত বড় আধার। তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলুম তুই একটা বিশাল বটবৃক্ষের মতো হবি, তোর ছায়ায় সহস্র সহস্র নরনারী আশ্রয় পাবে—তা না হয়ে কিনা তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস।..."

নরেন্দ্র বুঝলেন ঠাকুরের হৃদয় কত মহান্। অনুশোচনায় অন্তর ভরে গেল। তিনি তিরস্কৃত হয়ে নীরবে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথের এ প্রার্থনাও পূর্ণ করেছিলেন ঠাকুর। এ ঘটনার কয়েকদিন পরেই এক সন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথ ধ্যানে বসেছেন কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে। ক্রমে তাঁর মন নির্বিকল্প ভূমিতে চলে গেল। দেহ স্থাণুবৎ স্থির, বাহ্যতঃ মৃতবৎ। দেহাতীত সচ্চিদানন্দসত্তায় তিনি ডুবে গেলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল। স্পন্দহীন গভীর সমাধিতে মগ্ন। নরেন্দ্রনাথের ঐ অবস্থা দেখে

জনৈক গুরুভ্রাতা ভয় পেয়ে ত্রস্তব্যস্ত ভাবে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললেন, "নরেন মরে গেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপরেই ছিলেন। নীচের ঘরে নরেন্দ্রনাথ সমাধিস্থ। তিনি জানতেন সব। শুধু বললেন, "বেশ হয়েছে। থাক্ খানিক্ষণ ঐ অবস্থায়। এরই জন্য আমায় কেবল জ্বালাতন করছিল।"

অনেক রাত্রে নরেন্দ্রের সমাধি ভঙ্গ হ'ল। তখনও কিন্তু দেহভূমিতে মন নামছে না। তিনি ঐ অবস্থায় বললেন, "আমার শরীর কই?"...ধীরে ধীরে সহজাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে গেলেন তিনি ঠাকুরের কাছে উপরের ঘরে। সমাধির বিশ্রান্তিতে পরিপূর্ণ তাঁর মন। নতমুখে দাঁড়িয়েছেন ঠাকুরের সামনে। তাঁকে দেখেই শ্রীঠাকুর বললেন গম্ভীর স্বরে, "কিরে, এবার তো মা তোকে সব দেখিয়ে দিয়েছেন। যা দেখেছিস, সে সব এখন বন্ধ রইল। এখন তোকে মা'র কাজ করতে হবে। মা'র কাজ শেষ হ'লে আবার এ অবস্থা ফিরে পাবি।"

নরেন্দ্রের চিত্ত অক্ষয় প্রশান্তিতে পূর্ণ। নীরবে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।—তাই তো নরেন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দরূপে যোগারূঢ় হয়ে এত কাজ করেছিলেন সারা বিশ্বে। ভগীরথ যেমন সুরনদীকে মর্তে এনেছিলেন, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণও সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষিকে ধ্যানভূমি হতে নামিয়ে এনেছিলেন নররূপে—জগত্রাণের জন্য। সমগ্র জগৎ বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষ, বিবেকানন্দের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে চিরঋণী।.. ঐ যে চাবি-কাঠিটি নিজের হাতে রেখে সমাধিপথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন, তাতে করেই বিবেকানন্দের বিশ্বপ্রেমিক রূপ, তিনি জীবদুঃখকাতর আর্তত্রাতা বিবেকানন্দ।...

তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। তাঁর ভিতর দিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর যুগধর্ম সম্যকরূপে স্থাপিত করেছেন- প্রচারিত করেছেন সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা আক্ষরিকভাবে সত্য হয়েছে। স্বামীজী কি ছিলেন এবং বিশ্বের কল্যাণের জন্য তিনি কি করেছেন, তা দেখবার ও ভাববার সময় এসেছে। তিনি বলেছিলেন, "যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত, তবে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কি ক'রে গেল।"

তিনি আরো বলেছেন, "...যা দিয়ে গেলুম দেড় হাজার বৎসরের খোরাক।" বিশ্ববাসীর জন্য চিন্তাজগতে দেড়হাজার বছরের খোরাক তিনি দিয়ে গিয়েছেন। স্বামীজী সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা বিশ্বভ্রাতৃত্ব বিশ্বমানবতা ও সর্বোপরি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে ভাবরাশি দিয়েছেন জগতের কল্যাণের জন্য, বিশ্বশান্তির জন্য, তা এখন ক্রমে বিভিন্ন আধারের ভিতর দিয়ে কার্যকর হচ্ছে। স্বামীজীর অমোঘ ভাবধারাই সমগ্র বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উদ্দীপনা দিচ্ছে। তিনি ভাবরূপে জাগ্রত রয়েছেন—অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন শত শত প্রাণে।

* * *

পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের বড় এটর্নি—প্রখর বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ মেধা। বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান গরিমায় অনুপম। তিনি একটি মহদুদার মন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।...বাইবেল ও ফার্সি কবি হাফেজের বয়েৎ-এর উপর তাঁর বিশেষ অনুরাগ। প্রচুর অর্থোপার্জন করতেন, তেমনি ব্যয়ও ছিল অকৃপণ হস্তে। দান ও পরোপকারও ছিল খুব। তিনি লোকজনকে খাওয়াতে ভালবাসতেন। রান্নায় ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। তাঁর এত দয়া ছিল যে, বহু গরীব ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়দের পালন করতেন সযত্নে। তাদের নেশাভাঙ্গের পয়সা দিতেও তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। বড় হয়ে নরেন্দ্র যখন ঐ অযোগ্য লোকদের ভরণপোষণে আপত্তি জানান, তখন বিশ্বনাথ দত্ত বলেছিলেন, "জীবনটা যে কত দুঃখের তা এখন কি বুঝবি? যখন বুঝতে পারবি, তখন এ দুঃখের হাত থেকে ক্ষণিক নিষ্কৃতি পাবার জন্য যারা নেশাভাঙ্গ করে, তাদেরও দয়ার চক্ষে দেখবি।"

বিশ্বনাথ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন—কবিতাও ভালবাসতেন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের অন্তরালে ছিল একটি স্নেহপ্রবণ প্রাণ। ঐ স্নেহ ও অনুকম্পা হ'তে কেউই বঞ্চিত হ'তনা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দাসদাসী গাড়ি-ঘোড়া আমলা-গোমস্তা প্রভৃতি লোকজন রাখতেন। তাতে ক'রে অনেক গরীব লোক প্রতিপালিত হ'ত তাঁর গৃহে।...

মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর চরিত্র ছিল অনুপম। তিনি রমণীকুলের রত্ন-স্বরূপা ছিলেন। তাই তো তিনি হতে পেরেছিলেন রত্নগর্ভা। হিন্দুসমাজে নারীরা শক্তির মূল উৎস। তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রভাবই বিশেষ ক'রে পড়ে সন্তানদের উপর।* ভুবনেশ্বরী দেবী বিশেষ বুদ্ধিমতী কর্মকুশলা ও ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। দেহ মনের সৌন্দর্য তাঁকে সবজনপ্রিয় করেছিল। স্বামীর ধর্মভাবের সঙ্গে তাঁর সর্বাংশে মিল ছিলনা। তিনি দেবদেবীতে বিশ্বাস-পরায়ণা ছিলেন, পূজা অর্চনাদি করতেন, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি তাঁর কণ্ঠস্থ—পুরো-পুরি হিন্দুরমণী। তাঁর মতো তেজস্বিনী ও সর্বগুণসম্পন্না নারী বিরল।...

পর পর চারটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। দুটি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। একটিও ছেলে হচ্ছে না। সেজন্য বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবী উভয়েই বিশেষ অসুখী। একটা বড় অভাববোধ তাঁদের অন্তরকে সদা পীড়িত করত। ভুবনেশ্বরী দেবী প্রাণের বেদনা একান্তে জানাতেন তাঁর

* স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্তিকালে বলেছিলেন, 'আমার জ্ঞানের বিকাশের জন্য আমি মা'র কাছে ঋণী"। আরো বলেছেন, "যে মাকে সত্য সত্য পূজা করতে পারে না, সে কখনও বড় হতে পারে না।" পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি জগতের কাছে আর্যসভ্যতার একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। উপনিষদের কথা—"পিতৃদেবো ভব মাতৃদেবো ভব।"

আরাধ্য দেবতার কাছে। তিনি শুনেছিলেন—আশুতোষ শিবের প্রসন্নতায় তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হতে পারে। তাই তিনি শিবপূজায় ব্রতী হলেন। কাশীর ৺বীরেশ্বর শিব জাগ্রত দেবতা। তিনি তাঁর এক নিকট আত্মীয়াকে একটি পুত্রের মানত ক'রে প্রত্যহ বীরেশ্বরের পূজা দেবার অনুরোধ জানালেন।

এদিকে ভুবনেশ্বরী দেবীও শিবপূজা, শিবের ধ্যান ও শিবনাম জপে দিনের পর দিন তন্ময় হয়ে গেলেন। কাতর প্রার্থনায় তাঁর অন্তর ভরে গেল। সর্বক্ষণ সকল কাজের ভিতরেও তাঁর মনটি প্রার্থনারত হয়ে থাকত। এই ভাবে সম্বৎসর অতীত হল।

একরাত্রে অপূর্ব স্বপ্ন দেখলেন ভুবনেশ্বরী দেবী। দেখলেন—দেবাদিদেব মহাদেব যোগনিদ্রা হ'তে ব্যুত্থিত হয়ে শিশুরূপে তাঁর কোলে আশ্রয় নিয়েছেন।...দিব্যানন্দে পুলকিত তনু! সহসা তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। ততক্ষণে হিমগিরিসন্নিভ জ্যোতির্ময় দেবতাও অন্তর্হিত হয়েছেন। তিনি ভক্তিআপ্লুতচিত্তে চন্দ্রমৌলীশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন—"শিব শিব! হে করুণাময় কৃপানিধি।"...

সে দিন পৌষসংক্রান্তি। সোমবার—শিবের বার, মকর সপ্তমী। কলিকাতা নগরী উৎসব-মুখরিত। মকরবাহিনীর পুণ্য স্নানে চলেছে দলে দলে নরনারী। সূর্যোদয়ের কিছু পরে ভুবনেশ্বরীর কোল আলোকিত ক'রে ভুবনমঙ্গল দেবশিশুর আবির্ভাব হ'ল। দত্তগৃহ আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ। বেজে উঠল মঙ্গল শঙ্খ। হুলুধ্বনি ক'রে পুরনারীগণ বরণ ক'রে নিল নবজাতককে।

দেবশিশুর মতো ছেলেকে দেখে ভুবনেশ্বরী দেবী বুঝলেন—দেবস্বপ্ন সফল হয়েছে। স্বয়ং বীরেশ্বরই এসেছেন শিশুরূপে।...

জননী নাম রাখলেন বীরেশ্বর। ডাক নাম 'বিলে'। অন্নপ্রাশনের সময় নাম হ'ল নরেন্দ্রনাথ।

* * *

প্রভাতেই সূচিত হয় দিনের প্রকাশ; বালকের মধ্যেই নিহিত থাকে ভাবী মানবের বিপুল সম্ভাবনা। বালকটি যেমন যেমন বড় হ'তে লাগল, তেমনি বিকশিত হ'ল তার জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি। শিশুর ভিতর বিশ্ব-আলোড়নকারী যে শক্তি ছিল, তা-ই আত্মপ্রকাশ করতে লাগল নানা ছন্দে, নানা ভঙ্গীতে। অতটুকু তো বালক, কিন্তু তার দৌরাত্ম্যে সকলে অস্থির। খুব একরোখা। যা ধরবে কোন বাধাতেই তা থেকে বিরত হবে না। শাসনবাক্য বকুনি ভয়প্রদর্শন প্রহার সবই বৃথা হ'ত। মাতা অশান্ত পুত্রকে কোলে নিয়ে বলতেন, "অনেক মাথা খুঁড়ে শিবের কাছে একটি ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন একটা ভূত।"

অনেক ভেবেচিন্তে তিনি একটা উপায় উদ্ভাবন করলেন ছেলেকে শান্ত করার। 'শিব'-মন্ত্র জপ করতে করতে মাথায় জল ঢেলে দিলেই বালক একেবারে শান্ত হয়ে যেত। কখনো বা ভয় দেখিয়ে ভুবনেশ্বরী দেবী বলতেন, "দেখ বিলে, অমনধারা দুষ্টুমি করিস তো শিব তোকে আর কৈলাসে যেতে দেবেন না।" বালকও সভয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অমনি চুপ হয়ে যেত।

পরবর্তিকালে বিলের ছেলেবেলার দৌরাত্ম্যের কথা পাশ্চাত্য শিষ্যদের কাছে বলতে গিয়ে বৃদ্ধা ভুবনেশ্বরী দেবী গর্বভরে বলেছিলেন, "কি বল গো! তাকে সামলাবার জন্য দুটো ঝি অষ্টপ্রহর তার সঙ্গে ঘুরত।" তিনি আরো বলেছিলেন, "ছেলেবেলা থেকেই নরেনের একটা মস্ত দোষ ছিল। রেগে গেলে আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত না। বাড়ির আসবাবপত্র সব ভেঙ্গেচুরে তছনছ করত।"...

বিলে একটু বড় হয়েছে। তিন চার বৎসর বয়স। বাবা মায়ের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে গাড়ি ক'রে। বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "বিলে, তুই বড় হয়ে কি হবি বল্ দেখি ?"

বিলে মাথা উঁচু ক'রে জবাব দিল, "সহিস কিংবা কোচম্যান হব।" জরির পাগড়ি পরা কোচম্যান—নরেন্দ্রের কাছে এক বিস্ময়কর ব্যক্তি। বেগবান্ দুটি তেজস্বী অশ্বকে সংযত ক'রে চালানো কি কম কথা !

ছেলেবেলা থেকেই গরীব দুঃখী ও সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি নরেন্দ্রনাথের বিশেষ টান। গরীব দেখলেই আর কিছু দেবার না পেলে তিনি নিজের পরণের কাপড়খানি খুলে দিয়ে দিতেন। তাতেই পরম তৃপ্তি। * সময় সময় কৌপীন প'রে সন্ন্যাসীর সাজে সাজতে ভালবাসতেন।

মায়ের মুখে রামায়ণের কথা শুনে নরেন্দ্রনাথ রামসীতার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ হলেন। বাজার থেকে সীতারামের মূর্তি কিনে এনে চিলের ছাদের ঘরে পূজা করতেন নিবিষ্টভাবে।...

বাড়িতে অনেক পোষা পাখী ছাগল ময়ূর কাকাতুয়া পায়রা, কতকগুলি বিলিতী ইন্দুর, একটি দুধেল গাই, আবার বানরও আছে একটি। দুটি তেজস্বী ঘোড়া। সকলের সঙ্গেই নরেন্দ্রের খুব ভাব। কোচ্যমান ও সহিস তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। কত সুখদুঃখের আলাপ তাদের সঙ্গে। একদিন সহিস বললে, বিবাহ করা মহা বিপদ। বিবাহের দিন থেকে তার সাংসারে নানা অশান্তি ও দুঃখ কষ্ট। সমবেদনায় নরেন্দ্রের প্রাণ ভরে উঠল। বিবাহই যত দুঃখের কারণ। রামচন্দ্র যে এত দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন জীবনে, তাও তো বিবাহ

---

* স্বামীজী আমেরিকা থেকে একপত্রে লিখেছিলেন, "... না আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিক নই। না না আমি সাধুও নই। আমি গরীব, গরীবদের আমি ভালবাসি।" সমগ্র বিশ্বের গরীবদের জন্য তিনি অশ্রুবিসর্জন করেছেন। গরীবের কল্যাণসাধনই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত।

করেছিলেন ব'লে। বালকের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল বিবাহের উপর। তিনি যে রামসীতাকে পূজা করেন, তাঁরাও যে বিবাহিত! কি ক'রে এ রাম-সীতাকে তিনি পূজা করবেন? এক অব্যক্ত বেদনায় তাঁর মনপ্রাণ ভরে উঠল। দিশেহারা হয়ে গেলেন মায়ের কাছে। মায়ের বুকে মুখটি গুঁজে কেঁদে কেঁদে জানালেন মনোবেদনা। সান্ত্বনার সুরে ভুবনেশ্বরী দেবী বললেন, "তাতে আর কি হয়েছে রে বিলে? তুই শিবপূজা করবি!"...

সন্ধ্যার আবছা আলোকে গেলেন ছাদের ঘরে। সীতারামের যুগলমূর্তির দিকে অনিমেষনয়নে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে দু'হাতে তুলে রাস্তার উপর ফেলে দিলেন সেই মূর্তি!..পরদিন সেখানে বসালেন শিবের বিগ্রহ! ঐ মূর্তির সামনে বসে অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে ধ্যান করেন। একদিন সঙ্গীদের নিয়ে খেলার ছলে গায়ে ছাই মেখে তিনি ধ্যানে বসেছেন। খানিকপরে এক বালক চেঁচিয়ে উঠল—"সাপ সাপ।" সঙ্গীরা সকলেই দরজা খুলে পালাল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ধ্যানমগ্ন। সাপ বা কোলাহল তিনি কিছুই জানতে পারেন নি। গোলমাল শুনে সকলে ছুটে এসেছে। সাপ দেখে সকলেই বিশেষ শঙ্কিত। এখন উপায়! বিলেকে বাঁচানো যায় কি করে? সাপকে তাড়া করলে পাছে অনিষ্ট করে সেই ভয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সকলে।

একটু পরেই ফণা গুটিয়ে সাপটা চলে গেল। অনেক চেষ্টা করেও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। নরেন্দ্র তখনো ধ্যানমগ্ন। তাঁকে ধরাধরি ক'রে ঘরের বাইরে আনা হ'ল। সব শুনে তিনি বললেন, "আমি তো কিছুই টের পাইনি!"

"নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ"—বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, "যে দিন জানতে পারবে সে কে, সে দিন আর এ সংসারে থাকবে না। দৃঢ়সঙ্কল্পবলে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ শরীরত্যাগ করবে।"

যে বিবেকানন্দ ছুৎমার্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছিলেন *—বাল্যকাল হ'তেই জাতিভেদ ও জাতিবিচার সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ কৌতূহল ছিল। ঐ বয়সেই তিনি প্রবীণের মতো নানা প্রশ্ন ক'রে মা'কে ব্যস্ত ক'রে তুলতেন। —"ভাতের থালা ছুঁয়ে গায়ে হাত দিলে কি হয়? অন্যের ছোঁয়া খাবার খেলে জাত কি ক'রে যায়?"—আরো শত প্রশ্ন।

বিশ্বনাথ দত্তের কাছে নানা জাতের মক্কেল আসে। তিনি খুব সৌখীন ও তামাকুপ্রিয় ছিলেন। ব্রাহ্মণ শূদ্র ও মুসলমান মক্কেলদের জন্য আলাদা আলাদা হুঁকো। নরেন্দ্রনাথের কাছে এই হুঁকোবিভাগ একটা বড় কৌতূহলের বিষয়। বিশেষ—যখন তিনি শুনলেন যে একের হুঁকোতে অন্যে তামাক খেলে জাত যায়! একদিন মক্কেলরা ধূমপান ক'রে সবেমাত্র উঠে গিয়েছে, এমন সময় নরেন্দ্র সে ঘরে প্রবেশ ক'রে প্রত্যেকটি হুঁকোতে মুখ দিয়ে টানতে লাগলেন। বিশ্বনাথ দত্ত ঘরে এসে তাঁকে তদবস্থায় দেখে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হচ্ছে রে বিলে।" অম্লান বদনে উত্তর দিলেন নরেন্দ্রনাথ, "দেখছি, জাত না মানলে কি হয়!" "তবে রে দুষ্টু!"—বলেই তিনি হাসতে হাসতে চলে গেলেন অন্যত্র।...

স্বাধীনতাপ্রিয় নির্ভীক দৃঢ়চেতা সদা প্রফুল্ল খেলাধূলাতে মত্ত নরেন্দ্রনাথের মধ্যে বাল্য থেকেই একটা বিশেষ শক্তির বিকাশ দেখা যেত। পাঁচ বৎসর বয়সে নরেন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। এবং তার এক বৎসর পরেই তিনি বিদ্যালয়ে প্রেরিত হ'লেন। নূতন স্থানে নূতন সঙ্গীদের পেয়ে নরেন্দ্রনাথ খুবই খুশী। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর মুখে অশ্রাব্য সব কথা শুনে বিশ্বনাথ দত্ত তাঁর

* পরবর্তিকালে স্বামিজী বলেছেন, "...হিন্দুধর্ম বিচারমার্গেও নয় জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুৎমার্গে। আমায় ছুঁয়ো না—আমায় ছুঁয়ো না—বস্। ছুৎমার্গ একপ্রকার মানসিক ব্যাধি। ...ছুৎমার্গ মোটেই হিন্দুর ধর্ম নয়। আমাদের কোন শাস্ত্রে তার উল্লেখ নেই। উহা একটি সনাতনী কুসংস্কার; যা জাতীয় কর্মশক্তিকে সকল ক্ষেত্রে ব্যাহত করেছে। বস্তুতঃ ধর্ম এখন ঢুকেছে আমাদের রন্ধন-পাত্রে।" ছুৎমার্গ—ঐক্যবোধের পরিপন্থী।

বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ ক'রে বাড়িতেই মাষ্টার রেখে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। কয়েকটি আত্মীয় বালকও তাঁর সঙ্গী হ'ল। খেলাধুলাতে নরেন্দ্রের খুবই আনন্দ। রাজা উজির খেলা হয়। নরেন্দ্র রাজা। সর্বত্রই তিনি দলপতি। সারা দুপুর চলত ঐ দুরন্তপনা। বাড়ির সকলেই অতিষ্ঠ। একদিন লুকোচুরি খেলার সময় হঠাৎ পা পিছলে দোতলার সিঁড়ি থেকে গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ে নরেন্দ্র অজ্ঞান হয়ে যান। কপাল কেটে দরদর রক্ত পড়ছে। ডাক্তার ডাকা হ'ল। সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন। অনেক পরে বালকের চৈতন্য হয়। ডান চোখের উপরে ঐ কাটা দাগটা তাঁর সারা জীবন ছিল।

পরবর্তী সময়ে দক্ষিণেশ্বরে ঐ ঘটনা শুনে পরমহংসদেব বলেছিলেন, "যদি সেদিন ঐভাবে ওর শক্তি কমে না যেত, তাহ্‌লে ও সারা পৃথিবীটাকে একেবারে ওলট-পালট করে ফেলত।"

অদ্ভুতমেধা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শ্রুতিধরত্ব নিয়ে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যা একবার শুনতেন বা পড়তেন, তা-ই তাঁর আয়ত্ত হয়ে যেত। এক দূর-আত্মীয় বৃদ্ধের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ রাত্রে শুতেন। তিনি বালকের প্রখর মেধা দেখে প্রতি রাত্রে মুখে মুখে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াতে লাগলেন। আশ্চর্য্য! এক বৎসরের মধ্যেই ঐ ব্যাকরণ বালকের কণ্ঠস্থ হয়ে গেল!...

রামভক্ত অদ্ভুতকর্মা হনুমান ছিলেন নরেন্দ্রনাথের জীবন-আদর্শের প্রতীক।*

---

* দাস্যভাবের জীবন্ত প্রতীক মহাবীর সম্বন্ধে দেশবাসীর প্রতি বিবেকানন্দের উক্তি: "মহাবীরের চরিত্রই তোদের এখন আদর্শ করতে হবে। দেখ্ না রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙ্গিয়ে চলে গেলেন। জীবন মরণে দৃক্‌পাত নেই—মহাজিতেন্দ্রিয়, মহাবুদ্ধিমান্। দাস্যভাবের ঐ মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠন করতে হবে।...হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব, অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোকসন্ত্রাসী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবন পাত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না। রামসেবা ভিন্ন সকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত্ব শিবত্বলাভে পর্যন্ত উপেক্ষা! রঘুনাথের আদেশ-পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। ঐরূপ একনিষ্ঠ হওয়া চাই।..."

তিনি সাহস বল বীর্য ও পবিত্রতার প্রতীক মহাবীরের পূজা নিদ্রিত ভারতের ঘরে ঘরে প্রচলিত করতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন, "দে দিকি দেশে মহাবীর হনুমানের পূজা চলিয়ে! দুর্বল বাঙ্গালী জাতের সামনে এই মহাবীর্যের আদর্শ ধর। দেহে বল নেই, হৃদয়ে সাহস নেই—কি হবে এই জড়পিণ্ডগুলি দিয়ে! আমার ইচ্ছা হয় ঘরে ঘরে মহাবীরের পূজা হোক!..."

দুই

সপ্তম বর্ষ বয়সে যখন নরেন্দ্রনাথকে বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসানে ভর্তি ক'রে দেওয়া হ'ল, তখন তিনি প্রথমে ইংরেজী পড়তে কিছুতেই রাজী হলেন না। "ও বিদেশী ভাষা, ও পড়ব কেন? তার চাইতে নিজের ভাষা শিখলেই ভাল হয়"—এই ছিল তাঁর কথা। বালকের মনে বিদেশী ভাষার উপর একটা সহজাত বিরাগ ও অশ্রদ্ধার কারণ কি ছিল, তা বলা কঠিন। অনেক বলা কওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ইংরেজী পড়তে রাজী করা সম্ভব হয় নি। এভাবে চলেছিল কয়েক মাস। পরে যখন তাঁর মনের পরিবর্তন হ'ল, তখন তিনি খুব উৎসাহে ইংরেজী পড়তে লাগলেন। শুনা যায়—তাঁর মাতার নিকটই' তিনি প্রথম ইংরেজী বর্ণমালা পড়েন।...

নরেন্দ্রের দুর্দমনীয় শক্তির বিকাশ শুধু স্কুলের পাঠ্য-পুস্তকগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর চাঞ্চল্য অস্থিরতা দুরন্তপনা ও বহুমুখী প্রতিভা শিক্ষক ও সহপাঠীদের বিশেষ বিব্রত করত। তাঁর স্মৃতিশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, বিদ্যালয়ের পাঠ আয়ত্ত করতে খুব অল্প সময়ই লাগত। বাকী সময় কি ক'রে কাটাবেন, তা-ই ছিল সমস্যা।...

এক দিনের ঘটনা। মাষ্টার মশাই ভূগোল পড়াচ্ছেন। নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করা হ'ল। তিনি তার জবাব দিলেন। কিন্তু শিক্ষকের ধারণা যে উত্তর

ঠিক হয়নি। তিনি বালককে প্রহার করতে লাগলেন। নরেন্দ্র যতই বলেন, "আমার ভুল হয়নি—ঠিকই বলেছি" ততই বেত্রাঘাত বাড়তে লাগল। তিনি নীরবে তা সহ্য ক'রে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। খানিক পরে মাষ্টার মশাই নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে নরেন্দ্রের কাছে ত্রুটি স্বীকার করেন।...

বাল্য হতেই নরেন্দ্র ভয় কাকে বলে জানতেন না। জুজুর ভয়, ভূতের ভয়, ব্রহ্মদৈত্যের ভয়—তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। এ সব ভয় দেখিয়ে তাঁকে নিরস্ত করা সম্ভব ছিল না!

কেউ বলেছে বলেই তা বিশ্বাস করাটা তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। বাল্যকাল হ'তেই কোন কিছুর প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তা তিনি বিশ্বাস করতেন না।

নরেন খেলাধূলায় ওস্তাদ। রান্নায় ওস্তাদ। আবার ঐ বয়সেই পাড়ার ছেলেদের নিয়ে যাত্রার দল করেন, থিয়েটারের পার্টি, ব্যায়ামাগার, কুস্তির আখড়া—আরো কত কি! তাঁর ভিতর এত শক্তি ছিল যে, তা রাখবার স্থান যেন পেতেন না। সর্বক্ষণ কিছু না কিছু করা চাই-ই। পুরাতন কলকব্জা কিনে এনে গাড়ি বানালেন। তখন কলিকাতায় সবে গ্যাসের আলো হয়েছে। নরেন্দ্র সঙ্গীদের নিয়ে লেগে গেলেন গ্যাস তৈরীর কাজে। মার্বেল খেলা ছুটোছুটি হুটোপাটি ঘুঁসোঘুঁসি লাঠিখেলা তরোয়ালখেলা লম্ফঝম্প সাঁতার-কাটা—সব কিছুতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

সন্ন্যাসী হবার সাধটা কিন্তু তাঁর মজ্জাগত ছিল। সন্ন্যাসী হবার স্বপ্ন তিনি দেখতেন বাল্য থেকেই। গর্বভরে বলতেন বন্ধুদের,—"আমার ঠাকুরদা সন্ন্যাসী ছিলেন। জানিস্! আমি সন্ন্যাসী হব।...আমার হাতে সন্ন্যাসী হবার বড়

রেখা আছে। এক সাধুকে হাত দেখিয়েছিলুম। তিনি বলেছেন।” বন্ধুরা অবাক্ হয়ে শুনত নরেন্দ্রের সন্ন্যাসী হবার কাহিনী।

তাঁর ভিতর সন্ন্যাসীর রক্ত ছিল। তাঁর দাদামশাই দুর্গাচরণ দত্ত পঁচিশ বৎসর বয়সে বিপুল ধন মান যশ সব ত্যাগ ক'রে একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথকে ফেলে সন্ন্যাসী হন। নরেন্দ্রনাথ দেখতে অনেকাংশে পিতামহের মত ছিলেন। তাই আত্মীয় পরিজনবর্গ ভাবতেন যে দুর্গাচরণই দেহান্তে এই নরেন্দ্ররূপে জন্মেছেন। *

নরেন্দ্রের বয়স তখন আট বৎসর মাত্র। একদিন সহপাঠীদের নিয়ে চলেছেন মেটেবুরুজে—লক্ষ্ণৌর ভূতপূর্ব নবাব ওয়াজিদ্ আলি সার পশুশালা দেখতে। চাঁদপাল ঘাট থেকে নৌকায় যেতে হয়। গঙ্গাবক্ষে সকলে চলেছে খুব আনন্দ-কোলাহল ক'রে। সকলেই তো বালক! নৌকায় চড়ার অভ্যাস কারো নেই। তার উপর নৌকা দুলছে আকাশ-পাতাল ক'রে। ফেরবার পথে একজন সহপাঠী বালক হঠাৎ বিশেষ অসুস্থ হয়ে নৌকায় বমি ক'রে ফেলে। মুসলমান মাঝিরা তো ক্ষেপে একেবারে মারমুখো হ'য়ে উঠেছে। বমি পরিষ্কার ক'রে দিতে হবে—নইলে কাউকে নামতে দেওয়া হবে না—হুমকি দেখাল। বালকেরা যত বলে, টাকা দিচ্ছি কাউকে দিয়ে সাফ্ করিয়ে নাও, মাঝিরা কিছুতেই তা শুনবে না। বচসা ক্রমে মারামারিতে পরিণত হতে চলেছে। সব মাঝিরা একজোট। নৌকা কিছুতেই তীরে লাগাবে না। এই গোল-যোগের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ লাফিয়ে পড়লেন নৌকা থেকে। গঙ্গার ধারে দুজন গোরা সৈন্য বেড়াচ্ছিল। তিনি ছুটলেন গোরাদের লক্ষ্য ক'রে। একজন গোরার হাত ধরে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে সমস্ত অবস্থা জানিয়ে তাদের

* শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন নরেন্দ্রনাথকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করেন, তখন তিনি সবে ২৪ বৎসরে পড়েছেন। শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পরে তিনি বরাহনগর মঠে আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।

সাহায্য চাইলেন, এবং গোরাদের হাত ধরে টেনে আনলেন নৌকার কাছে। গোরাসৈন্য দেখেই মাঝিদের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। গোরারা হাতের ছড়ি ঘুরিয়ে মাঝিদের ধমক দিতেই তারা নৌকা তীরে লাগাল। বালকরা সকলেই নেমে পড়ল নৌকা থেকে। নরেন্দ্রের দুর্জয় সাহস ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের জন্য সঙ্গীরা ধন্য ধন্য ক'রে বলল,—"তুই ভাই আজ আমাদের বাঁচিয়েছিস্।" নরেন্দ্রের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আনন্দ করতে করতে সকলকে নিয়ে ফিরে এলেন বাড়ীতে।...

তাঁর ছেলেবেলার ডানপিটেমি ও দুর্দান্ত সাহসের আরো বহু ঘটনা আছে। ওসব নিত্যকার ঘটনা। তাই তো তিনি যখন আমেরিকা থেকে বিশ্ববিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন, তখন রহস্য ক'রে শিষ্যদের বলতেন, "ছেলে-বেলায় আমি বড় ডানপিটে ছিলুম। তা না হলে কি আর অমনি ক'রে দুনিয়াটা ঘুরে আসতে পারতুম রে?"

তাঁর অন্তরে যে বিরাট পুরুষ বাস করতেন—তাঁরই সক্রিয় শক্তির প্রভাবে নরেন্দ্রনাথ বাল্য থেকেই মহা ওজস্বী ছিলেন। এবং ঐ শক্তি আত্মপ্রকাশ করত বহুরূপে। শুধু সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি নয়, বুদ্ধ শঙ্কর নেপোলিয়ান বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতি মহান আত্মাগুলি যেন জন্ম নিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথের মধ্যে। তাই তাঁর ভিতর বিকশিত হয়েছিল বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি—ব্যষ্টিমুক্তি নয় সমষ্টিমুক্তির সাধনা, দয়া দাক্ষিণ্য পরদুঃখকাতরতা সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা আত্মবিশ্বাস তেজ বীর্য স্থৈর্য ধৈর্য দৈহিক ও মানসিক বল —ঐহিক ও পারত্রিক জ্ঞান—সর্বোপরি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের ভাব। ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রে পরবর্তিকালে তিনি যে বিশ্বপ্লাবী আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন, তা মুকুলিত দেখতে পাওয়া যায় তাঁর বাল্যজীবনে। ছেলেবেলার ছোট বড় শত ঘটনা ও কার্যের সমষ্টিস্বরূপ ছিলেন ভাবী বিবেকানন্দ।...

স্কুলের পড়া তৈরী করতে তাঁর বেশী সময়ের প্রয়োজন হত না। বাকী

সময়ে তিনি বয়স অনুসারে নানা বিষয়ের পুস্তক অধ্যয়ন ক'রে তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডারকে করতেন সমৃদ্ধ। সাহিত্য ও ইতিহাসের উপর তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। পরীক্ষার ২।৩ মাস পূর্ব হ'তে তিনি ঠিক ঠিক প্রস্তুত হতেন পরীক্ষার জন্য এবং বরাবরই কৃতিত্বের সহিত পাশ ক'রে গিয়েছেন।

শরীরও তাঁর খুব বলিষ্ঠ ছিল। তিনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিম-ন্যাষ্টিক মুগুরভাঁজা অসিচালনা ডন্‌কসরৎ কুস্তি লাঠিখেলা ফুটবল সন্তরণ ও অশ্বচালনায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন*। আবার সঙ্গে সঙ্গে রন্ধন সঙ্গীত হাস্যকৌতুক রঙ্গপরিহাস—সবকিছুতেই তিনি বিশেষ পটু হয়ে উঠেন। বিশ্বনাথ দত্তও পুত্রের পরিপূর্ণ জীবনবিকাশে নানাভাবে সাহায্য করতেন।

* * *

নরেন্দ্র সবে চৌদ্দ বৎসরে পড়েছেন। মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। বিশ্বনাথ কার্যব্যপদেশে ও বায়ুপরিবর্তনের জন্য গিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে। কয়েকমাস পরেই পরিবারবর্গকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সকলকে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়ল নরেন্দ্রনাথের উপর।

রায়পুরে কয়েক মাস বাসের ফলে সকলেরই দেহমনের বিশেষ উন্নতি লাভ হয়েছে। ওখানে কোন স্কুল ছিল না—সেজন্য বিশ্বনাথ দত্তই পুত্রের শিক্ষার ভার নিলেন। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও ইতিহাস ও সাহিত্য প্রভৃতি

* দৈহিক উৎকর্ষ-লাভ সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণী :"...দৈহিক দুর্বলতাই আমাদের দুর্দশার জন্য অনেকাংশে দায়ী। দেশের যুবকগণকে সর্বাগ্রে বীর্যবান্ হতে হবে।...ধর্মের কথা পরে। তোমরা বলবান্ হও—তরুণ ভাইদের প্রতি এই আমার উপদেশ। তোমাদের বয়সে গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেললেই তোমরা স্বর্গের বেশী কাছে পৌঁছিবে।...বলবান শরীরে তোমরা যখন মানুষের মতো ঋজু ও দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারবে তখনই উপনিষদ ও আত্মার মহিমা আরও সুষ্ঠুভাবে বুঝতে পারবে। তাই যুবকদের চরিত্র গঠনের জন্য চাই লৌহসদৃশ পেশী ও ইস্পাত-সদৃশ স্নায়ুর অভ্যন্তরে বজ্রকঠিন মন। চাই বীর্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রবীর্যের সঙ্গে ব্রহ্মতেজ।"

নানা বিষয় পড়াতে লাগলেন। বিশ্বনাথবাবুর কাছে অনেক বিশিষ্ট লোকের সমাগম হত। নানা বিষয়ের আলোচনা হ'ত। নরেন্দ্রও ঐ সব আলোচনায় যোগদান ক'রে নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ পেতেন। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথ যে বহু বিষয়ের গভীর জ্ঞান অর্জন করলেন শুধু তা-ই নয়, তাঁর ভিতর একটা দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাবোধ জেগে উঠেছিল। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রসিদ্ধ লেখকদের বহু গ্রন্থ পড়ে তাঁদের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হলেন। নানা বিষয় আলোচনা করার বিশেষ শক্তির প্রথম বিকাশ রায়পুরেই হয়েছিল। বিশ্বনাথ দত্তের বন্ধুগণ নরেন্দ্রের অসাধারণ-শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে বলতেন। নরেন্দ্র সকলেরই বিশেষ প্রিয়-পাত্র ছিলেন।

দু বৎসর পরে বিশ্বনাথ দত্ত সপরিবারে ফিরে এলেন কলিকাতায়। নরেন্দ্রনাথের দেহ মনের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তিনি দু'বৎসর স্কুল ছাড়া। সেজন্য এণ্ট্রান্স ক্লাশে ভর্তি হবার নানা বাধা উপস্থিত হয়। কিন্তু সব বাধা অতিক্রম ক'রে বিশেষ অনুমতিক্রমে তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাশে ভর্তি হলেন। তিন বৎসরের পাঠ্য এক বৎসরে সমাপ্ত করতে হবে। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত প্রস্তুত হয়ে তিনি বসলেন পরীক্ষা দিতে। তিনি বলেছিলেন, "প্রবেশিকা পরীক্ষার দু-তিন দিন মাত্র বাকী। দেখি যে, জ্যামিতি কিছুমাত্র পড়া হয়নি। তখন সমস্ত রাত জেগে তা পড়তে লাগলুম। এবং চব্বিশ ঘণ্টায় চার খণ্ড জ্যামিতি শেষ ক'রে পরীক্ষা দিয়ে এলুম।" ভালই পাশ করলেন। সে বৎসর ঐ স্কুলের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই পাশ করেন প্রথম বিভাগে।

মেট্রোপলিটানে পড়ার সময় বিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁর ভিতরের "বাগ্মী বিবেকানন্দ" আত্মপ্রকাশ করেন। স্কুলের পারিতোষিক-

বিতরণ ও জনৈক প্রবীণ শিক্ষকের বিদায়-অভিনন্দন-সভা। পৌরোহিত্য করেছিলেন বাগ্মীপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার সাহস কারুরই হ'ল না। সকলের বিশেষ অনুরোধে অগত্যা নরেন্দ্রনাথ কিছু বলার জন্য দাঁড়ালেন। বিশুদ্ধ ইংরেজীতে আধঘণ্টা মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়ে যখন তিনি বসলেন তখন চারদিক থেকেই উচ্চ প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হ'ল। সভাপতি শুধু বক্তৃতারই প্রসংসা করেন নি, বক্তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

* * *

নরেন্দ্রনাথ প্রথমে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। কিন্তু পর বৎসর পড়তে লাগলেন জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসনে—বর্তমান স্কটিস্ চার্চ কলেজে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সম্মুখে যেন একটা বৃহত্তর লোকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। তাঁর চিন্তাজগতে সৃষ্টি হ'ল একটা বিপুল আলোড়ন। সব কিছুই তিনি দেখতে লাগলেন, শুনতে লাগলেন বিশ্লেষকের মন নিয়ে। তাঁর দৃষ্টিও প্রসারিত হ'ল ভারতের গণ্ডীরেখাকে অতিক্রম ক'রে বিশ্বের দিকে। নূতন নূতন চিন্তা—নব নব সমস্যা তাঁর অন্তর অধিকার করল। তিনি অভিনিবেশ সহকারে পড়তে লাগলেন দর্শনশাস্ত্র ও সাহিত্য। মিল্ প্রমুখ পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক, হিউম্, হারবার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি দার্শনিদের চিন্তার সঙ্গে ক্রমে পরিচিত হলেন। শেলীর কবিতা, হেগেলের দর্শন, তাঁর মনোরাজ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তিনি ভারতীয় কবিদের লেখা ও তৎকালীন সমাজ-সংস্কারদের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং ব্রাহ্মনেতাদের কাছে যাতায়াত আরম্ভ করলেন।...

তাঁর মনে এ প্রশ্নও বিশেষ ক'রে জেগেছিল—এই পরিদৃশ্যমান জগতের সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার পশ্চাতে এমন কোন বিরাট শক্তি আছে কি—যার

ইঙ্গিতে এ জড়জগৎ পরিচালিত হচ্ছে? সর্বোপরি, মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি—এ জিজ্ঞাসাও তাঁর অন্তর অধিকার করে। জগতে এত দুঃখ ও বৈষম্য কেন? ধনীর অট্টালিকার পাশেই পর্ণকুটীর, রাষ্ট্রবিশেষ ধন ঐশ্বর্য ও বলে দৃপ্ত, অন্য জাতি প্রপীড়িত পদদলিত দুঃখ ও দৈন্যে মৃতপ্রায়—এরূপ কেন? এ সকল চিন্তাও তাঁর কম উৎকণ্ঠার কারণ ছিল না। ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বৈষম্যগুলি তাঁর অন্তরকে বিদ্রোহী করেছিল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্ঞান স্পৃহা বেড়ে গেল। ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের কাব্য তাঁর প্রাণে গভীর রেখাপাত করে। ডেকার্টের অহংবাদ, হিউম ও বেনের নাস্তিক্যবাদ, ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ এবং স্পেন্সরের অজ্ঞেয়বাদ নরেন্দ্রের অন্তরে বিপ্লব এনেছিল। এমন কি প্রাচীন আরিষ্টটলের মতকেও তিনি উপেক্ষা করেন নি। আবার এমন দিনও এসেছিল যখন রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, "যা সব পড়েছি, তা যদি ভুলে যেতে পারতাম!" অবশ্য সে ভাবটা সাময়িক। তাঁর জ্ঞানস্পৃহা ছিল সহজাত। তাঁর জন্মগত সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস, জাগতিক বিভিন্ন সমস্যা ও বৈষম্যগুলি তাঁর অন্তরকে মথিত ক'রে সৃষ্টি করেছিল তুমুল ঝড় ও সংঘর্ষ। এ গুলির সমাধান খুঁজবার জন্য তিনি বিশেষ অশান্ত হয়ে পড়লেন।

পাশ্চাত্য দর্শনের দ্বারা যদিও বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত, কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন তুলনামূলক ভাবে অধ্যয়ন ক'রে তিনিবলেছিলেন, "হিন্দুদর্শন প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে যে পরম সত্যকে উপলব্ধি ক'রে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ সেই সত্যেরই একটু ক্ষীণ আভাস-মাত্র পেয়েছেন—পূর্ণসত্য জীবনে উপলব্ধি করতে পারেন নি।..."

*　　*　　*

প্রতিভামণ্ডিত সদা আনন্দময় যুবক নরেন্দ্র অল্প দিনের মধ্যেই কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হলেন। তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা

পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি, স্বচ্ছ চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গী এবং মধুর সঙ্গীত* সকলকেই মুগ্ধ করত। যেখানেই যান, সেখানেই তাঁর ব্যক্তিত্ব হ'ত প্রকটিত। যাতে হাত দেন তাই হয়ে ওঠে অনিন্দ্য-সুন্দর। রসিক আমোদী প্রাণশক্তির বিপুল উৎস নরেন্দ্রনাথ ছিলেন দলের নায়ক। তিনি যেখানে যার সঙ্গে মিশতেন, সকলেরই প্রাণে বিমল আনন্দের তুফান তুলে দিতেন। কলেজের সব ছাত্রই তাঁর বন্ধু। সকলকেই তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, সকলেই নানাভাবে তাঁর উপর নির্ভর করত। তাঁর চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল পবিত্রতা, তা থেকে তিলমাত্র বিচ্যুতি ছিল না। বেশভূষাতেও তিনি খুব সাদাসিধে ছিলেন। কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। তিনি যা করতেন তা চূড়ান্ত মাত্রায়ই করতেন। তাই বন্ধুরা অনেক সময় তাঁকে অতিরিক্ত মাত্রায় পবিত্রতাবাদী † বলত। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য-পালন, নিয়মিত ধ্যানধারণা ও প্রার্থনার ফলে তাঁর দেহমনে এমন একটা আধ্যাত্মিক তেজের বিকাশ হয়েছিল, যার কাছে সকলেই মাথা নীচু করত।

পিতামাতার শিক্ষা ও আদর্শজীবন নরেন্দ্রনাথের মনের উপর কম প্রভাব বিস্তার করেনি। পিতার বিদ্যাবুদ্ধি সহৃদয়তা দয়া দাক্ষিণ্য স্বাধীনচিন্তা পরদুঃখকাতরতা ঔদার্য ও মহানুভাবতা নরেন্দ্রকে মুগ্ধ করে। তাঁর জননী

* বিশ্বনাথ দত্ত বাড়ীতে বড় ওস্তাদ রেখে নরেন্দ্রকে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শিখিয়েছিলেন। তাঁর সুধাস্রাবী কণ্ঠ সকলের প্রাণে আনন্দ দিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সঙ্গীত এত ভালবাসতেন যে গান শুনতে শুনতে তাঁর মন চলে যেত অতীন্দ্রিয় রাজ্যে—তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। বলতেন, "...এর ভিতর যে আছে নরেনের গান শুনে সে ফোঁস করে উঠে।" অর্থাৎ তাঁর কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠত। নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতে যেমন পারদর্শী ছিলেন তেমনি তবলা পাখোয়াজ ও সেতার বাজাতেও সিদ্ধহস্ত। তিনি ভাল নৃত্যও শিখেছিলেন।

† আমেরিকা থেকে তিনি লিখেছিলেন, "আমার বয়স যখন বিশ, তখন আমার মধ্যে আপসের মনোভাব আদৌ ছিল না। সকল বিষয়েই আমার ছিল বাড়াবাড়ি। কলিকাতার যে ফুটপাথে থিয়েটার ছিল—সে ফুটপাথ দিয়েও আমি যেতাম না।"

শিক্ষিতা ও মহীয়সী নারী ছিলেন। ধর্মপ্রাণতা ও বদান্যতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। "আমার মা আমার জীবন ও কর্মের অবিরাম প্রেরণার উৎসস্বরূপা ছিলেন"—পরবর্তিকালে বলেছিলেন নরেন্দ্রনাথ।...

বিশ্বনাথ দত্তের শিক্ষার ধারা ছিল অভিনব। তিনি কখনো পুত্রকে শাসন বা তাড়ন করতেন না। প্রত্যেক কাজের ভিতরই পুত্রের আত্মমর্যাদা-বোধ জাগিয়ে দিতেন। নরেন্দ্র রাগের মাথায় একদিন মায়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তাঁকে কটুবাক্য বলেছিলেন। বিশ্বনাথ শুনলেন সব, কিন্তু কিছুই বললেন না পুত্রকে। শুধু ছেলে যে ঘরে থাকত, তার দরজার উপরে দেয়ালে কয়লা দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখলেন—নরেন বাবু তার মাকে আজ এই সব কথা বলেছে। বন্ধুরা এসে ঐ লেখা দেখত। আত্মগ্লানি ও লজ্জায় নরেনের মাথা হেঁট হয়ে গেল।

অন্য দিনের ঘটনা। পুত্রের প্রতি পিতার কর্তব্য সম্বন্ধে বিশ্বনাথ বিশেষ অবহিত ছিলেন। তবু যেন নরেন্দ্রনাথ তাতে তৃপ্ত নন। পিতার দরাজহাত, গরীব দুঃখীকে অকাতরে দান, বন্ধুপ্রীতির জন্য লোকজনকে খাওয়ানো, দাওয়ানো এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতিপালনে আয়ের চাইতে ব্যয় হ'ত বেশী। আগামী দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় থাকত না। স্ত্রীপুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবনাও যেন তাঁর ছিল না। একটু বয়স হ'তে নরেন্দ্রনাথ সংসারের ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তিত হলেন। একদিন অভিমানের সুরে বললেন পিতাকে, "আপনি আমার জন্য কি করেছেন?"

পিতা একবার তাকালেন পুত্রের মুখের দিকে। বললেন, "আরশিতে নিজের চেহারাটা দেখ্। তাহলেই বুঝবি তোর জন্য কি করেছি।"

নতমুখে চলে গেলেন নরেন্দ্র। বুঝলেন পিতার ইঙ্গিত। "তিনি তো কিছুই কম দেননি! আমার জীবনকে অকৃপণ হস্তে ভরে দিয়েছেন।"...

তিন

হেষ্টি সাহেব তখন জেনারেল এসেম্ব্লিজ-এর অধ্যক্ষ। পবিত্র জীবন, উদার স্বভাব, পাণ্ডিত্য ও বহুমুখী প্রতিভার জন্য তিনি ছাত্রদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। সাহিত্যের অধ্যাপক অসুস্থ, তাই তিনি এসেছেন ছেলেদের সাহিত্য পড়াতে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা পড়াচ্ছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত কবির মন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলে গিয়ে কতটা সমাহিত হয়ে যেত, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাহেব বললেন, "ঐ প্রকার অবস্থালাভ দুর্লভ। চিত্তের পবিত্রতা ও বস্তু বিশেষে একাগ্রতার ফলে ঐ অবস্থা লাভ হয়। একমাত্র দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের ঐরূপ অবস্থা হ'তে দেখেছি। তাঁর ঐ অবস্থা একদিন দর্শন করলে তোমরাও সমাধি কি জিনিষ তা সম্যক্ বুঝতে পারবে।"

হেষ্টি সাহেবের মুখেই নরেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তা জানা যায় না।

নরেন্দ্র হেষ্টি সাহেবের কাছে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। ছাত্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সাহেব একদিন বলেছিলেন, "নরেন্দ্রনাথ দত্ত বাস্তবিকই একজন প্রতিভাবান ছাত্র। আমি অনেক স্থানে ঘুরেছি, কিন্তু এর মতো একটি ছাত্রও কোথাও দেখিনি। এমন কি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের ছাত্রদের মধ্যেও নয়। এ যুবক নিশ্চয়ই জগতে একটা নাম রাখবে।"...

*　　*　　*

অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রপীড়িত নরেন্দ্র সত্যলাভের ইচ্ছায় ব্রাহ্ম-সমাজে আরো বেশী ক'রে যাতায়াত করেন। কেশবচন্দ্র সংবাদ-পত্রে ও বক্তৃতাতে শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। তাতে ক'রে কলিকাতার জনসাধারণ শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় জানতে

পারেন। ব্রাহ্মনেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে, সমাজের প্রার্থনাদিতে যোগদান ক'রে নরেন্দ্রনাথ খুবই আনন্দ পেতেন এবং রবিবাসরীয় উপাসনা-কালে মধুর ব্রহ্মসঙ্গীত গান ক'রে সকলকে আনন্দ দিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ব্রাহ্মনেতাদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হলেন, এবং সমাজের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হ'য়ে নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় ব্রতী হলেন। বাল্যকাল হ'তেই তাঁর ধ্যান করার অভ্যাস ছিল। তাই মনঃসংযমের জন্য তাঁকে বিশেষ চেষ্টা করতে হ'ত না। এইভাবে ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হয়ে তিনি বিশেষ শান্তি পেতেন।...

সন্দেহবাদ তাঁর মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যতই সন্দেহের সৃষ্টি করুক না কেন, জগৎটা যে ক্ষণস্থায়ী, জীবন যে স্বপ্নবৎ এবং সংসারের সুখদুঃখের অনুভূতি যে অকিঞ্চিৎকর, সে বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হ'তে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। মরীচিকার মতো অলীক অস্থায়ী বস্তুর পিছনে ছোটাছুটি নিরর্থক—এই চিন্তা তাঁর সমগ্র সত্তাকে মথিত করত। তাঁর অন্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তিনি ব্যাকুল হলেন ভূমার সন্ধানে। তিনি ব্রাহ্মসমাজে যান, ব্রাহ্মনেতাদের ধর্মোপদেশ শ্রবণ ও প্রার্থনাদিতে যোগদান করেন। প্রাণের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে কলিকাতার বিভিন্ন ধর্মপ্রাণব্যক্তিদের কাছেও যেতে লাগলেন। তাঁর একমাত্র প্রশ্ন—চিরশান্তি কোথায়?

ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীবদ্ধ উপাসনায় তাঁর অন্তর তৃপ্ত হ'ত না—সব কিছুই যেন ভাসা ভাসা। তিনি গভীরে ডুবতে চান। ক্রমেই তাঁর মনে হ'ল—ব্রাহ্মসমাজ একটি সমাজ-সংস্কারক প্রতিষ্ঠান মাত্র! তিনি কেশবকে শ্রদ্ধা করতেন। বক্তৃতাদি শুনে তিনি কেশবের গুণমুগ্ধ। কিন্তু তিনি যে বস্তু চান, যে অবস্থায় স্থিত হবার চেষ্টা করছেন—"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥" * সেই অবস্থায়

* যে আত্মস্বরূপকে পেয়ে লাভান্তরকে অধিক লাভ বলে মনে করে না, যে অবস্থায় স্থিত হলে মহাদুঃখেও বিচলিত হয় না। গীতা, ৬।২২

না পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁর প্রাণে শান্তি নেই। ব্রাহ্মসমাজে তিনি তা পেলেন না। পড়াশুনা ক'রে যাচ্ছেন—কিন্তু অন্তর ভরে আছে অব্যক্ত বেদনায়। কঠোর ব্রহ্মচারীর ব্রত নিয়ে তিনি ভূমিশয্যায় শয়ন করেন—আহারে সংযম, বেশভূষায় সংযম—সারা রাত ধ্যান ক'রে কাটিয়ে দেন। অন্তরের আবেগ তাঁকে অশান্ত ক'রে তুলল। কোথায় যান—কে তাঁকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মলাভের পথ বলে দেবে ?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন শক্তিমান্ পুরুষ—বড় ধর্মনেতা ও আচার্য। উপাসনা ও ধ্যান ভজনের সুবিধার জন্য মহর্ষি তখন কলিকাতার নিকট গঙ্গাবক্ষে এক নৌকাতে বাস করতেন।

একদিন নরেন্দ্র উন্মত্তের মতো নৌকায় প্রবেশ ক'রে মহর্ষিকে প্রশ্ন করলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন ?"

মহর্ষি বোধ হয় এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি যুবকের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, "তোমার চোখ দুটি ঠিক যোগীর চোখের মতো।" অনেক আশা করে নরেন্দ্র গিয়েছিলেন মহর্ষির কাছে। কিছুই না পেয়ে হতাশ প্রাণে ফিরে এলেন। তাঁর অন্তরের অশান্তি আরো বেড়ে গেল। কোথায় পাব সেই তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ, যিনি শান্তিলাভের পথ দেখিয়ে দেবেন ? প্রাচীন আর্যঋষির প্রশ্ন তাঁর হৃদয়কে আলোড়িত করল। এ প্রশ্ন নিয়েই শৌনক গিয়েছিলেন অঙ্গিরার কাছে।—"কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ?" ঋষি এ প্রশ্নের জবাব জানতেন। তাই বলেছিলেন, "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবা-

পরা চ।...অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"।* কিন্তু কে তাঁকে বলে দেবে সেই পরাবিত্থার সন্ধান?

* * *

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় তাঁর অন্তরের দেবতা যেন তাঁকে পথের ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। তিনি পরে বলেছিলেন, "যৌবনে পদার্পণ করা অবধি প্রতি-রাত্রে শয়ন করলেই দু'টি কল্পনা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠত। একটিতে দেখতাম, যেন আমার অশেষ ধনজন সম্পদ্ ঐশ্বর্যাদি লাভ হয়েছে। সংসারে যাদের বড় লোক বলে, তাদের শীর্ষস্থানে যেন অধিরূঢ় হয়ে রয়েছি। মনে হ'ত ওরূপ হবার শক্তি আমার মধ্যে সত্যসত্যই আছে। আবার পরক্ষণেই দেখতাম আমি যেন পৃথিবীর সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে একমাত্র ঈশ্বরেচ্ছার উপর নির্ভর ক'রে কৌপীন ধারণ, যদৃচ্ছা ভোজন এবং বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন ক'রে কাটাচ্ছি। এবং মনে হ'ত ইচ্ছা করলে ঐ ভাবে মুনি-ঋষিদের মতো জীবনযাপনে সমর্থ। ঐরূপে দু' প্রকার জীবনের ছবি কল্পনায় উদিত হয়ে পরিশেষে শেষোক্ত চিন্তাই হৃদয় অধিকার ক'রে বসত। ভাবতাম, পরমানন্দলাভের এই পথ—আমি এই পথই অনুসরণ করব। তখন ঐ ভূমানন্দের বিষয় ভাবতে ভাবতে মন ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হ'ত এবং আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। আশ্চর্যের বিষয়, অনেকদিন পর্যন্ত প্রত্যহই এরূপ হ'ত"। †

* ভগবন্, কোন্ বিষয়টি জানলে সব কিছু জানা হয়ে যায়?...ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলে থাকেন যে, দুটি বিত্থা জানতে হয়—পরা ও অপরা।...যদ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় তা-ই পরা বা শ্রেষ্ঠ বিত্থা অর্থাৎ ব্রহ্মবিত্থা। (মুঃ ১।১।৪-৫)।

† তিনি আর একটা অদ্ভুত ব্যাপারও উপলব্ধি করতেন। যা অনন্যসাধারণ। ঘুমুবার পূর্বে উপুড় হয়ে শুয়ে চক্ষু মুদ্রিত করলেই তিনি ভ্রূমধ্যে একটা জ্যোতিঃপিণ্ড দেখতে পেতেন। ক্রমে ঐ জ্যোতি নানাবর্ণে বিস্তৃত হ'য়ে তাঁর সারা দেহ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলত। তিনি ঐ অখণ্ড জ্যোতিঃসাগরে স্নাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। অনেককাল পরে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপে জেনেছিলেন যে, ঘুমুবার পূর্বে তাদের কারো ঐ প্রকার দর্শন হয় না।

উপনিষদের ঋষিই যেন তাঁর অন্তরে বসে বলতেন, "ন কর্মনা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানসুঃ ॥" অর্থাৎ কর্মদ্বারা, সন্তানসন্ততি বা ধনের দ্বারা নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। সেই অমৃতত্ব লাভের পথ তাঁকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ঐ সময়ের কিছু আগে বা পরে এক অপূর্ব দর্শন তাঁর মনোরাজ্যে এক যুগান্তর এনে দিয়েছিল। তিনি তখন খুব ধ্যান করতেন। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যানই তাঁর ভাল লাগে। তাতেই তিনি বেশী আনন্দ পেতেন। একদিন গভীর ধ্যানের পর সেই অব্যক্ত আনন্দের নেশায় তখনো বিভোর হ'য়ে ধ্যানের আসনেই বসে আছেন। হঠাৎ দেখলেন—দিব্য জ্যোতিতে ঘরটি ভরে গেল। এক অপরিচিত সন্ন্যাসীর মূর্তি আবির্ভূত হয়ে অদূরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর অঙ্গে গৈরিক বসন, হস্তে কমণ্ডলু, মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় সুষমা। স্থির প্রশান্ত অন্তর্মুখ ও আনন্দময় সেই সন্ন্যাসী এক দৃষ্টিতে দেখছেন নরেন্দ্রনাথকে, যেন কিছু বলবেন। সন্ন্যাসীকে তাঁর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে দেখে তিনি ভীত হ'য়ে তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ ক'রে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হ'ল—তাই তো, ভয় করার কি ছিল! ভুল করেছি। সাহস ফিরে পেতেই পুনরায় ঘরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু ততক্ষণে সেই সন্ন্যাসী অন্তর্ধান করেছেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও সেই সূক্ষ্মদেহী সন্ন্যাসীপ্রবরের আর দর্শন পেলেন না। পলায়নের জন্য অনুশোচনায় নরেন্দ্রের অন্তর ভরে গেল। ঐ ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি পরে বলেছিলেন, "সন্ন্যাসী অনেক দেখেছি; কিন্তু অমন অপূর্ব মুখের ভাব কারো কখনো দেখিনি। সে মুখখানি চিরকালের মতো আমার অন্তরে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। হ'তে

পারে ভ্রম, কিন্তু অনেক সময়ই মনে হয় সেদিন আমি বুদ্ধদেবের দর্শনলাভে ধন্য হয়েছিলাম।"*

* * *

নরেন্দ্রনাথের মনোরাজ্যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে। মহর্ষির কথায় তাঁর মন শান্ত হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অনেক সমস্যাই তাঁর চিন্তার বিষয় হ'ল। জাতিগত অধিকার ও বৈষম্যের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। হিন্দুধর্মকে সঙ্কীর্ণতার আগড়মুক্ত ক'রে, জাতীয় জীবনকে জাগ্রত ক'রে তোলাও তাঁর অন্যতম পরিকল্পনা। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব তাঁর চিন্তাজগতে কম আবর্তের সৃষ্টি করেনি। স্বামী বিবেকানন্দরূপে তিনি যে সকল সংস্কার-সাধন করে-ছিলেন—সে সব বিষয়গুলি প্রথম জীবনেই তাঁর অন্তর অধিকার করেছিল এবং জীবনের অঙ্গীভূত হয়েছিল। বিভিন্ন চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে ও অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি জর্জরিত। এদিকে এফ-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এমনি সময়ে এক অভাবনীয় উপায়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর মিলন হ'ল।

নরেন্দ্রনাথ কেশবের বক্তৃতা ও উপাসনাদিতে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনেছেন। কেশব-পরিচালিত পত্রিকাদিতেও পড়েছেন তাঁর কথা ও উপদেশ। ঠিক ঐ

*বুদ্ধদেবের জীবনের প্রভাব নরেন্দ্রনাথের উপর পড়েছিল বিপুলভাবে। তিনি ভগবান্ বুদ্ধের হৃদয়বত্তা ও মহাপ্রাণতার খুব প্রশংসা করতেন। সেই আদর্শ সন্ন্যাসী, যিনি নিজের মুক্তির জন্য কিছু করেননি। স্ত্রী-পুত্র রাজসিংহাসন—সর্বস্বত্যাগ করে মানবের মুক্তির প্রশস্ত পথ আবিষ্কারের জন্য কঠোর সাধনা করেছিলেন, সেই মহাপ্রাণের প্রতি স্বামীজীর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাঁর উক্তি:"...বুদ্ধের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর। এমন কি একটি ছাগশিশুর প্রাণরক্ষার জন্য তিনি স্বীয় জীবনদানে প্রস্তুত ছিলেন। বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় জীবনদানের কথা আর কি বলব! দেখ তাঁর কি বিশালপ্রাণতা, কি অসীম করুণা। ...তথাগতের শ্রেষ্ঠ মহিমা এই ছিল যে, সকলের জন্য বিশেষতঃ অজ্ঞ ও দরিদ্রের জন্য তাঁর অদ্ভুত সমবেদনা।...বেদান্তের নীতিকে কার্যে পরিণত করবার জন্য বুদ্ধের আবির্ভাব। তিনি সমস্ত বিশেষ সুবিধা চুরমার করে দিলেন। আভিজাত্য, সুবিধাবাদ ধ্বংস ক'রে সাম্যবাদ প্রচার করলেন।.. ভগবান বুদ্ধদেব ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, অত্যদ্ভুত. সংঘস্রষ্টা।...জগতের যে যে স্থানে কোন নীতিরশ্মি দৃষ্ট হয়, তা এই মহামানবের জ্ঞান-সূর্য থেকে বিকীর্ণ।'

সময়ে তিনি ঐ মিলনের জন্য কতটা প্রস্তুত ছিলেন তা আমরা জানিনে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের এই মিলন যেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন, প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের মিলন, সমুদ্রের সঙ্গে নদীর সঙ্গমন, স্বর্গের সঙ্গে মর্তের এবং বিশ্বের সঙ্গে ভারতের মিলন।—তা আমরা পরে পরে দেখতে পাব।...

নরেন্দ্র সবে ১৮ বৎসর পড়েছেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সন্দেহবাদ ও নাস্তিক্যবাদের সঙ্গে পরিচিত। জগতের অনেক সমস্যাই তাঁর চিন্তার বিষয়। যদিও ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত-পালিত, দেখতে শুনতে, পড়াশুনায়, গাইতে বাজাতে, বলতে, কইতে অদ্বিতীয় কিন্তু গরীব দুঃখীর জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে। দয়াময় ভগবানের রাজ্যে এত দুঃখ কেন—এ চিন্তার কোন সমাধান তিনি পান না। জগতে এত বৈষম্য—ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এ পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান কে সৃষ্টি করেছে? এক ভগবানেরই সন্তান সকলে, অথচ ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের মধ্যে এ দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরালের সৃষ্টি কি ক'রে হ'ল—আরো শত চিন্তা তাঁর তরুণ প্রাণকে আকুল করে। এদিকে শিশির ধোয়া ফুলের মতো পবিত্র তাঁর জীবন। পদ্মফুলের পাপড়ির মতো তাঁর চোখ দুটি! গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে রাত রাত কাটিয়ে দেন। সারারাত ধ্যান ক'রে সুন্দর চোখ দুটি লাল হয়ে উঠে।

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ* ॥" ছাঃ ৭।২৩।১

আর্যঋষির এ বাণী তাঁর তরুণ প্রাণ অধিকার করছে। ভূমানন্দের সন্ধানে তাঁর প্রাণ আকুলি-বিকুলি করে। শুধু আত্মচিন্তা নয়, আত্মমুক্তি নয়—বিশ্বমানবের যাবতীয় দুঃখ-মুক্তির উপায়-উদ্ভাবনে তিনি সমগ্রশক্তি নিয়োজিত করেছেন। তিনি জ্ঞানী গুণী আত্মবিশ্বাসী ও যুক্তিপন্থী।

---

* যা ভূমা বা বৃহৎ তা-ই সুখ স্বরূপ। খণ্ড বস্তুতে সুখ নেই। ভূমাতেই সুখ। ভূমাকেই জানবার ইচ্ছা করতে হবে।

এমনধারা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলন হল নিরক্ষর এক দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণের। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী কালীর পূজা করেন। ভগবান্ ছাড়া আর কিছু চাননি, জানেননি জীবনে। তিনি বক্তৃতা করেন না, প্রচার করেন না। কোন বই লিখেন নি। হিমালয়ের গুহায় তপস্যা করতে যাননি। দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরেই বাস করেছেন প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে। কেশব বিজয় শিবনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা এই রহস্যময় পুরুষের চরণতলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন। তাঁর শ্রীমুখে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শোনেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ। তার ভাবসমাধি দর্শন ক'রে বিস্মিত হন। বই পত্র শাস্ত্রাদি না পড়ে এমন সুন্দর সুন্দর তত্ত্বকথা—যা তাঁরাও জানেন না—বলেন কি ক'রে! দেখতে উন্মাদের মতো। পরণের কাপড় পর্যন্ত ঠিক থাকে না। কিন্তু যখন মায়ের গান করেন, শ্রোতাদের বুকের ভিতর মোচড় দেয়—যেন তীরের মতো বিঁধে যায়।

তাঁর ঈশ্বর মা কালী। তাঁর ব্রহ্ম মা কালী। ছোট্ট শিশুটির মতো সর্বদা 'মা-মা' করেন। মা'র গান করেন। মা'র কথা বলেন। তাঁর কাছে মা কালী প্রস্তর মূর্তিমাত্র নন। মা তাঁর সঙ্গে কথা বলেন, তাঁর হাতে খান, আবার কত উপদেশ দেন। ঐ মায়ের চিন্তায়—ঐ মা কালীকে নিয়েই তিনি বিভোর হয়ে থাকেন।

* * *

শিমলা পল্লীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ক'রে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর ঈশ্বর-পরায়ণতা ভক্তিবিশ্বাস ভগবৎপ্রেম কাম-কাঞ্চন-ত্যাগ মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধি—সব কিছুই অমানব, অলৌকিক। ঐ দেবমানবকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পাবার জন্য—নিজগৃহ ও পল্লীকে ধন্য করবার জন্য তিনি ঐ ঈশ্বরপ্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণকে বাড়ীতে এনে উৎসবানন্দের আয়োজন করেছেন।

নিমন্ত্রণ করেছেন—পল্লীবাসীদের, পরিচিতদের। উৎসব মানে আধ্যাত্মিক সমারোহ—ভজন কীর্তন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ। দেবদেবীর মহিমাসূচক গান শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণের মন এক অতীন্দ্রিয় লোকে চলে যায়—তিনি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সহিত এক হয়ে গিয়ে সমাধিস্থ হন। বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়, থাকে শুধু আত্মজ্ঞান—আত্মচৈতন্য। ঐ অবস্থায় তিনি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন। শুনে সকলে মুগ্ধ হয়। সকলের মনেও দিব্যভাব জেগে উঠে—দিব্যানন্দের আস্বাদ পায় সকলে।

১৮৮১ সালের নবেম্বর মাস। সুরেন্দ্রের বাড়ীতে কতিপয় অনুরাগী ভক্তের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুভাগমন করেছেন। একজন সুগায়কের অভাব। সুরেন্দ্রনাথ প্রতিবেশী বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্রকে নিয়ে এলেন ভজন গাইবার জন্য! গায়ককে দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব চমকে উঠলেন।—এই যে সেই সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি! তিনি চিনতে পারলেন যুবককে। বাড়ির পরিচয়ে বাপমায়ের পরিচয়ে নয়! তাঁর সেই অলৌকিক দর্শনই জানিয়ে দিল পরিচয়। বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি যে এরই প্রতীক্ষায় বসে আছেন।...

নরেন্দ্র প্রাণ ঢেলে গাইলেন। গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ 'ভাবস্থ'। ভজনাদি সাঙ্গ হ'লে ঠাকুর সুরেন্দ্র ও রামদত্ত প্রভৃতি ভক্তদের কাছে যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। এবং একদিন সঙ্গে ক'রে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবার আকুল অনুরোধ জানালেন। তাতেও তৃপ্ত না হয়ে কাছে ডাকলেন নরেন্দ্রকে—সস্নেহে দেখতে লাগলেন তাঁর অন্তরের নিধিকে। তিনি যে নরেন্দ্রকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পেতে চান! তাই মিনতির সুরে নিজেই নরেন্দ্রকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ভদ্রতার খাতিরে নরেন্দ্রও যাবার কথা দিলেন।...

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন। নরেন্দ্রও গেলেন বাড়ীতে। সামনেই পরীক্ষা। তিনি ডুবে গেলেন পড়াশুনায়—দক্ষিণেশ্বর ভুল হয়ে গেল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের দিন যেন আর কাটে না। রোজই আশা ক'রে থাকেন। দিনের দিন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নরেন্দ্রকে দেখবার জন্য। অথচ নিরুপায়। তাই প্রাণের গভীর আবেগ কোন প্রকারে চেপে রেখে—সেই মিলনের প্রতীক্ষায় ছটফট্ করতে লাগলেন। তিনি বলেছিলেন, "নরেনকে দেখবার জন্য সময় সময় এমন যন্ত্রণা হ'ত যে মনে হ'ত বুকের ভিতরটা যেন কে গামছা নিংড়ানোর মতো জোরে নিংড়াচ্ছে।...'ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছিনে'—বলে ডাক ছেড়ে কাঁদতাম।..."

নরেন্দ্রের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলেন তিনি। পিতা এক সঙ্গতিপন্নের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির করেছেন। পাত্রী শ্যামবর্ণা—তাই দশহাজার টাকা যৌতুক। প্রস্তাব শুনে নরেন্দ্র বিদ্রোহী হলেন। তিনি বিবাহ কিছুতেই করবেন না। তাঁর জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। অন্তরে তিনি শুনেছেন বৃহত্তর কর্তব্যের আহ্বান। বিবাহ ক'রে বড়লোক হওয়া এবং দশজনের মতো জীবন যাপনের সঙ্গে তিনি আপোষ করতে পারলেন না। তাঁর একমাত্র জবাব—'কিছুতেই বিবাহ করব না।' নরেন্দ্রের বৈরাগ্যপ্রবণ মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তিনি ধ্যানভজনে আরো ডুবে গেলেন—ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত আরো বাড়িয়ে দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত—নরেন্দ্রের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। তিনি নরেন্দ্রের গৃহেই প্রতিপালিত। পড়াশুনা ক'রে বড় ডাক্তার হয়েছেন। এবং দক্ষিণেশ্বরের "প্রেমোন্মাদ ঠাকুরের" প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। নরেন্দ্রও রামবাবুকে খুব ভালবাসেন—রামদাদা বলে ডাকেন। মনের কথা তাঁকে বলতেন। একদিন ঐ বিবাহপ্রসঙ্গে তিনি তাঁর মানসিক অশান্তির কথা খুলে

বললেন তাঁকে। রামদত্ত সব শুনে সস্নেহে বললেন, "ভাই, যদি প্রকৃত ধর্মলাভ করাই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি স্থানে ঘোরাঘুরি না ক'রে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের কাছে যাও।"

কথাটি নরেন্দ্রের প্রাণে লাগল। প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে একদিন গাড়ী করে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবার আহ্বান জানালেন। দু'তিন জন বন্ধু সহ নরেন্দ্র সুরেন্দ্রের সঙ্গে উপনীত হলেন দক্ষিণেশ্বরে।

চার

১৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাস। গঙ্গার দিকের দরজা দিয়ে নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখেই আনন্দিত হয়ে ঠাকুর মেজেতে যে মাদুর পাতা ছিল তাতে নরেন্দ্রকে বসতে বললেন। পরে গান গাইবার অনুরোধ করাতে নরেন্দ্র বললেন যে বাংলা গান দু-চারটা মাত্র জানেন। তা-ই গাইতে অনুরোধ করা হল। "মন চল নিজ নিকেতনে" *—গানটি গাইলেন তিনি সমগ্র মনপ্রাণ ঢেলে—যেন ধ্যানস্থ হয়ে। মধুর সুর-ঝঙ্কারে ঘর ভরে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে সামলাতে পারলেন না। "আহা আহা!" বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

তারপর এক অভাবনীয় ঘটনা—নরেন্দ্রের সব কিছু ওলটপালট

---

*মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে।
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন।
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলেছ আপন জনে॥
* * *
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথায় করিও বিশ্রাম।
পথশ্রান্ত হলে শুধাইও পথ, সে পান্থ-নিবাসিগণে॥

হয়ে গেল। সহসা ঠাকুর নরেন্দ্রকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন উত্তর দিকের ঝাঁপঘেরা বারান্দায় এবং আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে করতে বললেন, "এত দিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় আছি—তা একবার ভাবতে নেই?"...পরক্ষণেই কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় ক'রে বললেন, "জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে পুনরায় শরীর ধারণ করেছ।"...

শ্রীঠাকুরের ঐ অদ্ভুত আচরণে তাঁর মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা অনেককাল পরে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমি তো ওরূপ ব্যবহারে একেবারে নির্বাক স্তম্ভিত। মনে মনে ভাবতে লাগলাম—এ কাকে দেখতে এসেছি! এ-তো একেবারে উম্মাদ। নইলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি, আমাকে এই সব কথা বলে? যাই হো'ক, চুপ করে রইলাম। অদ্ভুত পাগল যা ইচ্ছা ব'লে যেতে লাগল। পরক্ষণেই আমায় তথায় অপেক্ষা করতে বলে তিনি ঘরে প্রবেশ করে—মাখন মিশ্রি ও কতকগুলি সন্দেশ এনে নিজের হাতে আমায় খাইয়ে দিতে লাগলেন। আমি যত বলছি—আমাকে খাবারগুলি দিন, আমি সঙ্গীদের সঙ্গে ভাগ ক'রে খাইগে। তিনি তা কিছুতেই শুনলেন না। বললেন, 'ওরা পরে খাবে, তুমি খাও' বলেই সব আমায় খাইয়ে তবে শান্ত

যদি দেখ পথে ভয়েরই আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে॥"

মতান্তরে আছে যে তিনি আর একটি গানও সেদিন গেয়েছিলেন—

"যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে,
আছি নাথ দিবা নিশি, তব আশাপথ নিরখিয়ে।
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ।
কেমনে বলিব তোমায় এসো হে মম হৃদয়ে।
হৃদয়-কুটীর-দ্বার, খুলে রাখি অনিবার।
কৃপা ক'রে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে॥"

হলেন। 'পরে হাত ধরে বললেন, 'বল, তুমি শীঘ্র একদিন এখানে একাকী আসবে? তাঁর একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে অগত্যা আসব বলতে হল। এবং তাঁর সঙ্গে ঘরে এসে সঙ্গীদের কাছে বসলুম।..."

কিন্তু ঘরে এসেই ঠাকুর যেন অন্য লোক। এতটুকু অসংলগ্নতা কোথাও নেই। নানা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করলেন—তাঁর ভাব-সমাধি হল। নরেন্দ্র বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে দেখছেন ঐ রহস্যময় লোকটিকে। ভাবছেন তাঁর কথা মুগ্ধ হয়ে—ইনি যা বলছেন বই পড়া মুখস্থ কথা বলে তো মনে হয় না!

ভগবানকে দেখা যায় কি না ঐ প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন—আশার বাণী শুনিয়ে, "হাঁ গো তাঁকে দেখা যায়। তোমাদের যেমন দেখছি, তোমাদের সঙ্গে যেমন কথা বলছি ঠিক তেমনি ঈশ্বরকেও দেখা যায়—তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়। কিন্তু ওরূপ করতে চায় কে?...লোকে স্ত্রী-পুত্রের জন্য শোকে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, বিষয় বা টাকাকড়ির জন্য কাঁদে, কিন্তু ভগবান্ লাভ হ'ল না ব'লে কে কাঁদে বল দিকি?...তাঁকে পেলুম না ব'লে যদি কেউ কেঁদে কেঁদে তাকে ডাকে, তা হ'লে তিনি নিশ্চয় দেখা দেন।..."

শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি নরেন্দ্রের অন্তরে আঘাত করল। তিনি শুধু নির্বাক হয়ে ভারতে লাগলেন, "...উন্মাদ হ'লেও ঈশ্বরের জন্য এরূপ ত্যাগ জগতে খুব কম লোকই করতে পেরেছে। উন্মাদ হলেও ইনি মহাপবিত্র মহা-ত্যাগী! ইনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন, মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা পূজা ও সম্মান পাবার যোগ্য।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এরূপ নানা কথা ভাবতে ভাবতে নরেন্দ্রনাথ সেদিন কলিকাতায় ফিরে এলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কথাবার্তা ও অদ্ভুত ব্যবহার তার মনে তুমুল ঝড় সৃষ্টি করল। যত ভাবতে লাগলেন, ততই বিস্ময়কর প্রহেলিকাপূর্ণ মনে হ'ল ঐ অর্ধোন্মাদ লোকটির জীবন। তাঁর কথাগুলি

নেহাৎ প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ঐ দিন হ'তে নরেন্দ্রের বলিষ্ঠ মন ও গভীর চিন্তা ঠাকুরের জীবনরহস্য-উদ্ঘাটনে নিয়োজিত হ'ল।

* * *

বাড়িতে ফিরে পড়াশুনাতে মন দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি ভুলতে পারেন না। তাঁর প্রত্যেকটি কথা, প্রতি আচরণ প্রাণে বিপুল বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। সবই দুর্বোধ্য রহস্যপূর্ণ। যত ভাবেন ততই দিশেহারা হয়ে যান—সমাধান পান না। স্বপ্নবৎ বোধ হতে লাগল শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ-মুহূর্তটি। দিনে-রাতে সর্বক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণের নানা চিন্তা তাঁকে অস্থির ক'রে তুলেছিল। এক অনির্বচনীয় দুর্বার আকর্ষণ তাঁর দৃঢ় মনকেও ক'রে ফেলল অভিভূত। অনেক চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হয়ে প্রায় এক মাস পরে একদিন তিনি একাকী দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাত্রা করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন জানতে পেরেছেন নরেন্দ্রের আগমনের সুসমাচারটি। তাই তিনি প্রতীক্ষা ক'রে একাকী বসেছিলেন নিজের ঘরে ছোট তক্তাপোষটির উপর।

নরেন্দ্রকে দেখেই আনন্দে অধীর হয়ে—'এসেছিস্' বলেই হাত ধরে তক্তাপোষের উপর বসালেন এবং সস্নেহে দেখতে লাগলেন নরেন্দ্রকে। চকিতে ঠাকুরের ভিতর অদ্ভুত ভাবান্তর হ'ল। তিনি আবিষ্টের মতো অস্ফুটস্বরে আপন মনে কি বলতে বলতে আস্তে আস্তে সরে আসতে লাগলেন নরেন্দ্রের দিকে। তারপরের ঘটনা নরেন্দ্রনাথই বিবৃত করছেন, "...ভাবলাম, পাগল বুঝি পূর্বদিনের মতো আবার কোন পাগলামি করবে। ওরূপ ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সহসা আমার নিকটে এসে, ডান পা দিয়ে আমায় ছুঁয়ে দিলেন। ঐ স্পর্শ মাত্র মুহূর্তে আমার এক অপূর্ব অনুভূতি হল। চোখ চেয়ে আছি—দেখলুম দেয়াল সমেত সব জিনিসপত্র বেগে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে। এবং সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমার আমিত্বও যেন

এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হ'তে ছুটে চলেছে। দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে গেলাম। মনে হল—অমিত্বের নাশই তো মৃত্যু। সেই মৃত্যু সম্মুখে, অতি নিকটে। নিজেকে সামলাতে না পেরে চীৎকার ক'রে উঠলুম—ওগো! তুমি আমায় একি করলে। আমার যে মা-বাপ আছেন।

অদ্ভুত পাগল ঐ কথা শুনে খল্ খল্ ক'রে হেঁসে উঠলেন, এবং হস্তদ্বারা আমার বক্ষস্পর্শ ক'রে বলতে লাগলেন—'তবে এখন থাক্। একেবারে কাজ নেই, কালে হবে*।' আশ্চর্যের বিষয়, তিনি ওরূপ স্পর্শ ক'রে ঐ কথা বলা-মাত্র আমার সেই অপূর্ব প্রত্যক্ষ এককালে অপনীত হ'ল। প্রকৃতিস্থ হলাম এবং ঘরের ভিতর ও বাইরের সব জিনিস পূর্বের মতো ঠিক অবস্থিত দেখতে পেলাম।...”

চোখের পলকে ঘটেছিল এসব। নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত। তাঁর মনে এক যুগান্তরের সৃষ্টি হয়েছে! একি সম্মোহিনী বিদ্যা! ইন্দ্রজাল—ব্ল্যাক ম্যাজিক! কিন্তু নরেন্দ্রের অন্তর তাতে সায় দিতে চায় না। তিনি দুর্বল নন! প্রবল ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন তিনি। এক নিমিষে তাঁকে অভিভূত করা! তিনি এঁকে অর্ধোন্মাদ মনে করেন। একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। প্রাণের ভিতরটা তোলপাড় করতে লাগল। মহাকবির কথা মনে হ'ল, “স্বর্গে ও পৃথিবীতে এমন সব তত্ত্ব আছে, মানববুদ্ধি-প্রসূত দর্শনশাস্ত্র তার রহস্য ভেদ করতে পারে না।”

কিন্তু তিনি দৃঢ় সংকল্প করলেন—এ'র হাতের ক্রীড়াপুত্তলি আর হবেন না।

* নরেন্দ্র যে ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য এত ব্যাকুল হয়েছিলেন, ঐ ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন নরেন্দ্রকে দিতে চেয়েছিলেন। পরে বুঝলেন যে—এখনও সময় হয় নি। ঐ নির্বিকল্প ব্রহ্মজ্ঞান তিনি নরেন্দ্রকে দিয়েছিলেন কয়েক বৎসর পরে কাশীপুর উদ্যানে। “কাল”—অর্থাৎ সময় একটা বড় জিনিস। কালকে উপেক্ষা করা যায় না। ঐ শুভলগ্নের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

বিশেষ সাবধান হবেন, নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখবেন, সামলে থাকবেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অন্তরে যুদ্ধঘোষণা করলেন।

আবার এও ভাবলেন—যে লোক চকিতে আমার মতো দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন মনকে কাদার তালের মতো ভাঙতে গড়তে পারেন, তিনি তো সামান্য ব্যক্তি নন! অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। তাঁর আত্মবিশ্বাস ও চিত্তের দৃঢ়তার উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত পড়ল।

শ্রীঠাকুর কিন্তু ঐ ঘটনার পরে যেন সম্পূর্ণ অন্যলোক। তিনি নরেন্দ্রকে খাওয়াতে ও আদরযত্ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কত ভাবে স্নেহ প্রকাশ করেন। তাঁর আশ যেন মিটে না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। নরেন্দ্র বিদায় নিতে গেলেন সেদিনকার মতো। ঠাকুর ধরে বসলেন, "বল, আবার শীঘ্র আসবে।" সুতরাং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি কলিকাতায় ফিরে এলেন।

তিনি কিন্তু মনকে ঐ ঘটনার প্রভাবমুক্ত করতে পারছেন না, দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এ রহস্যের মর্ম-উদ্ঘাটনের জন্য বদ্ধপরিকর হ'লেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা তার সমগ্র সত্তাকে অধিকার করেছে। ঐ অদ্ভুত পুরুষপ্রবরের কথা যতই ভাবেন ততই সব কিছু দিবাস্বপ্ন বলে মনে হয়। কিছুই বুঝতে পারেন না। এইরূপ চিন্তাকুল চিত্তে প্রায় সপ্তাহকাল পরে তিনি পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হলেন। ঠাকুরও তাঁকে গ্রহণ করলেন অতি সমাদরে। সেদিন ঠাকুর তাঁকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন পার্শ্ববর্তী যদু মল্লিকের বাগানে। খানিক-ক্ষণ এদিক সেদিক বেড়িয়ে দুজনেই বৈঠকখানা ঘরে এসে বসলেন। দেখতে দেখতে ঠাকুরের ভাবান্তর হল। তিনি সমাধিস্থ হলেন।

নরেন্দ্র ধীরভাবে দেখছেন সব কিছু। ক্রমে ঠাকুর একবার চোখ চেয়ে পূর্বদিনের মতো হঠাৎ তাঁকে স্পর্শ করলেন। বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে নরেন্দ্র অভিভূত হলেন; শত চেষ্টায়ও নিজেকে সামলাতে

পারলেন না। তাঁর বাহ্যসংজ্ঞা সম্পূর্ণ লোপ পেল। কতক্ষণ ঐ অবস্থায় ছিলেন বা কিভাবে জ্ঞান ফিরে এল, তা কিছুই তিনি জানেন না। কিন্তু বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসতে দেখলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বুকে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন—তাঁর মুখে মৃদু মধুর হাসি। তিনি চিন্তান্বিত হলেন এবং নিজেকে মনে করলেন নেহাৎ অসহায়।

ঐ দিনকার ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ পরবর্তিকালে বলেছিলেন, "বাহ্য-সংজ্ঞা লোপ হ'লে নরেন্দ্রকে সেদিন নানা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। সে কে, কোথা হ'তে এসেছে, কেন এসেছে (জন্মেছে), কতদিন পৃথিবীতে থাকবে ইত্যাদি। সেও তদবস্থায় নিজের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে ঐ সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছিল।...তার সম্বন্ধে যা দেখেছিলুম ও ভেবেছিলুম, তার ঐ সময়কার উত্তর ঐ সকলেরই সত্যতা প্রমাণ করে। সে সব গোপন কথা। ও সব কথা থেকেই কিন্তু জেনেছি—নরেন্দ্র যে দিন জানতে পারবে সে কে, সে দিন আর ইহলোকে থাকবে না। দৃঢ়সঙ্কল্প-সহায়ে যোগবলে তৎক্ষণাৎ শরীর ত্যাগ করবে। নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ।"

পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন হয়েছিল যে, সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষিই নরেন্দ্ররূপে জন্মেছেন। এখন সেই দর্শনের সত্যতার প্রমাণ পেয়ে তিনি যেন নরেন্দ্র সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন। এদিকে কিন্তু নরেন্দ্রের দম্ভের উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়ল। দৈবশক্তির কাছে তিনি কতটা অসহায় শিশু। এঁকে পাগল বলা চলে না—ইনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেবমানব এবং সাধনদ্বারা যে অমানব শক্তি অর্জন করেছেন, সে শক্তির কাছে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও শক্তি কত তুচ্ছ। তাঁর চিন্তারাজ্যে একটা মারাত্মক বিপ্লবের সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু কোন জিনিস বা তথ্যকেই পরীক্ষা না ক'রে নেওয়া তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই তিনি ডুবুরির মতো ডুব দিলেন অতল চিন্তা-সাগরে। রামকৃষ্ণই হ'লেন তাঁর পরীক্ষার বিষয় ও চিন্তার বস্তু। তিনি তাঁকে গ্রহণ করবার পূর্বে যথাশক্তি ভাল ভাবে

"যাচিয়ে বাজিয়ে" নিতে চান—বিশ্লেষকের মন নিয়ে ভাল ক'রে বুঝতে চান। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম ত্যাগ-তপস্যা প্রেম পবিত্রতা সরলতা ঈশ্বরময়তা এবং ভাগবত জীবনও নরেন্দ্রের চিন্তার বিষয় হ'ল। তিনি বুঝেছিলেন রামকৃষ্ণ বিশেষ শক্তিশালী মহাপুরুষ। ধর্ম-ইতিহাসে যে-সব দেবমানবের উল্লেখ পাওয়া যায়—তাঁদের সঙ্গে এক আসনে বসবার তিনি যোগ্য।...

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত তিনি বন্ধ করলেন না; বরং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যেন ঐ যাতায়াত বেড়ে যেতে লাগল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে নানাভাবে পরীক্ষা এবং তাঁর প্রত্যেকটি কাজ ও কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। অন্যদিকে একটা দুর্বার আকর্ষণ তাঁকে টেনে আনতে লাগল দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণও নরেন্দ্রকে ক্রমে আকর্ষণ করতে লাগলেন তাঁর দিকে—যেমন শক্তিশালী চুম্বক আকর্ষণ করে লৌহখণ্ডকে।...

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন তিনি কে, কেন দেহধারণ করেছেন এবং নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ। সেজন্য আমরা দেখতে পাই—নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের অনেক পূর্বেই তিনি তাঁর বার্তাবহদের মনোবলে আকর্ষণ করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে কুটীরের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তিনি আর্তস্বরে ডাকতেন, "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, আয়।" তাঁর সে ডাক—সে ধ্বনি শুধু বায়ুমণ্ডলকে স্পন্দিত করেই বিলীন হয়ে যায় নি। তাঁর সেই সার্থক আহ্বানের ফলেই—নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁর বার্তাবহগণ ক্রমে সমবেত হলেন দক্ষিণেশ্বরে। তিনি তাঁদের অজ্ঞাতসারেই তাঁর ভাবী সন্ন্যাসী-পার্ষদদের আধ্যাত্মিক জীবন অতি নিপুণ হস্তে পরিপূর্ণ ও মাধুর্যময় ক'রে গড়ে তুলবার জন্য সচেষ্ট হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের মধ্যে নরেন্দ্রের একটা বিশেষ স্থান ছিল। তিনি যুগধর্ম প্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্ররূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলে-

ছিলেন, "নরেন লোকশিক্ষা দেবে।" ধর্মের গ্লানি-নাশরূপ সুমহৎ কার্যের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। তাই বিরুদ্ধ বিজাতীয়, ও অনিষ্টকর ভাব থেকে নরেন্দ্রকে রক্ষা করার জন্য, তাঁর প্রতি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ আকর্ষণ, অদ্ভুত ভালবাসা ও সতর্ক দৃষ্টি। নরেন্দ্র কয়েক দিন দক্ষিণেশ্বরে না এলে তিনি তাঁকে দেখবার জন্য অধীর হয়ে পড়তেন। তা ছাড়া নরেন্দ্রের জীবনকে তাঁর ভাবপ্রচারের সর্বাঙ্গসুন্দর ও শক্তিশালী যন্ত্রে রূপান্তরিত করার জন্য অনেক শিক্ষাদীক্ষা ও আধ্যাত্মিক শক্তি-সংক্রমণের প্রয়োজন ছিল।...

এ কিন্তু দৈহিক ভালবাসা নয়—জৈব ভালবাসা নয়। এ ছিল ঐশী প্রেম। যে প্রেমের আকর্ষণে রাজপুত্র স্ত্রীপুত্র রাজসিংহাসন ছেড়ে চলে যায় বনবাসে চীরধারী হয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণও সেই অপার্থিব প্রেমের দ্বারা আকর্ষণ করতেন নরেন্দ্রনাথকে। এবং তাঁর জীবনকে নির্মোহ করবার জন্য, সর্বতোভাবে দারৈষণা বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা হ'তে মুক্ত ক'রে পরমতত্ত্ব ধারণের ও প্রচারের উপযুক্ত আধার করার জন্য সতত প্রয়াসী। নরেন্দ্র কি পাষাণ ছিলেন? না। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অহৈতুকী ভালবাসার গভীরতা বুঝতেন। অনুভব করতেন প্রাণে প্রাণে; তবু তিনি প্রথম প্রথম ধরা দিতে চাইতেন না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কেন যে তাঁকে এত ভালবাসেন তা তিনি তখনও জানেননি। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ষোল আনা যাচাই না ক'রে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবেন না—এই ছিল নরেন্দ্রের মনের ভাব। পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনের একমাত্র আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং নরদেহে অবতীর্ণ শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলে মেনেছিলেন। কিন্তু তা এক দিন দু দিনে হয়নি। তিনি দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিপদে পরীক্ষা করেছেন। তাঁর প্রতিটি কার্য, প্রতিটি ব্যবহার—প্রত্যেক অলৌকিক দর্শন বিচার ক'রে দেখেছেন। সোনা যেমন মার্জন ও ঘর্ষণের দ্বারা উজ্জ্বল হয়, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনও এই পরীক্ষার ফলে আরো উজ্জ্বলতর ভাবে প্রতিভাত হয়েছিল।

সে দিন নরেন্দ্রনাথ বিভ্রান্ত মনে দক্ষিণেশ্বর হ'তে বাড়িতে ফিরে এলেন। বি, এ, পড়ছেন। পড়াশুনায় মন দিলেন। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। সমাজের রবিবাসরীয় উপাসনার সময় তাঁর মধুর প্রার্থনাসঙ্গীত সকলকেই মুগ্ধ করে। নানাস্থানে বিভিন্ন ধর্মালোচনা ও প্রার্থনায় তিনি যোগ দেন। সঙ্গীত-চর্চাও ছাড়েন নি। বন্ধুবান্ধবদের সম্মেলনেও তাঁকে যেতেই হয়। সমাজসংস্কার বিধবাবিবাহ খাদ্যাখাদ্য-বিচার জাতি-বিচার প্রভৃতি বিষয়ে তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় বিচারতর্কে প্রবৃত্ত হন।*...

ঠাকুরের জীবন তাঁর কাছে রহস্যপূর্ণ মনে হ'ত। সত্যলাভ তাঁর জীবনের লক্ষ্য। তার জন্য তিনি জীবন পণ করেছেন। সত্যদ্রষ্টা পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে ঐ পথে সাহায্য করতে পারবেন না—তাও তিনি জানতেন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি তখনও কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর অলৌকিক শক্তি বিস্ময়ের কারণ হয়েছে।...

প্রখর-মেধা ও উর্বর-মস্তিষ্ক সবল-দেহ বলিষ্ঠ-মন এবং পৃথিবী-পর্যটনক্ষম দুটি পা নিয়ে তিনি সত্যান্বেষণের পথে তো চলতে পারেন! এই সঙ্কল্প নিয়ে তিনি পুরুষকারের উপর বেশী জোর দিয়ে কঠোর কৌমার্যব্রত ও কৃচ্ছ্র সাধনে ব্রতী হলেন। বাড়িতে স্বাধীন জীবনযাত্রা ও ধ্যান ভজনের অসুবিধা বোধ ক'রে, পাশেই মাতামহীর বাড়ীর একটি প্রকোষ্ঠে তিনি একাকী থাকতেন। ঘরটি অতি নির্জন ও ক্ষুদ্র। আসবাবপত্র কিছু নেই। তিনি মেঝেতে শয়ন করেন, চারিদিকে বই পত্র ছড়িয়ে আছে। সামান্য চা ও তামাকের সরঞ্জাম। মাঝে মাঝে চা খান, তামাক খান, দিন রাত পড়েন ও চিন্তা করেন। রাত রাত ধ্যানে কেটে যায়। কিন্তু সমাধান কিছুই পান না। যতক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকেন তখন মন থেকে সব চিন্তা নির্বাসিত ক'রে বিমল আনন্দ ও অনির্বচনীয়

* শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "নরেন যেন খাপখোলা তরোয়াল।"

প্রশান্তি অনুভব করেন। কিন্তু পরক্ষণেই শত চিন্তার দংশনে তিনি অস্থির হন। তাঁর সংগ্রাম নিদ্রাতেও চলত।

যে দিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে প্রথম শুনলেন যে—ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, সেদিন থেকে তাঁর মনে ঐ কথাগুলিই কেবল আনাগোনা করছিল। এও তিনি বুঝেছিলেন যে, একথা গুলি অর্থহীন প্রলাপমাত্র নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে ঈশ্বরদর্শন ক'রেই বলেছেন। তবু তাঁর বিদ্রোহী মন শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না।

তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। খৃষ্টধর্ম-প্রচারকদের বক্তৃতা শুনেছেন। পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী। শ্রীরামকৃষ্ণ কালী-উপাসক। ব্রহ্মই তাঁর কালী।* নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যান কিন্তু কালী-মন্দিরে যান না, কালীমূর্তিকে তিনি প্রণামও করেন না।...

এদিকে নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এলেই শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে অধীর হয়ে পড়েন. অনেক সময় তাঁকে দেখামাত্র ঠাকুরের মন ভাবরাজ্যে চলে যেত। সহজাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে তিনি মহানন্দে কত আধ্যাত্মিক অনুভূতি—কত অলৌকিক দর্শনের কথা বলতেন। নরেনকে সস্নেহে গান গাইতে বলেন, এদিকে গান শুনতে শুনতে তিনি সমাধিস্থ হয়ে যান। "যো কুছ্ হ্যায়, সো তুঁহী হ্যায়"—এ গানটি শ্রীরামকৃষ্ণের বড় প্রিয়। ঐটি না শোনা পর্যন্ত তিনি তৃপ্ত হতেন না। নরেন্দ্রকে খাইয়ে নানা ভাবে আদর যত্ন ক'রেও যেন তাঁর আশ মেটে না। নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এলে সেদিন আনন্দ-উৎসব। তাঁর আহ্লাদ আর ধরে না। কিন্তু

---

* 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মের' সীমিত ব্যাখ্যা যারা করে, 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এ তত্ত্ব গ্রহণ ক'রেও প্রতীক ও মূর্তিতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও সঙ্কীর্ণ মনোভাব তখনো নরেন্দ্রের চিন্তার বিষয় হয়নি। 'যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার' 'যিনি সগুণ তিনিই নির্গুণ', 'কালীই ব্রহ্ম'—এই মর্মবাণী তখনো নরেন্দ্রের অন্তর গ্রহণ করেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের প্রভাবে পরে কেশব প্রভৃতির মতো তাঁর মতেরও পরিবর্তন হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনাদি নরেন্দ্র মোটেই বিশ্বাস করেন না। এক কথায় সব উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "আপনি ঈশ্বরীয় রূপ-টুপ যা দেখেন, সব মাথার খেয়াল।"...

নরেন্দ্রের দৃঢ় কথায় রামকৃষ্ণ কখনো বিচলিত হয়ে ভাবেন, "তবে কি দর্শনাদি সব ভুল? এসব কি মাথার খেয়াল?"

এ দুর্ভাবনার অন্ত নেই! একদিন তিনি অস্থির প্রাণে মন্দিরে গিয়ে ৺ভবতারিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা এতকাল তুই আমায় যা দেখিয়েছিস্ তা কি ভুল? নরেন যে বলে?" তখনই মা বললেন,—"ওর কথা শুনিস্ কেন? কিছুদিন পরে ও (নরেন্দ্র) সব সত্য ব'লে মানবে।" দেবীর মুখের কথা শুনে তিনি শান্ত হন।...

এদিকে নরেন্দ্র কোন সপ্তাহে দক্ষিণেশ্বরে না এলে শ্রীঠাকুর অস্থির হ'য়ে পড়েন। লোক দিয়ে ডেকে পাঠান। তাতেও না এলে তিনি স্বয়ং মিষ্টান্নাদি নিয়ে হাজির হন নরেন্দ্রের কাছে। কখনো সঙ্গে করে নিয়ে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। নরেন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বাহ্যতঃ মিল দেখতে পাওয়া যেত না। নরেন্দ্র রামকৃষ্ণের কোন কথাই নেন না—হাসি ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রগত প্রাণ। নরেন্দ্রের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেন।

সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো কয়েকজন যুবক দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করেছে। সকলেই বৈরাগ্যবান্ ভক্তিমান্ ও মুমুক্ষু। ঈশ্বর-দর্শনের জন্য ব্যাকুল। শ্রীরামকৃষ্ণ যুবকদের সকলকেই ভালবাসেন, তাদের ধর্মজীবন গড়ে তুলবার জন্য তাঁর অকুণ্ঠ চেষ্টা। তাদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সাধন-ভজনের উপদেশ দেন। তাঁর পূত সঙ্গলাভ ও শক্তি-সংক্রমণের ফলে তাদের আধ্যাত্মিক জীবনে কত অলৌকিক দর্শন ও দিব্যানুভূতি হয়। কীর্তন করতে করতে কেউ ভাবস্থ হয়—কত অশ্রু

পুলক কম্পন! সকলের ধর্মজীবন গড়ে তুলবার দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। শুধু দক্ষিণেশ্বরে নয়, বাড়িতেও কে কেমন ধ্যান করে, দর্শনাদি কিছু হয় কিনা—সব খবর রাখেন এবং প্রয়োজন মত তাদের সাধনপথের বিঘ্ন অপসরণ ক'রে দেন।...

পাঁচ

নরেন্দ্রের সঙ্গে শ্রীঠাকুরের সম্বন্ধ যেন আরো নিবিড়, যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নরেন্দ্র এলে তাঁর প্রেমসিন্ধু যেন উজান বয়। নরেন্দ্র উপস্থিত নেই—তিনি কিন্তু তাঁর কথা ব'লে তাঁর প্রশংসা ক'রে আত্মতৃপ্তিলাভ করেন। একদিন যুবকভক্তদের শুনিয়েই বলছেন, "এরা সব ছেলে মন্দ নয়। দেড়টা পাশ করেছে (অর্থাৎ এফ, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে), শিষ্ট শান্ত ধর্মপ্রাণ। কিন্তু নরেনের মত একটি ছেলেও আর দেখতে পেলুম না। যেমন গাইতে-বাজাতে বলতে-কইতে লেখাপড়ায়, তেমনি ধর্ম বিষয়ে। 'সে রাতভোর ধ্যান ক'রে। ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না। আমার নরেনের ভিতর এতটুকু মেকি নেই, বাজিয়ে দেখ টং টং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি যেন চোখকান টিপে কোন রকমে দু তিনটা পাশ করেছে। ব্যস্, এই পর্যন্ত। ঐ করতেই তাদের সব শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেনের কিন্তু তা নয়, হেসে খেলে সব কাজ ক'রে—পাশ করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়। সে ব্রাহ্মসমাজে যায়, সেখানে ভজন গায়। কিন্তু অন্য ব্রাহ্মের মতো নয়—সে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতিঃদর্শন হয়। সাধে নরেনকে এত ভালবাসি?"

নরেন্দ্রও কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে ছুটে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। সপ্তাহে দু-তিন দিনও। নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত যান, কেশবাদি ব্রাহ্মনেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশেন, রামকৃষ্ণ সবই জানতেন। তিনি তাতে কোন আপত্তি করতেন না, বরং খুশীই হতেন। তাঁর ভিতর সংকীর্ণতার লেশ মাত্র ছিল না। তাঁর উদার মন, উদার ভাব।...

একবার কোনও কারণে নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন আসেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিদিন তাঁর আগমনপ্রতীক্ষা ক'রে পথপানে চেয়ে থাকেন। রোজই আশা করেন নরেন্দ্রকে। অনেকদিন প্রতীক্ষা ক'রেও যখন দেখলেন নরেন্দ্র এল না, তখন তিনি একান্ত অধীর হলেন। অন্তরের অভাববোধ চেপে রাখতে না পেরে সেদিনই কলিকাতায় গিয়ে নরেন্দ্রকে দেখে আসবেন স্থির করলেন। পরে মনে পড়ল—সেদিন রবিবার। নরেন্দ্র যদি বাড়িতে না থাকে—বিশাল কলিকাতায় কোথা তিনি খুঁজে বেড়াবেন। পরক্ষণেই মনে হ'ল—রবিবারে নিশ্চয়ই সে ব্রাহ্মসমাজের সান্ধ্য উপাসনায় ভজন গাইতে যাবে। সেখানে গেলেই দেখা পাবেন।

সন্ধ্যাবেলায় সমাজের উপাসনা আরম্ভ হয়েছে। এমন সময় ভাবস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মমন্দিরে প্রবেশ ক'রে যেখানে বেদীতে বসে আচার্য উপাসনা করেন, সেদিকে অগ্রসর হ'লেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আকস্মিক আগমনে সমাজে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ সহসা বেদীর নিকট উপস্থিত হ'য়ে সমাধিস্থ হ'য়ে পড়লেন। তাঁর ঐ সমাধি দেখবার জন্য অনেকে ব্যস্ত। নরেন্দ্রনাথ শ্রীঠাকুরকে তদবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি কেন এসেছেন বুঝতে পারলেন। তিনি তাড়াতাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সমাজ-মন্দিরে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা হ'ল। বহু লোক শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল। জনতাকে শান্ত

করার অন্য কোন উপায় না দেখে সমাজগৃহের সব গ্যাসের আলো নিবিয়ে দেওয়া হল। ফলে আরো বেড়ে গেল গোলমাল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষিরূপে দাঁড়িয়ে রইলেন নরেন্দ্রনাথ। সমাজের লোকদের এ অশোভন ব্যবহারে তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হলেন। সমাধি ভঙ্গ হ'লে তিনি কোনপ্রকারে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন সমাজগৃহ থেকে। [illegible] তাঁকে সঙ্গে ক'রে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এলেন। রামকৃষ্ণ [illegible] বিক্ষোভ। সমাজের লোকেরা তাঁর প্রতি যে [illegible] ব্যবহার করেছে—তা একবারও তাঁর মনে আসেনি। তিনি যা চাইছিলেন—তা পেয়েছেন। আর কোনি দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণকে এভাবে অপমানিত হ'তে দেখে নরেন্দ্রের প্রাণে কিন্তু দারুণ আঘাত লেগেছে। তিনি তাঁকে অনুযোগের সুরে বলতে লাগলেন, "আপনি কেন এখানে এলেন? এরা আপনার এতটুকু মর্যাদা রাখল?"—আরো অনেক কঠোর বাক্য বলেছিলেন মনের দুঃখে। শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে অপমানিত হয়েছেন, এ তাঁর পক্ষে অসহনীয়।

শুধু তা-ই নয়—তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের এতটা টানের কারণ বুঝতে না পেরে নরেন্দ্র একদিন বলেছিলেন, "পুরাণে আছে ভরত রাজা হরিণ ভাবতে ভাবতে মৃত্যুর পরে হরিণ হয়েছিলেন। একথা যদি সত্য হয় তো আপনারও আমার প্রতি এতটা আকর্ষণের পরিণাম ভেবে দেখা উচিত।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সরল বালক। নরেনের মুখে ঐ কথা শুনে তিনি বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। বললেন, "তাই তো রে, ঠিক বলেছিস্। তাহ'লে কি হ'বে? আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারিনে।"

তাতেই হল না। তিনি দারুণ অনুশোচনায় দগ্ধ হ'য়ে গেলেন মন্দিরে ৺ভবতারিণীর কাছে। কিছুক্ষণ পরে মন্দিরে থেকে ফিরে এসে বলছেন
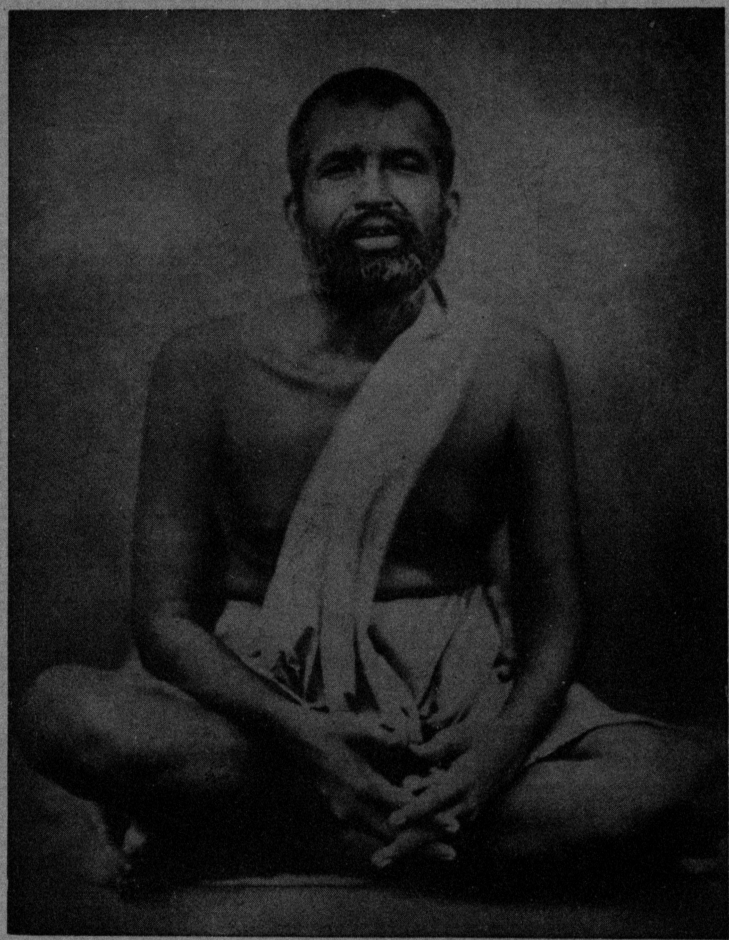
হাসতে হাসতে, "যা শালা, তোর কথা শুনব না। মা বলেছেন—'তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ ব'লে জানিস্ তাই অত ভালবাসিস্। যে দিন ওর ভিতর নারায়ণকে দেখতে পাবি নে, সে দিন ওর মুখদর্শনও করতে পারবি নি'।"

নরেনের সব অভিযোগ এক কথায় ভেসে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্ররূপে ভালবাসতেন না। সে দেখতে শুনতে গাইতে বাজাতে পড়াশুনায় অনন্যসাধারণ—এ সব গুণের জন্যও ভালবাসতেন না। তাঁকে নরঋষির অংশাবতার– তাঁর প্রধান বার্তাবহ ব'লে জানতেন, তা-ই ছিল অত দুর্বার আকর্ষণ নরেনের প্রতি। নরেন এলেই তিনি অস্থির হ'য়ে পড়েন। নহবতে সারদা দেবীকে খবর পাঠাতেন, "ওগো, নরেন এসেছে, বেশ ভাল ক'রে রান্না কর।" মোটা মোটা রুটি, ঘন ছোলার ডাল নরেনের প্রিয়। শ্রীসারদা দেবীও তা-ই রান্না ক'রে পাঠিয়ে দিতেন ঠাকুরের ঘরে।

*　　*　　*

ততদিনে দক্ষিণেশ্বরে আরো যুবক ভক্তের সমাগম হয়েছে। তিনি সকলেরই ধর্মজীবন অতি সন্তর্পণে গড়ে তুলছেন। যার সাকারে বিশ্বাস তাকে সাকারভাবে, কারো বিশ্বাস নিরাকারে—তাকে সেই ভাবেই সাধনোপদেশ দেন। কেউ দেবদেবী বিশেষে অনুরক্ত—আবার কেউ অদ্বৈতবাদী। সকলেরই স্থান আছে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তিনি সর্বভাবময়—তাইতো সকলভাবের পথিককে তিনি চালিত করতে পারতেন ভূমানন্দের পথে—অনন্তের দিকে। প্রত্যেক যুবক ভক্তই তাঁকে পিতার অধিক ভালবাসেন, ভক্তি করেন। বাবুরাম সবে কয়েক দিন মাত্র দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অহৈতুক ভালবাসায় তাঁর মন প্রাণ গলে গিয়েছে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর ভালবাসা-প্রসঙ্গে গর্ভধারিণী মাকে বললেন, "আহা! তিনি আমায় কত ভালবাসেন! তার তুলনা নেই। তুমিও তত ভালবাস না।"

ছেলের মুখে ঐ কথা শুনে বাবুরামের মা বিশেষ ক্ষুণ্ণা হলেন। বললেন অভিমানের সুরে, "সে কিরে! আমি মা—আমি তোকে ভালবাসিনে?"

গর্বভরে বললেন বাবুরাম, "না। তুমিও তাঁর মতো আমায় ভালবাস না।"

নির্বাক হলেন বাবুরামের মা। তাঁর বিস্ময় লাগল—আমার চাইতেও ছেলেকে কেউ বেশী ভালবাসতে পারে? বাস্তবিক তেমনই ছিল শ্রীঠাকুরের ভালবাসা—সীমাহীন অন্তহীন নিবিড় গভীর। শ্রীরামকৃষ্ণ পক্ষিমাতার মতো ভক্তদের আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন স্নেহবক্ষে। দেহের তাপ দিয়ে করছিলেন বর্ধিত।...এবং সময় বুঝে ঐ যুবকদের ক্রমে আত্মজ্ঞানে অধিরূঢ় করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য আকর্ষণে যুবকদের গৃহের আকর্ষণ, পিতা-মাতার আকর্ষণ কমে গেল। কলনাদিনী গঙ্গার তীরে সেই দক্ষিণেশ্বরই তাদের প্রিয় হ'য়ে উঠল। তারা বেশী বেশী আসত দক্ষিণেশ্বরে, রাত্রেও থেকে যেত।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে তো নিদ্রা নেই। জগতের কল্যাণ-চিন্তায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় রাত কেটে যেত। শেষ রাত্রে মাতোয়ারা হ'য়ে মধুর কণ্ঠে কখনো বা মা'র নাম করেন—হাততালি দিয়ে পরমপাবন হরিনামে মত্ত হয়ে যান। পরিধান-বস্ত্রের ঠিক্ থাকে না। যুবক ভক্তদের কাছে গিয়ে বলেন, "ওরে তোরা উঠ। ব'সে ধ্যান কর—মায়ের নাম কর। এখানে কি ঘুমোতে এসেছিস্?"

শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর কানে যেতেই সকলে ধড়মড়্ ক'রে উঠে পড়েন। ধ্যান করতে বসেন। কি ভাবে ধ্যান করতে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ তা দেখিয়ে দেন। কারো ভিতর বা শক্তিসঞ্চার করেন। শিষ্যগণ গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যায়।

পূর্বাকাশ রক্তিম হবার পূর্বেই মন্দিরে দেবতার জাগরণ ঘোষিত হয় মধুর ঘণ্টাধ্বনিতে। দীপাবলী জ্বলে উঠে—বাজতে থাকে রোশনচৌকি। মন্দিরে মঙ্গলারাত্রিক আরম্ভ হয়, কাঁসর ঘণ্টা করতাল বেজে উঠে। ঐ ঐক্যতান মিশে

যায় গঙ্গার কলতানের সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরেও মধুর প্রার্থনা-সঙ্গীত বা কীর্তন হয়। তিনি ভাবাবেশে নৃত্য করেন—কখনো বা সমাধিস্থ হ'ন। সারাদিনই কত ভক্ত-সমাগম। তাঁর উদ্দীপনাময় ধর্মালাপ শুনে সকলের মন চলে যায় এক লোকাতীত সত্তায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের অন্তর বুঝে যার যেখানে বেদনা তা মুছে দিতেন। তারকনাথ দক্ষিণেশ্বরে প্রথম গিয়েছেন। ঠাকুরকে দেখেই তাঁর মনে হ'ল যেন মা বসে আছেন—জগজ্জননী মা। প্রণাম করতে মাথা নীচু করেছেন, অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ দু'হাত বাড়িয়ে মায়ের মতো তারকের মাথাটি বুকে টেনে নিলেন। ভরে দিলেন স্নেহ ও আদরে। অল্প বয়সে মাতৃহারা তারকনাথের মন থেকে মায়ের অভাব চিরতরে মুছে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই পেলেন হারানো মাকে। আসলে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মা—জগজ্জননী আদ্যাশক্তি, মা। তাই তিনি রক্ষণ-পালন ভরণপোষণ এবং ঐহিক পারত্রিক কল্যাণের মাধ্যমে তারকের অন্তরে মায়ের স্থান অধিকার করলেন। ভক্তদের ধর্মজীবন গড়ে তুলবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের চেষ্টার অন্ত নেই। তাঁর যোগদৃষ্টির সামনে তাদের অন্তরের চিত্র ফুটে উঠত। তিনি তাদের সাধন-পথের সব অন্তরায় দূর ক'রে দিতেন। আধ্যাত্মিক শক্তিবলে সকলের অপূর্ণতা ক'রে দিতেন পূর্ণ।...

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার ধারা ছিল অভিনব ও অনুপম। তিনি শিষ্যদের ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রেখে জীবনের পূর্ণতা বিধান করতেন। কারো ভাব তিনি বিন্দুমাত্রও নষ্ট করতেন না। নরেন্দ্রকে তিনি সর্বোচ্চ অধিকারী বলে জানতেন। অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মজ্ঞান সর্বোচ্চ জ্ঞান। তিনি নিজেই বলতেন, "অদ্বৈতানুভূতি ধর্মজীবনের শেষ কথা।" এবং তখনকার ভক্তদের মধ্যে একমাত্র নরেন্দ্রই ছিলেন সেই অদ্বৈতজ্ঞানের অধিকারী।...

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ একান্তে নরেন্দ্রকে অদ্বৈতজ্ঞানের উপদেশ করছেন। বোঝাচ্ছেন জীবব্রহ্মের ঐক্যবোধের কথা "সর্বংব্রহ্মময়ং জগৎ"—এই

অনুভূতিতে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। নরেন্দ্র সব কথা শুনলেন, কিন্তু ধারণা করতে পারলেন না। সন্দেহে তাঁর মন দুলছে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি গেলেন পাশের বারান্দায় হাজরা মশাই-এর কাছে। 'সবই ব্রহ্ম'—এই আলোচনা-প্রসঙ্গে নরেন্দ্র বললেন, "...তা কি কখনো সম্ভব?...ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর—যা কিছু দেখছি সবই ঈশ্বর আর আমরাও ঈশ্বর!"

হাজরা মশাই একটু ফোড়ন কেটে বললেন, "তা কি কখনো হয়? তুমিও যেমন!" ঐ কথায় দু'জনের মধ্যে হাসির রোল উঠল। শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতানুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নরেনকে অদ্বৈতজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছিলেন। তখনো তাঁর মন সেই উচ্চ ভূমিতে রয়েছে। তিনি ভাবাবেশে বেরিয়ে এসে—"তোরা কি বলছিস্ রে?"—বলেই নরেনকে স্পর্শ ক'রে সমাধিস্থ হ'লেন। তাঁর মুখে স্বর্গীয় হাসি। মুখমণ্ডল দিব্যানন্দের আভাতে সমুজ্জ্বল। ঠাকুরের ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে নরেন্দ্রের মনে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এল। চোখের সামনে থেকে যেন সরে গেল একখানি পর্দা। তিনি সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করতে লাগলেন।

ঐ দিনকার ঘটনা সম্বন্ধে তিনি পরবর্তিকালে বলেছিলেন, "...ঠাকুরের ঐ অদ্ভুত স্পর্শে মুহূর্তে ভাবান্তর উপস্থিত হল। স্তম্ভিত হ'য়ে সত্য সত্যই দেখতে লাগলাম—ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু নেই।...সে ঘোর কিছুতেই কমে না। বাড়িতে এলাম—সেখানেও তাই। যা কিছু দেখছিলাম সবই ব্রহ্ম।...খেতে বসেছি, দেখি থালা গ্লাস পরিবেষক সবই তিনি, আমিও তিনি ছাড়া আর কিছু নই। দু'এক গ্রাস খেয়েই বসে রইলাম। 'বসে আছিস্ কেন রে, খা-না।' মা'র ঐ কথায় একটু হুঁশ হ'তে আবার খেতে আরম্ভ করলুম।"

একটা বিরাট অনুভূতির রাজ্যে চলে গিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ। সেখানে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই। সবই চৈতন্যময়। সেই ভাবের কিছুমাত্র উপশম হচ্ছে না। রাস্তায় চলেছেন—একটি গাড়ী বেগে আসছে। দেখছেন, কিন্তু অন্যদিনের মতো গাড়ীর সামনে থেকে সরে যাবার ইচ্ছা হচ্ছে না। এতটুকু ভয় নেই—সবই ব্রহ্ম।

ঐ অবস্থা দেখে তাঁর মা ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন—কঠিন অসুখ হয়েছে। বলতেন, "ও আর বাঁচবে না।"

কিছুদিন পরে সর্বত্র ব্রহ্মভাব একটু কমলে নরেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে—এ-ই অদ্বৈত বিজ্ঞানের আভাস। কাশীপুর উদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে অদ্বৈত ব্রহ্মানুভূতিতে উন্নীত করেছিলেন। সে ঘটনা আমরা পরে পাব। এই "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে"—ই বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়। মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।" "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম ক'রে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"। সকলের ভিতর ঐ ব্রহ্মচেতনা জাগ্রত করা-ই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি সকলেরই ললাটে এঁকে দিয়েছিলেন ব্রহ্মের তিলক।...

* * *

নরেন্দ্রনাথ এলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এমনও হয়েছে নরেনকে দূর হ'তে দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে "ঐ ন—, ঐ ন—" বলতেই তিনি সমাধিস্থ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের মধ্যে এই গোপন সম্বন্ধটি চিরকালের জন্য রহস্যপূর্ণ। তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষিকে পেতেন নরেনের মধ্যে।

কিন্তু শীঘ্রই আবার এ ভূমিকার পরিবর্তন দেখা গেল। এমন একটি সময় এল যে, ঠাকুর নরেনের সম্বন্ধে বাহ্যতঃ সম্পূর্ণ উদাসীন। নরেন্দ্র

দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন—ঠাকুর তাঁর সঙ্গে একটি কথাও বললেন না। খানিক অপেক্ষা ক'রে তিনি বাহিরে চলে গেলেন। আবার এলেন ঘরে—ঠাকুর অন্যের সঙ্গে কথা বলছেন, কিন্তু তাঁর দিকে একবারও মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন না। পুনরায় বেরিয়ে গেলেন। খানিক পরে আবার এলেন ঘরে। ঠাকুর —তাঁকে দেখেই পাশ ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তাঁর এই ঔদাসীন্য —তুষ্ণীভাব নরেন্দ্রের পক্ষে অসহ্য হ'ল। তাঁর বুক ফেটে কান্না আসতে লাগল। কিন্তু তিনি ফেটে পড়ার লোক ছিলেন না। সামলে নিলেন নিজেকে। আস্তে আস্তে ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বাড়ীতে ফিরলেন!

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। নরেন আসেন প্রতি সপ্তাহে—কিন্তু শ্রীরাম-কৃষ্ণের ঔদাসীন্যের এতটুকু পরিবর্তন নেই। অনেকদিন পরে ঠাকুর হঠাৎ নরেনকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা! আমি তো তোর সঙ্গে একটা কথাও বলিনে, তবু তুই এখানে কেন আসিস্ বল্ দেখি?"

সহজকণ্ঠে বললেন নরেন্দ্র, "আমি কি আপনার কথা শুনতে আসি? আপনাকে ভালবাসি—না দেখে থাকতে পারিনে—তাই আসি।"

এর চাইতে বড় কথা আর কি আছে? এটুকুই চাইছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্র তাঁকে ভালবেসেছে—খুব খুশী হলেন তিনি। বললেন, "আমি তোকে বিড়ে (পরীক্ষা ক'রে) দেখছিলাম। আদরযত্ন না পেলে তুই পালাস কি না। তোর মতো আধারই এতটা সইতে পারে।..."

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র অভেদ-আত্মা। একদিন ঠাকুর থেলো হুঁকোতে তামাক খাচ্ছেন। নরেন কাছে বসে। দু-এক টান টেনেই ঠাকুর হাত বাড়িয়ে হুঁকোটি ধরলেন নরেনের মুখের কাছে। বললেন; "খা খা। আমার হাতেই খা।" নরেন যত বলছেন, "সে কি। আপনার হাত যে এঁটো হয়ে যাবে। হুঁকো এঁটো হ'য়ে যাবে।"

নরেনের কোন আপত্তিই কানে তুললেন না শ্রীরামকৃষ্ণ। "তুই তো বড়

বোকা! তুই আর আমি কি পৃথক্। তুই আর আমি যে এক।" ঠাকুরের হাতে মুখ দিয়ে নরেনকে তামাক খেতে হ'ল—তবে ছাড়লেন।...

ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তি বিদ্রোহী নরেনকে বশীভূত করল। তিনি ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণকে পথ-প্রদর্শক গুরু ইষ্ট ব'লে মেনে নিলেন। সেই মেনে নেবার পেছনে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি। "করিষ্যে বচনং তব"—এই স্বীকৃতির পূর্বে—অর্জুনকে বাগ মানাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে খুব বেগ পেতে হয়েছিল। যার ফলে—অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা। বিশ্বরূপ দেখিয়েও পুরোপুরি কাজ হয়নি। পার্থকে যন্ত্র ক'রে যেমন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ধর্মসংস্থাপন-কার্য সুসম্পন্ন করেছিলেন, তেমনি বিবেকানন্দকে যন্ত্র করেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর যুগ-বাণী যুগ-আদর্শ উপস্থাপিত করেছিলেন জগতের সামনে।...

নরেন্দ্রের মন ঈশ্বরলাভের জন্য খুব ব্যাকুল হয়েছে। দিনের পর দিন তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। ঠাকুরের কাছে আরো ঘন ঘন আসেন। রাত্রেও থেকে যান দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরও নরেনকে হাত ধরে নিয়ে চলেছেন অসীমের পথে।...

একদিন ঠাকুর নরেনকে পঞ্চবটীর নিভৃতে নিয়ে গিয়ে বললেন, "অনেক কাল হ'ল মা আমার ভিতর অণিমাদি বিভূতিসকল দিয়েছেন। কিন্তু আমার তো ওসব ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি।...মা'কে বলে তোকে ঐ-সকল বিভূতি দিতে চাই। মা জানিয়ে দিয়েছেন তোকে তাঁর অনেক কাজ করতে হ'বে। ঐ সকল শক্তি তোর ভিতর থাকলে প্রয়োজনমত কাজে লাগাতে পারবি। কি বলিস?" নরেন্দ্র জানতেন শ্রীঠাকুর ফাঁকা কথা বলেন না। তাঁর অলৌকিক শক্তির অনেক পরিচয় তিনি পেয়েছেন। তাই তিনি একটু চিন্তিত হলেন। পরে প্রশ্ন করলেন, "এই সব বিভূতি ঈশ্বরলাভে সহায়তা করবে কি?"

শ্রীরামকৃষ্ণ, "না। সে বিষয়ে কিছু সাহায্য হবে না। কিন্তু ঈশ্বর লাভের পর তাঁর কাজ যখন করবি, তখন ওসব বিশেষ কাজে লাগতে পারে।"

নরেন তখনই জবাব দিলেন, "মশাই, তা হ'লে ওসবে আমার প্রয়োজন নেই ;...আগে ঈশ্বরলাভ।...বিভূতিসকল এখন লাভ ক'রে যদি জীবনের লক্ষ্যের বিষয়ই ভুলে যাই—তা হ'লে যে সর্বনাশ হবে !"

নরেনের কথা শুনে ঠাকুর বিশেষ প্রসন্ন হলেন। কত বড় আধার নরেন—এক কথায় অণিমাদি সব বিভূতি ত্যাগ করল !

ছয়

বি, এ পরীক্ষা নিকটবর্তী। বাড়িতে পড়াশুনার ক্ষতি হয়—নানা গোলমাল। তাই নরেন্দ্রনাথ বাড়ির পাশেই মাতামহীর বহির্বাটীর দ্বিতল গৃহের একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আশ্রয় নিয়েছেন। রাত জেগে পড়াশুনা করেন। দিনের বেলায় বন্ধুবান্ধবদের জটলা, ব্রাহ্মসমাজ ও দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত, আরো শত কাজ।...তাঁর মনঃসংযম ও স্মৃতিশক্তি ছিল অদ্ভুত। বি, এ পরীক্ষার মাস খানেক মাত্র বাকি। অথচ বিপুলকায় ইংলণ্ডের ইতিহাস একবারও পড়া হয়নি। উপায় ? অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি ইতিহাসের গ্রন্থগুলি পড়তে আরম্ভ করলেন দিন-রাত ক'রে। এবং তিন চার দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ ইতিহাস আয়ত্ত হয়ে গেল।

বি, এ পরীক্ষার দিন খুব ভোরেই উঠছেন। বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছেন চোরবাগানে সহপাঠী দাশরথি সান্যালের বাড়িতে। তখনো সকলেই শুয়ে আছে দেখে তিনি উদাত্তকণ্ঠে গান ধরলেন :

"মহা-সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপতি,
তোমারই রচিত ছন্দে মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্তের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,
আমিও তোমারি দ্বারে হয়েছি হে উপনীত।

কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি।
গাহে যথা রবিশশী, সেই সভামাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।"

নরেনের গান শুনে সকলেই ধড়মড় ক'রে উঠেছে। তিনি কিন্তু একের পর এক গান গেয়ে যাচ্ছেন। তাঁর অন্তরের ভাবনদীতে বান ডেকেছে। গাইলেন—

"পৃথ্বীর ধুলিতে দেব মোদের জনম" ইত্যাদি।

ঐ গান শেষ ক'রে ধরলেন আর একখানা :

"অচল ঘন-গহনগুণ গাও তাঁহারি" ইত্যাদি।

মধুর সুরলহরী দেশকাল সব কিছুর বোধ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এক ফাঁকে জনৈক বন্ধু বললে, "আজ যে একজামিন। কোথায় একটু আধটু খুঁৎ খাঁৎ যা আছে, তা সেরে নেবে! তোমার দেখছি ভাই সবই বিপরীত। বেড়ে ফ র্তি করছ।"

নরেন্দ্রনাথ, "হাঁ ভাই, তাই তো করছি। মাথাটা সাফ্ রাখছি। ব্রেন-কে একটু জিরেন দিতে তো হ'বে?"

নরেন্দ্রনাথ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি পেরেছিলেন বিশ্ববিজয়ী হতে।

* * *

১৮৮৪ খৃঃ গোড়ার দিকে বি, এ পরীক্ষা হ'য়ে গেল*। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অমানুষিক খাটতে হয়েছিল তাঁকে। পরীক্ষার ফল বেরুতে দেরী আছে। বন্ধুগণ তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে নানা আমোদের আয়োজন করেছে। তাঁকে

* বি, এ পড়ার সময়ই ভবিষ্যৎ ভেবে তাঁর পিতা নরেন্দ্রনাথকে সুপ্রসিদ্ধ এটর্নি নিমাই চরণ বসুর অধীনে এটর্নির কাজ শিখতে লাগিয়েছিলেন এবং গোপনে পাত্রীর সন্ধান করতেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের এক কথা—"বিবাহ করব না।"

জোর ক'রে নিয়ে যেত। তাঁর বন্ধুপ্রীতি এত অধিক ছিল যে, তিনি 'না' বলতে পারতেন না। ভজনগান, হাস্যপরিহাস, বিবিধ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তিনি সকলকে বিমল আনন্দ দিতেন। তখন তাঁর বয়স বিশ বৎসর মাত্র।

একদিন বরাহনগরে এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছেন। রাত প্রায় ১১টা পর্যন্ত গানের মজলিস্ চলেছিল। আহারাদি ক'রে সবে শুয়েছেন। রাত প্রায় ২ টার সময় তাঁর বন্ধু 'হেমালী' এসে খবর দিল যে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হ'য়ে রাত দশটায় পিতা বিশ্বনাথ দত্ত দেহত্যাগ করেছেন। ঐ নিদারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্র নরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি গৃহে প্রত্যাবর্তন ক'রে পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াদি সম্পন্ন করলেন।...

দু'-এক মাসের মধ্যেই নরেন্দ্রের পারিবারিক জীবনে এক মহা সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত উপস্থিত হ'ল। পিতা এক কপর্দকও রেখে যাননি। কিছু ঋণ ছিল। প্রথমেই উঠল মা-ভাই-বোন সহ ছয় সাতটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদনের প্রশ্ন। পাওনাদারেরা সময় বুঝে দেখা দিল। নরেন্দ্রনাথ এই প্রথম দারিদ্র্যের মুখোমুখী দাঁড়ালেন। তিনি নগ্নপদে ছেঁড়া জামা গায়ে চাকরির সন্ধানে নানা স্থানে বৃথাই ঘুরতে লাগলেন। বন্ধুদের বিমুখতা তাঁকে বন্ধুত্বের প্রকৃত স্বরূপ জানিয়ে দিল। মায়ের মলিন মুখখানি তাঁর প্রাণকে আকুল করত। ছোট ভাই-বোনদের শীর্ণ শরীর দেখে তিনি অস্থির প্রাণে নীরবে চোখের জল ফেলতেন। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। কোথাও আশার ক্ষীণ আলোক টুকু দেখতে পাচ্ছেন না। সকালে উঠেই ভাঁড়ারে কত চাল আছে তার সন্ধান নেন। এবং অবস্থা বুঝে স্নান করেই 'নিমন্ত্রণ আছে' বলে বেরিয়ে যান বাড়ী থেকে। সারাদিন চাকরির সন্ধানে এ-আফিস সে-আফিস ক'রে বেড়ান। সর্বত্রই পান বিমুখতা।

সংসারের বাস্তব পরিচয় তিনি পেলেন। বুঝলেন—দুর্বলের জন্য, দরিদ্রের-জন্য সর্বহারা ও দুর্গতদের জন্য, এখানে কোন স্থান নেই। পৃথিবীটা শয়তানের সৃষ্টি। তিনি বলেছিলেন, "একদিন প্রখর রোদে যখন খালি পা পুড়ে যাচ্ছিল, তখন মনুমেন্টের তলায় ছায়ায় একটু বসলুম। হঠাৎ দু-একজন বন্ধু জুটে গেল। একজন গান ধরল—'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে'—ইত্যাদি। শুনে মনে হ'ল কে যেন মাথায় জোরে আঘাত করছে!...বল্লুম—'নে নে চুপ কর, ক্ষুধার তাড়নায় যাদের আত্মীয়-স্বজনের কষ্ট পেতে হয় না, টানা পাখার হাওয়া খেতে খেতে তাদের কাছে এ কল্পনা মধুর লাগতে পারে, আমারও একদিন তা-ই মনে হ'ত, কঠোর সত্যের সামনে এখন নিছক ব্যঙ্গ বলে বোধ হয়।... বন্ধু মর্মাহত হ'লেন।'...

ধনী বন্ধুরা অনেক সময় গান গাইতে ডাকত। তাদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে যেতাম। কিন্তু কেউ কখনো আমার দুর্দশার বিষয় জানবার ইচ্ছা করেনি। আমার দুরবস্থার সম্পর্কে আমিও কাউকে কিছু জানাইনি।"

নরেন্দ্র প্রতিদিন প্রত্যুষে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন। এবং ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে করতে বেরুতেন ঘর থেকে। একদিন তাঁর মা তা শুনতে পেয়ে ব্যঙ্গস্বরে বললেন, "চুপ কর্—ছোঁড়া। ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান্ ভগবান্ তো করছিস্—ভগবান্ তো সব করলেন।" দুর্ভাগ্যের কঠোর আঘাত ভুবনেশ্বরী দেবীর ঈশ্বরভক্তিকেও বিচলিত করেছিল। নরেন্দ্রের মনে কথাগুলি তীক্ষ্ণ তীরের মতো বিদ্ধ হ'ল। স্তব্ধ হ'য়ে তিনি ভাবতে লাগলেন—ভগবান কি বাস্তবিক আছেন? তিনি কি প্রার্থনা শোনেন? তিনি কি মঙ্গলময়? তাঁর রাজত্বে এত অমঙ্গল কেন? মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগরের কথাগুলি তাঁর মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন, "ভগবান্ যদি দয়াময় মঙ্গলময় তা হ'লে লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে মরে কেন?"

এবার নরেন্দ্রনাথের অন্তরও ভগবানের প্রতি বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল। ভগবানের অস্তিত্বে তিনি সন্দিহান হ'লেন। মনোভাব গোপন ক'রে মনে এক মুখে অন্যরূপ ব্যবহার তিনি করতে পারতেন না। তাই তিনি প্রকাশ্যেই ভগবানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রচার করতে লাগলেন। শীঘ্রই চারিদিকে কথা রটে গেল—নরেন্দ্র নাস্তিক হয়েছে। কথার সত্যতা নিরূপণের জন্য অনেকে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে এল। তিনি তাদের সঙ্গে হিউম্ বেন্ মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতবাদ উদ্ধৃত ক'রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করলেন। শুধু তা-ই নয়, দণ্ড পাবার ভয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা দুর্বলতা মাত্র—তাও বললেন জোর গলায়। প্রকাশ্যে গর্ব ক'রে বলতে লাগলেন, "যারা দুর্ভাগ্যের কবলে পতিত হয়েছে—যে-কোন উপায়ে ক্ষণিক আনন্দের সন্ধান করার অধিকার তাদের আছে।"

* * *

নরেন্দ্রনাথ অনেক দিন দক্ষিণেশ্বরে যাননি। তাঁর পিতৃ-বিয়োগ সাংসারিক দুরবস্থা ও দুর্দিনের খবর সবই শ্রীরামকৃষ্ণ পেয়েছেন এবং নরেন্দ্রের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্র নাস্তিক হয়েছে, তার নৈতিক পতন হয়েছে—এ সব সংবাদ যখন তাঁর কাছে পৌঁছল, তিনি কিছুতেই তা বিশ্বাস করলেন না। একদিন ভবনাথ নামক জনৈক যুবক ভক্ত কাঁদতে কাঁদতে যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন, "মশাই! নরেনের যে এমনটা হবে, তা স্বপ্নেরও অগোচর।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "চুপ কর্ শালারা। মা বলেছেন নরেন কখনো অমন হতে পারে না। আর কখনো আমার কাছে ওসব কথা বললে তোদের মুখ দেখতে পারব না।"...

নরেন্দ্র কত গভীর মর্মবেদনায় ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছিলেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বাল্যকাল হ'তে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, বিশেষ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো দেবমানবের সংস্পর্শে এসে তাঁর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছিল। নিজের জীবনেও কত অতীন্দ্রিয় দর্শনলাভে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। তিনি কি ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে সন্দিহান হ'তে পারেন? তা নয়, তাঁর মন ভরে উঠেছিল একটা দারুণ অভিমানে। তিনি ভাবতেন, "ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন এবং তাঁকে লাভ করার পথও আছে নিশ্চয়। নচেৎ বেঁচে থাকার মূল্য কি? দুঃখ কষ্ট জীবনে যতই আসুক না কেন, ঈশ্বর লাভের সেই পথটি খুঁজে বের করতে হবে।" *

কিন্তু সাংসারিক দুঃখকষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় তিনি ক'রে উঠতে পারলেন না। গ্রীষ্মকাল কেটে গেল এই বিভ্রান্তির মধ্যে। ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছেন জীবিকার সন্ধানে। বর্ষাকাল। বৃষ্টি মাথায় ক'রে সারাদিন ঘুরে ঘুরে অনাহারে ক্লান্ত দেহে রাত্রে বাড়ী ফিরছেন। দেহ এত অবসন্ন যে, আর এক পাও এগুতে পাচ্ছেন না। অগত্যা পথের পাশে এক বাড়ীর রকে মৃতবৎ পড়ে রইলেন। শত চিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করেছে। আচ্ছন্নের মতো কতক্ষণ পড়েছিলেন, সে জ্ঞান নেই। অকস্মাৎ তাঁর অন্তর এক দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সকল সংশয় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছে, সেখানে বিরাজ করছে এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও শান্তি। দেহে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই—শুধু আনন্দ। মনে অমিত বল ও অনন্ত প্রশান্তি।

* দুঃখের ভস্মস্তূপ হ'তেই যেন ভাবী আর্তবন্ধু বিবেকানন্দের জন্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "নরেন্দ্র যেদিন দুঃখদারিদ্র্যের সংস্পর্শে আসবে, সেদিন তার চরিত্রের এই দম্ভ অসীম করুণায় বিগলিত হবে। তার সকল আত্মবিশ্বাস অপরের হতাশ ভীরু আত্মার মধ্যে সাহস ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার যন্ত্র হয়ে উঠবে। তার কর্মের স্বাধীনতা বলিষ্ঠ আত্মজয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, অপরের পক্ষে অহং-এর প্রকৃত মুক্তপ্রকাশরূপে দেখা দেবে।" শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বর্ণে-বর্ণে সত্য হয়েছে। সাংসারিক দুঃখ-কষ্টের দহনই তাঁকে বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দে রূপান্তরিত করেছিল।

যখন তিনি বাড়ী ফিরে এলেন তখন প্রভাতের অরুণ আভায় চারিদিক রঞ্জিত। তিনিও যেন মোহনির্মুক্ত নবজীবন লাভ করেছেন।...

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনের দীর্ঘ অদর্শনে ব্যাকুল। তাঁর দিন যেন আর কাটে না। নরেন্দ্রও দারুণ অভিমানে সংকল্প করেছেন দক্ষিণেশ্বরে যাবেন না। পিতামহের মতো প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে গোপনে সংসার-ত্যাগের জন্য মন স্থির করলেন। গৃহত্যাগের দিনও স্থির করেছেন। কিন্তু ঠাকুরকে কিছুই জানাননি। এমন সময় সংবাদ পেলেন যে, ঠাকুর ঐ দিনই কলিকাতায় এক ভক্তের বাড়ীতে আসছেন। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসবেন মনে ক'রে গিয়েছেন ঐ ভক্তগৃহে। নরেন্দ্রকে দেখেই ঠাকুর অন্য কথা কিছু না ব'লে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য ধরে বসলেন। নরেন্দ্রের শত আপত্তি ভেসে গেল। তাঁকে যেতে হ'ল দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সঙ্গে। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছেই ঠাকুরের ভাবান্তর হ'ল। তিনি নরেনের কাছটিতে বসে গান ধরলেন :

"কথা বলতে ডরাই, না বলতেও ডরাই !

(আমার) মনে সন্দ হয়, পাছে তোমাধনে হারাই হারাই।"

নরেন্দ্রনাথও নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তাঁর বক্ষও অশ্রুপ্লাবিত হ'ল।...

ঠাকুর রাত্রে নরেন্দ্রকে একান্তে কাছে ডেকে বললেন, "জানি আমি, তুমি মা'য়ের কাজের জন্য এসেছ। সংসারে কখনই থাকতে পারবে না। কিন্তু আমি যত দিন আছি, ততদিন আমার জন্য থাক।" ঠাকুরের চোখে জল। নরেন্দ্রও মাথা নীচু ক'রে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর সংসার-ত্যাগ আপাততঃ বন্ধ রইল।...

পরদিন নরেন্দ্র বাড়ীতে ফিরলেন। আবার শত চিন্তায় আচ্ছন্ন হ'ল তাঁর মন। অনেক ঘোরাঘুরির পরে এটর্নি অফিসে অস্থায়ী চাকরী পেলেন। কিছু বই অনুবাদ করেও সামান্য অর্থোপার্জন হ'ত। কিন্তু মা ভাই-বোনদের ভরণপোষণের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা আর হয় না! মানসিক অশান্তিতে এক এক সময় তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে উঠেন। এমন সময় তাঁর মনে হ'ল—ঠাকুরের প্রার্থনা তো ভগবান শোনেন। তিনি যদি আমার এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন, তা হ'লে কোন একটা উপায় হ'তে পারে। আর তিনি তো আমার কোন আবদারই ফেলেন না।

এই চিন্তা নিয়ে নরেন্দ্র একদিন গিয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরকে ধ'রে বসলেন, "আপনাকে একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতেই হ'বে। আপনার মা'কে একটিবার বলুন, তাহ'লে সব কষ্টের নিরসন হবে।" ঠাকুর মৃদুকণ্ঠে বললেন, "ওরে, আমি যে মা'র কাছে ওসব চাইতে পারিনে। তুই-ই জানাস না কেন? মাকে মানিসনে ব'লেই তো তোর এত কষ্ট।"

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু মৌন থেকে বললেন, "আজ মঙ্গলবার। আমি বলছি, আজ রাত্রে মায়ের কাছে গিয়ে তুই যা চাইবি, মা তা-ই তোকে দেবেন।"

ঐ কথা শুনে নরেন্দ্র আশ্বস্ত হ'লেন। তাঁর কথা তো মিথ্যা হবার নয়! নরেন্দ্র মনে মনে সংকল্প করলেন যে, মায়ের মন্দিরে গিয়ে মা'র কাছে সাংসারিক দুঃখকষ্টের অবসান যাতে হয়, সেজন্য প্রার্থনা জানাবেন। রাত এক প্রহরের পরে ঠাকুর তাঁকে পাঠালেন কালী মন্দিরে।

মন্দিরে গিয়ে মা'র দিকে তাকাতেই নরেনের প্রাণ এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেল। মনে হ'ল—মা যে চিন্ময়ী, অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্য-স্বরূপিনী। তিনি বিহ্বল হয়ে গেলেন। মায়ের জীবন্ত প্রকাশে তাঁর অন্তর ভরে গেল। ভক্তিনম্রচিত্তে মা'কে প্রণাম করলেন। ঘর-সংসারের

চিন্তা তাঁর মনে আর নেই। মায়ের কৃপাকটাক্ষে বিবল আনন্দে ভরে গেছে— তাঁর সমগ্র মনপ্রাণ। তিনি নতমস্তকে প্রার্থনা করলেন, "মা, আমায় বিবেক-বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, তোমার নিরঙ্কুশ দর্শন দাও।"

এক অপার্থিব আনন্দ ও শান্তিতে তাঁর প্রাণ উদ্বেল। মায়ের দিব্যানুভূতিতে তিনি আত্মবিস্মৃত। আবিষ্টের মতো কিছুক্ষণ মন্দিরে থেকে তিনি ফিরে এলেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরের প্রশ্নে নরেনের চমক ভাঙল। তিনি নতমুখে বললেন, "না তো। মা'কে দেখেই সব ভুলে গেছি। মা'কে দুঃখ দুর করার কথা কিছুই বলিনি।"

ঠাকুর তখন বললেন; "যা যা, ফের যা। মা'র কাছে দুঃখ-মোচনের প্রার্থনা জানা।"

আবার গেলেন মন্দিরে। কিন্তু আবার সেই ভাবান্তর হ'ল। অনিমেষ নয়নে মাকে দেখতে দেখতে জ্ঞানভক্তির প্রার্থনা জানালেন মাত্র। পুনরায় ফিরে এসেছেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তৃতীয়বার মন্দিরে গেলেন। এবার তিনি কিন্তু ভোলেননি। দুঃখকষ্ট অবসানের প্রার্থনা জানাবেন ঠিক আছে। কিন্তু মায়ের সামনে প্রণাম করতেই তাঁর মনে হ'ল— এসব তুচ্ছ জিনিস চাইব মা'র কাছে? লজ্জায় তাঁর মুখ দিয়ে ওসব প্রার্থনা কিছুই বের হ'ল না। মা'কে বার বার প্রণাম ক'রে গুরুগম্ভীরস্বরে শান্ত মনে প্রার্থনা জানালেন,—"মাগো, অন্য কিছু চাইনে, শুধু তোমাকে চাই। আমায় জ্ঞান ভক্তি দাও।"

ফিরে আসতেই ঠাকুর প্রশ্ন করলেন, "কিরে, এবার সংসারের দুঃখকষ্টের কথা মা'কে জানিয়েছিস তো?"

'জানাইনি' বলাতে তিনি তিরস্কৃত হলেন। কিন্তু নরেন্দ্র অন্তরে বুঝলেন— এসব ঠাকুরেরই খেলা। তিনিই যাদুকরের মতো তাঁর মনকে ঘুরিয়ে
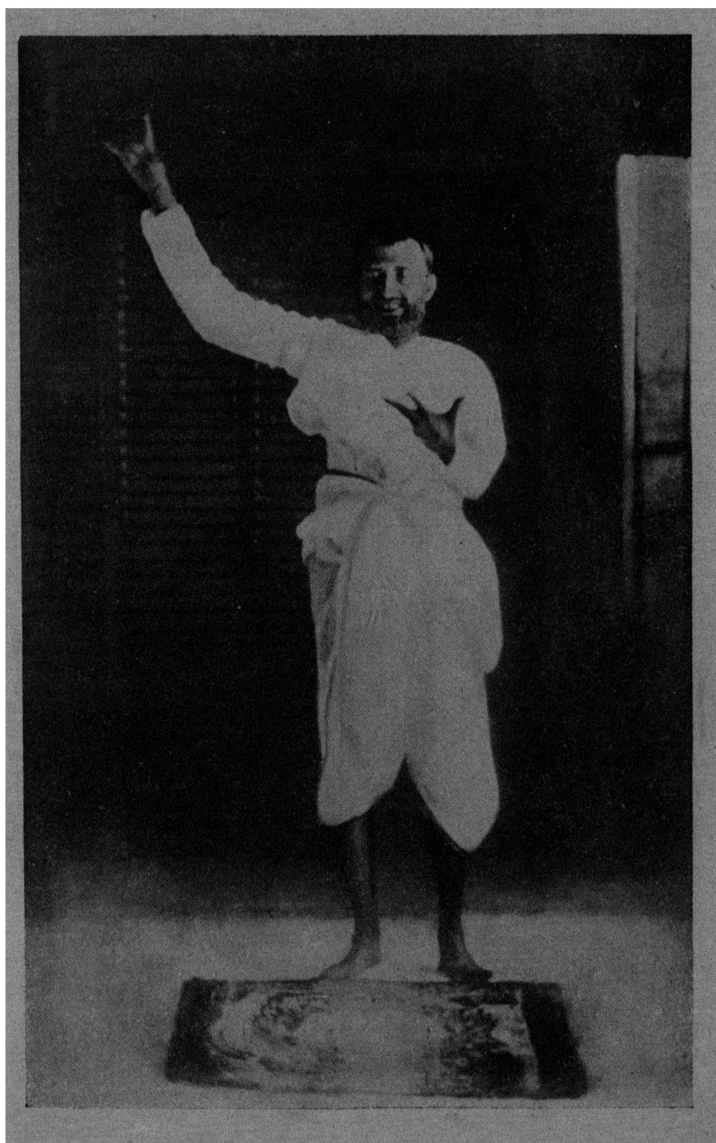
দিয়েছেন। কিন্তু মা-বোনদের কথা তাঁর চিন্তার বিষয় হ'ল। তিনি বললেন ঠাকুরকে, "এ সব আপনারই কাজ। আপনিই আমার মনকে গুলিয়ে দিয়েছেন। এখন আপনাকেই মা-ভাইদের একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে হ'বে। নইলে ছাড়ব না।"

অনেক পীড়াপীড়ির পর ঠাকুর বললেন, "আচ্ছা যা। মা'কে বলব যাতে তাদের মোটা ভাতকাপড়ের কখনো অভাব না হয়।"...

নরেন্দ্র মাকে মেনেছে—এতে ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। তাঁর মন থেকে দুশ্চিন্তার এক ঘন মেঘ যেন অপসারিত হ'ল। ঐ দিন থেকে আরম্ভ হ'ল নরেন্দ্রনাথের নূতন জীবন। তিনি আদ্যাশক্তি জগজ্জননীকে মেনেছেন, বিশ্বাস করেছেন—প্রতীক থেকে তিনি এসেছেন প্রত্যক্ষে। প্রতীক উপাসনার মর্মবাণীটি তাঁর অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে। ভগবানের মাতৃভাবকে এই তিনি প্রথম গ্রহণ করলেন। প্রতিমা যে ঈশ্বরেরই প্রতীক তা-ও তিনি মানলেন। হিন্দুরা প্রতিমাকে অবলম্বন ক'রে শ্রীভগবানেরই উপাসনা ক'রে। সাংসারিক দুঃখ-দারিদ্র্য মানুষকে কত বড় শিক্ষা দেয়, নাস্তিককেও আস্তিক করে!

নরেন্দ্রের দুশ্চিন্তার অবসান হ'ল। মা কালীর মহিমা তিনি বুঝতে পেরেছেন। মা শুধু প্রস্তরময়ী মূর্তিমাত্র নন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী; তিনি চতুর্বর্গ-দায়িনী, ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী, বরাভয়-দায়িনী। মায়ের গুণগান করার জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হ'ল। তিনি তখনো মায়ের গান একটিও জানেন না। তাই ঠাকুরকে ধরে বসলেন, "আমায় মায়ের গান শিখিয়ে দিন।"

ঠাকুর আনন্দ-কণ্ঠে গাইতে লাগলেন :

"(আমার) মা ত্বং হি তারা।

তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা॥

জানি মা ও দীনদয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা।
তুমি জলে তুমি স্থলে, তুমি আদ্যামূলে গো মা।
আছ সর্বঘটে অক্ষপুটে সাকার আকার নিরাকারা॥
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা।
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদা শিবের মনোহরা॥"

ঠাকুরের কাছে ঐ গানটি শিখে নরেন্দ্রনাথ মত্ত হ'য়ে ঐ গান গেয়ে সারারাত কাটিয়ে দিলেন। তাঁর অন্তরের সিন্ধু প্রেমচন্দ্রোদয়ে উদ্বেল হয়েছে।

শ্রীঠাকুরের ঐ প্রার্থনার পরে নরেন্দ্রের সংসারের অভাব আংশিক দূর হ'ল। তিনি স্কুলের মাষ্টারী বা অন্য কোন কাজ পেতে লাগলেন। তাঁর প্রাণের দুর্দমনীয় দ্বন্দ্বের ভাব কেটে গিয়েছে। ঝঞ্ঝা-নির্মুক্ত বারিধির মতো প্রশান্ত ও গম্ভীর হয়েছে তাঁর অন্তর। জ্ঞান থেকে তিনি পৌঁছেছেন ভগবৎ-প্রেমে—উর্দ্ধতম অতিচেতন দিব্যপ্রকাশে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমাও তাঁর অন্তর অধিকার করেছে। তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাবার কোন সুযোগই ছাড়েন না। ঠাকুরের সব দর্শনাদি সত্য ব'লে মেনে নিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবও ধীরে ধীরে নরেন্দ্রকে উর্দ্ধে চালিত করতে লাগলেন 'অসীমের নীড়ে' ভূমানন্দের নিকেতনে।

ঠাকুরের জীবনকেও তিনি নূতন চোখে দেখতে লাগলেন। তিনি যেন দিব্যচক্ষু পেয়েছেন। ঠাকুর নরেনের চোখে দিব্যদৃষ্টির অঞ্জন লেপন ক'রে দিয়েছেন। ঠাকুরের প্রত্যেক কথা ও আচরণে তিনি পেতে লাগলেন নূতন আলোক। এবং নিজের চিন্তায়ও দেখতে লাগলেন অভিনব পরিবর্তন। এই নরেন্দ্রনাথই ঠাকুরের মুখের উপর বলেছিলেন, "আপনার দর্শনাদি সব মাথার খেয়াল—চোখের ভ্রম।" প্রত্যেক মানুষই তার সীমিত দৃষ্টি নিয়ে

অসীম অনন্তকে দেখতে চায়। ক্ষুদ্র মন বুদ্ধি দিয়ে বিরাটকে মাপতে চায়।...

১৮৮৪ সালের ঘটনা। ঠাকুরের ঘরে বহুভক্তের সমাগম হয়েছে। নরেন্দ্রও উপস্থিত। নানা ঈশ্বরীয় কথার মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের আলোচনা-প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন, "নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন—এই তিনটি হ'ল বৈষ্ণব ধর্মের সার উপদেশ। যে-ই নাম সে-ই ঈশ্বর—নাম-নামী অভেদজ্ঞানে অনুরাগের সঙ্গে সর্বদা ভগবানের নাম করবে। ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ-বোধে সর্বদা সাধুভক্তগণকে পূজা ও বন্দনা করবে। আর কৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার একথা হৃদয়ে ধারণ ক'রে সর্বজীবে দয়া"—এ পর্যন্ত ব'লেই তিনি অকস্মাৎ সমাধিমগ্ন হ'লেন।

কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হ'য়ে তিনি আপন মনেই বলছেন, "জীবে দয়া, জীবে দয়া? দূর শালা! কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না না,—জীবে দয়া নয়। শিবজ্ঞানে জীবসেবা!"

সকলেই মুগ্ধ হ'য়ে শুনলেন সেই দেববাণী। কিন্তু কথা ক'টির মধ্যে যে পরম সত্য নিহিত আছে, তা হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল একমাত্র নরেন্দ্রনাথের। তিনি পরে বলেছিলেন, "...কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখতে পেলাম।...ঠাকুর ভাবাবেশে আজ যা বললেন, তাতে বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়। সংসারের সকল কাজে ঐ পরমসত্যকে প্রয়োগ করা যায়।... জীবনের প্রতিমুহূর্তে মানুষ যাদের সম্পর্কে আসছে, যাদের ভালবাসছে, শ্রদ্ধা ও সম্মান করছে—তারা সকলেই যে ঈশ্বরের অংশ—স্বয়ং তিনি। ...জগতের সকলকে এই ভাবে 'শিব'জ্ঞান ক'রে সেবা করতে পারলে চিত্ত শুদ্ধ হ'য়ে নিজেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব এ তত্ত্ব ধারণা করতে পারবে।...ভগবান যদি কখনো দিন দেন তো, আজ যা শুনলাম, এই

সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করব—পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলকে শুনিয়ে মোহিত করব।" *

সাত

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রার্থনায় মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান ধীরে ধীরে হ'ল বটে, কিন্তু পারিবারিক সমস্যা আরো জটিলতর হয়ে উঠল। সময় বুঝে জ্ঞাতিগণের শত্রুতাচরণ চরমে উঠেছে। তারা বসতবাটীটি জোর ক'রে দখল করল। মা-ভাই-বোনদের নিয়ে নরেন্দ্রকে আশ্রয় নিতে হ'ল মাতামহীর বাটীতে। হাইকোর্টে মোকদ্দমা দায়ের হ'ল। চারিদিকে মহা বিশৃঙ্খল অবস্থা। ঠাকুরও কণ্ঠরোগে আক্রান্ত। নরেন্দ্র মহাধৈর্য সহকারে আত্মিক বলে বলীয়ান বীরের মতো সব অবস্থার সম্মুখীন্ হলেন। সংসারের দানবীয় রূপ তাঁর মনে ভূমার সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্রতর ক'রে দিল। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন আসেন। শ্রীঠাকুরের লোকোত্তর জীবন তাঁকে আরো নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করছে।

* 'শিবজ্ঞানে জীব-সেবা'—এই মহামন্ত্রের মধ্যে সাম্য মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বীজ নিহিত রয়েছে। সর্বাপেক্ষা নিকট স্পৃশ্য অস্পৃশ্য প্রতিবেশী এবং সমাজ, জাতি উপজাতি মহামানবজাতির মধ্যে, আবার একই ধর্মের বিভিন্ন শাখা বা মতবাদের এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য মানুষ মাত্রকেই শিব জ্ঞানে সেবা—একমাত্র সহজ উপায়। মানুষই ভগবানের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক এবং মানুষের সেবাই ভগবানের উচ্চতম পূজা। 'নরনারায়ণ'-সেবা, বিশেষকরে ভারতের বিভিন্ন জাতি এবং আপাতঃ বিবদমান বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য-সাধনে বিশেষ সাহায্য করতে পারে। করুণাময় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'সর্বধর্ম-সমন্বয়-বেদের' প্রথম সূত্রটিই যেন—"নরনারায়ণ সেবা।"

১৮৮৫, সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে প্রথম শ্যামপুকুরে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে আনা হ'ল। নরেন্দ্র ছিলেন যেন জলন্ত আগুন। তিনি যুবক ভক্তদের সব একত্র করলেন এবং লেগে গেলেন গুরুসেবায়।...

ঠাকুরের অসুখ ক্রমেই অসাধ্য ব্যাধিতে পরিণত হ'ল। ডাক্তারী কবিরাজী কোন ঔষধেই কিছু ফল হচ্ছে না! চিকিৎসকেরা আরোগ্যের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। শ্যামপুকুর জনবহুল কলিকাতারই একাংশ। কোন নির্জন উন্মুক্ত স্থানে পরিবর্তনের বিধান দিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। অনেক সন্ধানের পর কাশীপুরে একটি মনোরম উদ্যানবাটী পাওয়া গেল। ৮০৲ টাকা মাসিক ভাড়া। (১১ই ডিসেম্বর ১৮৮৫) শুভদিনে ঠাকুরকে আনা হ'ল কাশীপুরে। ফলপুষ্প-বৃক্ষলতা-শোভিত উন্মুক্ত স্থানে এসে ঠাকুর বিশেষ আনন্দিত হ'লেন।

কাশীপুর উদ্যান শ্রীরামকৃষ্ণের 'অন্ত্যলীলার-স্থান'। ঠাকুর তাঁর দেহের অসুখকে অবলম্বন ক'রে বহু নরনারীর আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পাদন করেন। তিনি যুবক ভক্তদের ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সংগঠন কাশীপুরেই করেছিলেন। তিনি একদিন কুমার-বৈরাগীদের স্বহস্তে গৈরিকবস্ত্র ও জপমালা দান ক'রে তাঁদের অন্তরে আধ্যাত্মিক শক্তি-সংক্রমণ করেন। এই ঘটনাটি তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবন-সম্বন্ধে বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ।*...

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁর নরলীলার কাজ

* শ্রীঠাকুর ঐ দিন নরেন্দ্র রাখাল যোগীন বাবুরাম নিরঞ্জন তারক শরৎ শশী বুড়োগোপাল কালী ও লাটু—এই এগার জনকে গেরুয়া বস্ত্র ও জপমালা দিয়েছিলেন। একখানি গেরুয়া বস্ত্র পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষকে দেওয়া হয়েছিল। দেহত্যাগের পূর্বে এই একাদশজন ত্যাগী শিষ্যকে ঠাকুর একদিন দ্বারে দ্বারে মাধুকরী ভিক্ষা ক'রতে পাঠান। ঐ ভিক্ষান্নের এক কণিকা তিনিও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলতেন, "ভিক্ষান্ন খুব পবিত্র।"

শেষ হয়ে এসেছে। ত্যাগী শিষ্যদের জীবনগঠনের দিকে তাঁর একমাত্র দৃষ্টি। শারীরিক অসুস্থতার কথা ভুলে গিয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সকলকে নানা ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন এবং সাধনভজনে নিয়োজিত করছেন। দিবারাত্র ঠাকুরের সেবাই যুবক ভক্তদের একমাত্র কাজ ছিল না। নরেন্দ্রনাথ রাত্রে ধুনি জ্বালিয়ে সকলকে নিয়ে ধ্যান করেন। শাস্ত্রপাঠে শাস্ত্রালোচনায় অনেক সময় ব্যয়িত হয়। ক্রমে তাঁরা বাড়ি যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন। ভগবান তথাগতের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে নরেন্দ্র সাধনে ব্রতী হয়েছেন। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন'— এই পণ। কোন কোন রাত্রে গুরুভাইদের কয়েকজনকে নিয়ে চলে যান দক্ষিণেশ্বরে। সারারাত ধ্যানে অতিবাহিত ক'রে সকালে ফিরে আসেন কাশীপুরে।

বুদ্ধদেবের অলৌকিক ত্যাগ, কঠোর তপশ্চর্যা, অসীম করুণা নরেন্দ্রনাথের ধ্যানের বস্তু হ'ল। বুদ্ধদেব 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং'·· এই দৃঢ়তা অবলম্বন ক'রে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। তারক ও কালী এই দুই গুরুভাইকে সঙ্গে ক'রে সকলের অলক্ষ্যে নরেন্দ্র চলে গেলেন বুদ্ধগয়ায়। ওখানেই বুদ্ধত্বলাভ করেছিলেন বুদ্ধদেব। বোধিদ্রুমতলে তিনদিন তিনরাত্রি ধ্যানে অতিবাহিত করলেন।* বুদ্ধদেবের বিশালহৃদয় ও মহাপ্রাণতা নিয়ে নরেন্দ্র ফিরে এলেন কাশীপুরে। বিশ্বমৈত্রী তাঁর হৃদয় অধিকার করল।

* * *

নরেন্দ্রের প্রাণের ব্যাকুলতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তিনি বুঝেছেন যে ঠাকুর নরদেহে আর বেশী দিন থাকবেন না। কিন্তু পরমসত্যলাভ এখনো তো হ'ল না! তিনি আহার-নিদ্রা ভুলে ঐ চিন্তায় ডুবে গেলেন। এক রাত্রিতে

* বুদ্ধদেব সম্বন্ধে স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশ থেকে অখণ্ডানন্দকে লিখেছিলেন, "বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁর ঈশ্বরবাদ নেই—তিনি নিজে ঈশ্বর—আমি খুব বিশ্বাস করি।"...

তিনি নির্বিকল্প সমাধিলাভের জন্য ঠাকুরকে ধরে বসলেন। বললেন, "আমি শুকদেবের মতো নির্বিকল্প সমাধিযোগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবে থাকতে চাই।"

নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা দর্শনে ঠাকুর বললেন, "মা'র ইচ্ছা হয় তো হ'বে।"*

ঠাকুরের ঐ কথায় নরেন্দ্রের প্রাণ শান্ত হ'ল না। তিনি আরো অস্থির হ'লেন। একদিন সন্ধ্যায় নরেন্দ্র ধ্যানে বসেছেন। ক্রমে গভীর ধ্যানে মগ্ন হ'লেন। এক অনির্বচনীয় আনন্দে তাঁর প্রাণ মন ভ'রে গেল। সচ্চিদানন্দ-জ্যোতিঃ-সাগরে তিনি ডুবে গেলেন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হ'ল। এক হ'য়ে

* নরেন্দ্রনাথের তৎকালীন মানসিক অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র কথামৃতে (তৃতীয়ভাগ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ – ৪ঠা জানুয়ারি ১৮৮৬ খৃঃ, কাশীপুর উদ্যানবাটী) পাওয়া যায়। নিভৃতে মণির সঙ্গে কথা বলছেন। নরেন্দ্রনাথ (মণির প্রতি)—"গত শনিবার, এখানে ধ্যান করছিলাম। হঠাৎ বুকের ভিতর কি রকম ক'রে এলো।" মণি, "কুণ্ডলিনী জাগরণ।" নরেন্দ্র, "তাই হবে, বেশ বোধ হলো—ইড়া, পিঙ্গলা। হাজরাকে বল্লাম, বুকে হাত দিয়ে দেখতো দেখতে কাল রবিবার, উপরে গিয়ে এঁর সঙ্গে দেখা কল্লাম,—ওঁকে সব বল্লাম। আমি বল্লাম, সব্বাইয়ের হ'লো, আমায় কিছু দিন। সব্বাই-এর হ'ল আমার হ'বে না?" মনি, "তিনি তোমায় কি বল্লেন?" নরেন্দ্র, "তিনি বল্লেন, 'তুই বাড়ীর একটা ঠিক্ করে আয় না, সব হবে, তুই কি চাস্?"

"আমি বল্লাম, আমার ইচ্ছা অমনি তিন-চার দিন সমাধিস্থ হয়ে থাকবো। কখন কখন এক-একবার খেতে উঠবো।" তিনি বল্লেন,—"তুইতো বড় হীনবুদ্ধি। ও অবস্থার চেয়েও উঁচু অবস্থা আছে। তুই তো গান গাস্, 'যো কুছ হ্যায়—সো তুহী হ্যায়'। তিনি পরে বল্লেন, "তুই বাড়ীর একটা ঠিক ক'রে আয়, সমাধি লাভের অবস্থার চেয়েও উঁচু অবস্থা হতে পারবে।"

"আজ সকালে বাড়ি গেলাম। সকলে বক্‌তে লাগলো;—আর বল্লে, "কি হো হো ক'রে বেড়াচ্ছিস্? একজামিন্ (B. L.) এত নিকটে, পড়াশুনা নেই, হো হো ক'রে বেড়াচ্ছ।"

"...দিদিমার বাড়ীতে, সেই পড়বার ঘরে, পড়তে গেলাম। পড়তে গিয়ে পড়াতে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এলো—পড়াটা যেন কি ভয়ের জিনিষ! বুক আটু-পাটু ক'রতে লাগল! অমন কান্না কখনো কাঁদি নি।... তারপর বই টই ফেলে দৌড়! রাস্তা দিয়ে ছুট! জুতো টুতো রাস্তায় কোথায় একদিকে পড়ে রইলো। খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম,—গায়েময়ে খড়—আমি দৌড়ুচ্ছি,—কাশী-পুরের রাস্তায়।...সংসার আর ভাল লাগে না। সংসারে যারা আছে তাদেরও ভাল লাগে না। তুই একজন ভক্ত ছাড়া।"

নরেন্দ্র সেই রাত্রেই ভজন-সাধন করার জন্য দক্ষিণেশ্বর চলে গেলেন—সঙ্গে দু একটি ভক্ত। গভীর অন্ধকার অমাবস্যা পড়েছে।

গেলেন তিনি ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে। অনেকক্ষণ কেটে গেল। দেহে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই।...

জীবকল্যাণরূপ সূক্ষ্মবাসনা অবলম্বন ক'রে নরেনের নির্বিকল্প নির্বিষয় মন ক্রমে আসতে লাগল জীবভূমিতে। তাঁর নিজের কোন বাসনা ছিল না। কিন্তু ঐশী ইচ্ছায় তাঁর মনে 'বহুজন হিতায়' কর্মের বাসনা জাগ্রত হ'ল। ক্রমে দেহে নেমে এল তাঁর মন। প্রকৃতিস্থ হ'য়ে ধীর পদে তিনি গেলেন উপরে ঠাকুরের কাছে। প্রণাম ক'রে নতমুখে দাঁড়িয়েছেন। ঠাকুর আনন্দে যেন ফেটে পড়লেন। বললেন, "এবার তো মা তোকে সব দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু এখন সে সব চাবি দেওয়া রইল। তোকে মা'র অনেক কাজ করতে হবে, কাজ শেষ হ'লে আবার এ অবস্থা ফিরে পাবি।"*

ঐ অবস্থা লাভ ক'রেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলেছিলেন :

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়॥"

(শোন বিশ্বজন অমৃতের পুত্র যত, দিব্যধামবাসী দেবগণ, তোমরাও শোন। যিনি আঁধারের পারে জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষ, তাঁকে আমি জেনেছি। তাঁকে জেনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। অমৃতত্ব লাভের অন্য পথ নেই।)

নরেন্দ্রনাথ সেই পরম পুরুষকে জেনেছেন। অভী হয়েছে তাঁর অন্তর। আপ্তকাম তিনি। আত্মানন্দে বিভোর। যতদিন নরদেহে ছিলেন, সেই আত্মানন্দেই তাঁর স্থিতি হয়েছিল। জীবন-যাত্রা-পথে কত ঘাত-প্রতিঘাত কত দুঃখ-দৈন্য-ক্লেশ তিনি সহ্য করেছেন নির্বিকার চিত্তে। তাঁর অন্তরের প্রশান্তি

* কাশীপুরে একদিন ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে ঠাকুর দেবেন্দ্র মজুমদার ও গিরিশ ঘোষকে নরেনের বিষয় বলেছিলেন, "ওর ঘর ব'লে দিলে ও দেহ রাখবে না"। তাই ঠাকুর নরেনের স্বরূপের অনুভূতি "চাবিবন্ধ" ক'রে তাঁকে সম্মোহিত ক'রে রেখেছিলেন। জগতের কল্যাণ-বাসনা জাগ্রত ক'রে তাঁকে জগদ্ধিতায় কর্মে করে ছিলেন নিয়োজিত।

এতটুকু ব্যাহত হয় নি। আর ব্রহ্মবিদের আভা তাঁর বদনমণ্ডলে চিরতরে অঙ্কিত হ'য়ে গিয়েছিল। পরে যখন কৌপীনধারী পরিব্রাজক সন্ন্যাসিরূপে কখনো বৃক্ষতলে দেবালয়ে, দরিদ্রের গৃহে রাজপ্রাসাদে, ব্রাহ্মণের অতিথিরূপে বা অস্পৃশ্যের কুটীরে তিনি ঘুরেছেন—সর্বত্রই তাঁকে লোকে মহামানব রূপে গ্রহণ করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণে অসীমের ডাক শুনছেন। সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হচ্ছে। সর্বক্ষণ আত্মস্থ হয়ে থাকেন। দেহকষ্ট তাঁর অজর অমর আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। মন একটুতেই নির্বিকল্প ভূমিতে চলে যায়।

তিনি একদিন বলেছিলেন, "লোক-কল্যাণের ইচ্ছাও মন থেকে মুছে যাচ্ছে।...কাকেই বা উপদেশ দেবো।...সব রামময় দেখছি।" 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এখন তাঁর সহজ অবস্থা। তার-ই মধ্যে মন যখন একটু নেমে আসে, ত্যাগী পার্ষদদের আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতা-বিধানের চেষ্টার অন্ত নেই। তিনি নানাভাবে তাদের স্বরূপের উপলব্ধি করাচ্ছেন। সন্ন্যাসী শিষ্যদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে তার কুলপতি করবেন তিনি নরেন্দ্রকে, যাতে তারা সমগ্রবিশ্বে তাঁর সাম্য মৈত্রী প্রেম বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ত্যাগ তপস্যা ঈশ্বরপরায়ণতা ও সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী প্রত্যেক নরনারীর কাছে নিয়ে যায়।*

ঠাকুরের আসন্ন লীলাসংবরণের চিন্তা শিষ্যদের প্রাণকে আকুল করেছে। তিনি তাঁর অন্তর্ধানের ইঙ্গিত দিয়ে একদিন বললেন, "বাউলের দল এল,

* দেহাবসানের কয়েকদিন পূর্বে ঠাকুর নরেনকে কাছে ডেকে সস্নেহে বললেন, "দেখ্, তোর হাতে ছেলেদের সব দিয়ে গেলুম।...তুই সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিমান। এদের ভালবেসে একত্র রাখবি। সাধন ভজনে যাতে মন দেয় তার ব্যবস্থা করবি।..." নরেন্দ্রনাথ নির্বাক। ঠাকুরের ইঙ্গিত তিনি বুঝলেন। বেদনার অশ্রুতে তাঁর চোখ ভ'রে গেল।

নাচলে গাইলে। যেমনি এসেছিল, তেমনি আবার চলে গেল। কেউ তাদের চিনতে পারলে না।”...

ঠাকুর নরেনকে এখন আর কাছছাড়া ক'রতে চান না। কাছে বসিয়ে কত নিভৃত আলোচনা চলে। ভবিষ্যতের কর্ম-পদ্ধতির নির্দেশ দেন। তিনি নরেনের উপর তাঁর অসমাপ্ত কর্মভার অর্পণ ক'রে যাচ্ছেন। একদিন ঠাকুর একটুকরা কাগজে লিখে দিলেন, “নরেন লোক-শিক্ষা দেবে।”... নরেনকে যেন ‘চাপরাশ’ দিলেন।

নরেন একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, “আমি ওসব পারব না।” ঠাকুর জবাব দিলেন, “তোর ঘাড় করবে।”

শ্রীরামকৃষ্ণই নরেনের ঘাড় ধ'রে সব কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন। তাইতো তিনি বিবেকানন্দরূপে বলেছিলেন, “I want to be a voice without a form”—তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণের ‘অমূর্ত বাণী’—তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ। নরেনকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথকে বিশ্বাস অবিশ্বাস, দুঃখ বেদনা ও নানা সংঘাতের ভিতর দিয়ে এনে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের হাতে গড়ে-পিটে বিবেকানন্দ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণাতেই বিবেকানন্দের বিশ্বপরিক্রমা। তাও কতকটা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। ঠাকুরের অমোঘ ইচ্ছাশক্তির যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন তিনি। নরেন্দ্রের প্রাণে যে বিশ্বের কল্যাণ-সাধন-স্পৃহা জাগ্রত হয়েছিল, তাও ঠাকুরের ইচ্ছাতে।...বিবেকানন্দের জন্য জগৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঋণী।

* * *

দেহত্যাগের তিন চার দিন পূর্বে এক সন্ধ্যায় শ্রীঠাকুর নরেনকে কাছে ডাকলেন। ঘরে আর কেউ ছিল না। দরজা বন্ধ করা হ'ল। নরেনকে সামনে বসিয়ে তাঁর চোখের উপর দৃষ্টি-নিবদ্ধ ক'রে ঠাকুর ক্রমে সমাধিস্থ হ'লেন। ঐ সময় নরেন্দ্র অনুভব করলেন—ঠাকুরের দেহ থেকে বিদ্যুতের মতো একটা

তেজ তাঁর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছে। ক্রমে তিনিও সমাধিমগ্ন হলেন। দীর্ঘ সময় ঐ অবস্থায় ছিলেন। বাহ্যজ্ঞান লাভের পর নরেন্দ্র দেখলেন যে ঠাকুর আনন্দাশ্রু বিসর্জন করছেন। ঠাকুর পরে বললেন সস্নেহে, "আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হ'লে ফিরে যাবি।" নরেন্দ্রনাথও কাঁদতে লাগলেন। তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বের হলনা।

সে দিন ঠাকুর 'জগদ্ধিতায়' কাজের জন্য নরেন্দ্রের ভিতর শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। ঠাকুরের বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির উত্তরাধিকারী হ'লেন তিনি। এক প্রদীপের শিখা থেকে জ্বলে উঠল আর একটি প্রদীপ।...পরে জ্বলেছিল আরো শত শত প্রাণে ঐ দীপশিখা।

নরেন্দ্রের ভিতর শক্তিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হ'লেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দুজন এক হয়ে গেলেন।* মহাহ্রদে মহানদ-সম্মিলন।...

নিদারুণ রোগযন্ত্রণায় কাতর শ্রীরামকৃষ্ণ। এত কষ্ট যে দেখলে অশ্রু-সংবরণ করা যায় না। ঐ অবস্থায় নরেন্দ্রের মনে হল, "এখন যদি তিনি বলতে পারেন— 'আমি অবতার' তবেই বিশ্বাস করি।"

আশ্চর্য! নরেনের অন্তরে ঐ চিন্তা উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন সহজ-সরল কণ্ঠে, "এখনো তোর অবিশ্বাস!...সত্যি বলছি—যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং একাধারে রামকৃষ্ণ। তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।"

বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত হ'লেন নরেন্দ্রনাথ। সন্দেহের জন্য বিশেষ

* নরেন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের এতটুকু পৃথকবুদ্ধি ছিল না। যেন একটি আত্মা। শ্রীঠাকুর একদিন বলেছিলেন, "তোর তো ভারি হীনবুদ্ধি! তুই আর আমি কি আলাদা! এটাও আমি ওটাও আমি।"

অনুতপ্ত হ'য়ে মর্মন্তুদ বেদনায় কাঁদতে লাগলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ কে এবং কেন এসেছিলেন—তার মর্মবাণী তাঁর প্রাণে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হ'য়ে গেল।*

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ নূতন রূপ নিয়েছেন নরেন্দ্রের অন্তরে—অবতার-বরিষ্ঠরূপে। শুধু তা-ই নয়—সর্বভাবরূপে সর্বধর্মরূপে সর্বদেবদেবীরূপে। পরবর্তিকালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে প্রণাম-মন্ত্র রচনা করেছেন তাতেই সূত্রাকারে শ্রীঠাকুরের আসল রূপটির উদ্‌ঘাটন করেছেন।

"স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥"

(যিনি ধর্মের সংস্থাপক, সর্বধর্মস্বরূপ, অবতারবরিষ্ঠ সেই রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি।) আজ এই প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে লক্ষ লক্ষ মস্তক অবলুণ্ঠিত হ'চ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে।

বিবেকানন্দ সেই বেদমূর্তি রামকৃষ্ণের বাণীই বিশ্ববাসীর নিকট প্রচার করেছেন। রামকৃষ্ণ কোন দেশবিশেষ, বা জাতিবিশেষ বা ধর্মবিশেষের জন্য আসেননি। তিনি এসেছিলেন সনাতন বৈদিক ধর্মের জীবন্তরূপ নিয়ে—নবতর প্রকাশরূপে—বিশ্বধর্মের প্রতীকরূপে। দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈত, শৈব শাক্ত গাণপত্য, মুসলমান খৃষ্টান জরোয়াষ্ট্রিয়ান প্রভৃতি জগতের সকল ধর্ম ও মতবাদের

---

* ১৮৯৫ সালে আমেরিকা থেকে বিবেকানন্দ তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন, "...রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান ভক্তি প্রেম। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবে দয়া। তোরা এখনো বুঝতে পারিসনি। 'শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ' (কেউ কেউ এঁর বিষয় শুনেও এঁকে জানতে পারে না)। What the whole Hindu race has thought in ages, he lived in one life. His life is a living commentary to the Vedas of all nations. ...সমগ্র হিন্দুজাতি সহস্র সহস্র যুগ ধ'রে যে চিন্তা ক'রে এসেছে, তিনি এক জীবনেই সে সমুদয় ভাব উপলব্ধি করেছেন। তাঁর জীবন সকল জাতির বেদসমূহের জীবন্ত টীকা স্বরূপ।" ...অন্যত্র বলেছিলেন ...."সর্বভাবের এমন সমন্বয় জগতের ইতিহাসে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়? এ থেকেই বোঝ তিনি কে দেহধারণ ক'রে এসেছিলেন। অবতার বলে তাঁকে ছোট করা হয়।"

যুগোপযোগী অধুনাতন প্রকাশরূপে। মানব সভ্যতার প্রগতি ও উন্নয়নের সঙ্গে ভবিষ্যতে যত ধর্মের উদ্ভব সম্ভব, তারও পরিপূর্ণ বিকাশরূপে। এই পরম সত্যটি জানাবার প্রয়োজন ছিল—তাই বিবেকানন্দের আগমন। *

* *

১৮৮৬ সালের ১৬ই আগষ্ট সোমবার রাত্রি ১টা ৬ মিঃ। মহানিশায় তিনবার 'কালী'র নাম উচ্চারণ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমগ্ন হ'লেন। পরদিন মধ্যাহ্নের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেই সমাধি অবস্থায় অবস্থান করেন। ঐ সমাধিই মহাসমাধিতে পরিণত হ'ল। তিনি দেহত্যাগ ক'রে লীন হ'য়ে গেলেন নিজ স্বরূপে।

অপরাহ্ণে তাঁর পূতদেহ নববস্ত্র-পুষ্প-মাল্যাদিতে সুশোভিত ক'রে কাশীপুর শ্মশানে ভস্মীভূত করা হয়। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হ'য়ে উঠে। শোকে মুহ্যমান নরেন্দ্রাদি শিষ্যগণ ঠাকুরের দেহের পূতভস্মাস্থি একটি তামার কলসী ক'রে নিয়ে এসে স্থাপন করলেন ঠাকুরের শয্যার উপর।...

পরদিন শ্রীসারদাদেবী বিধবার বেশ ধারণ করতে যাচ্ছেন। খু'লে ফেলছেন একে একে সব আভরণ। হাতের বালা যখন খুলতে যাচ্ছেন তখন তাঁর হাত চেপে ধ'রে ঠাকুর বললেন, "বালা খুলো না...আমি এই তো রয়েছি।...এঘর থেকে সে ঘরে যাওয়া বইতো নয়।" তিনি আরো বলেছিলেন, "তুমি জগতের মহালক্ষ্মী। লক্ষ্মী নিরাভরণ হ'লে জগতের দুঃখদারিদ্র্যের অন্ত থাকবে না।"

শ্রীসারদাদেবী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ স্বর্ণ-আভরণ দেহে ধারণ করেছিলেন।

---

* তিনি বলেছেন, "আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁকে 'দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু' করেছি।"

অপ্রত্যাশিতভাবে ঠাকুরের দর্শন পেয়ে, আর তাঁর মুখের কথা শুনে সকলেই বুঝলেন, প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরের মৃত্যু হয়নি! তিনি শুধু দেহটি ত্যাগ ক'রে অপ্রকট হয়েছেন। তিনি আছেন আরো জীবন্তরূপে, সূক্ষ্মদেহে চৈতন্য-ঘনরূপে।

শ্রীসারদাদেবীর নির্দেশে সেদিন থেকেই ঠাকুরের পূজাদির প্রবর্তন হ'ল। স্থূলদেহে অবস্থানকালে যেমন তাঁর সেবাদি করা হ'ত, তেমনি ভাবে তাঁর সেবাপূজা ভোগরাগাদি আরম্ভ হ'ল। ভক্তেরা শ্রীঠাকুরের দেহাবশেষপূর্ণ কলসীটিকে কেন্দ্র ক'রে কাশীপুরের বাগানে রইলেন আরো সাত দিন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীও ছিলেন। বাড়ীভাড়ার মেয়াদ শেষ হ'লে শ্রীমা গেলেন বাগবাজারে বসু বলরাম-ভবনে। ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং ভস্মাস্থি-পূর্ণ কলসটিও স্থানান্তরিত হ'ল বলরাম মন্দিরে।...

আট

শ্রীমা কয়েকজন মহিলা ও যুবক ভক্তের সঙ্গে গেলেন শ্রীবৃন্দাবনে। ঠাকুরকে কেন্দ্র ক'রেই যুবক ভক্তগণ কাশীপুরে সমবেত হয়েছিলেন। ঠাকুর তাঁদের দীক্ষিত করেছিলেন ত্যাগের মন্ত্রে। কিন্তু তাঁর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের মাথা গুঁজবার স্থান রইল না। অনেকেই বাড়ীতে ফিরে গেলেন। কেউ কেউ পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। যোগীন ও লাটু শ্রীমায়ের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়েছেন। তারকও কয়েকদিন পরেই গেলেন বৃন্দাবনে। কাশীপুরের লীলা শেষ হ'ল।

নরেন্দ্রনাথের প্রাণ মহা অস্থির। ঠাকুর দেহত্যাগের পূর্বে সব যুবক ভক্তদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। অথচ তিনি তো কপর্দক-হীন নিরুপায়। এদিকে তাঁর বসতবাটী নিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলায় জর্জরিত্। কোথায় কি ভাবে যুবকভক্তদের একত্রিত করবেন, সেই চিন্তা তাঁর অন্তরকে আকুল করেছে। ঠাকুরের শেষ আদেশটি রক্ষা করতে পারছেন না বলে তাঁর প্রাণে শান্তি নেই। তিনি বলরাম মন্দিরকে কেন্দ্র ক'রে ভক্তদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। এমন সময় এক অভাবনীয় উপায়ে শ্রীঠাকুরের বিশেষ ইচ্ছায় সকল সমস্যার সমাধান হ'ল। নরেন্দ্র ঘন অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলেন আলোক-শিখা।...

ঠাকুরের পরম ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র একদিন আফিস থেকে ফিরে পোষাক বদলাচ্ছেন। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। এমন সময় ঠাকুর সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হ'য়ে তাঁকে বললেন, "সুরেন্দ্র, তুমি ক'রছ কি? ছেলেরা নিরাশ্রয়ের মতো এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের জন্য কোথাও একটু থাকার ব্যবস্থা এখনো করলে না?" ঐ দেববাণী শুনে সুরেন্দ্র স্তম্ভিত। তখনই বের হ'লেন নরেন্দ্রের সন্ধানে। খোঁজাখুঁজির পরে বলরাম মন্দিরে তাঁর দেখা পেলেন। ঠাকুরের দর্শন ও তাঁর প্রত্যাদেশের কথা জানিয়ে সুরেন্দ্রনাথ সজল নয়নে বললেন, "ভাই রে! তোরা কোথায় যাবি? ঠাকুরের আদেশ।...কোথাও একটা বাড়ী ভাড়া কর্—সেখানে তোরা সকলে থাকবি। আমরাও মাঝে মাঝে গিয়ে সংসারের জ্বালা জুড়াব। আমি তো কাশীপুরে তাঁর সেবার জন্য কিছু কিছু দিতাম, সেটা আর বন্ধ করব না। তোকে মিনতি করছি, তুই একটা ব্যবস্থা কর্, যাতে সকলে একত্রে থাকতে পারে।"...

এ যেন হাতের মুঠোর মধ্যে আকাশ পাওয়া। নরেন্দ্রনাথ আনন্দে অধীর হ'য়ে বললেন, "আমার প্রাণেও তো ঐ একমাত্র চিন্তা—কি ক'রে

সকলকে নিয়ে একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে থাকি !...ঠাকুরের যখন আদেশ হয়েছে, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"...

পরদিনই কয়েকজন যুবক ভক্তকে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ বাড়ীভাড়ার সন্ধানে বের হ'লেন। কয়েক দিনের মধ্যেই কলিকাতার উপকণ্ঠে, বরাহনগরে একটি ভূতুড়ে বাড়ী মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় ঠিক হ'ল। তখন তাঁর বিশেষ ক'রে মনে পড়ল 'তারকদার' কথা। তিনি তো ঠাকুর থাকতেই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছেন।

তারকনাথ ততদিনে বৃন্দাবন হ'য়ে কাশীতে এসে সাধন-ভজনে রত হয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ বাড়ীভাড়া ও অন্যান্য খবর জানিয়ে তাঁকে অবিলম্বে চ'লে আসার অনুরোধ জানালেন। তারকনাথ চিঠি পেয়েই কালবিলম্ব না ক'রে চ'লে এলেন কলিকাতায়।

তারকনাথ ও বুড়ো গোপালদাকে নিয়েই বরাহনগর মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম সূচনা হ'ল। ক্রমে শ্রীঠাকুরের বিছানাপত্র এবং ভস্মাস্থি ('আত্মারামের কৌটা') স্থাপিত হ'য়ে নিয়মিত পূজা ভোগরাগ আরাত্রিকাদি চলতে লাগল। নরেন্দ্রনাথের বাড়ী নিয়ে মোকদ্দমা তখনো চলছে। তিনি রাত্রে বরাহনগর মঠে থাকেন। দিনে মামলার তদ্‌বিরে কলিকাতায় ঘোরা-ঘুরি ক'রতে হয়। গৃহী ভক্তদেরও যাতায়াত আরম্ভ হ'ল। যুবক ভক্তরা মাঝে মাঝে আসেন। নরেন্দ্র ভক্তদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে এক রকম জোর ক'রে তাঁদের নিয়ে আসেন মঠে। তখন সকলেরই প্রাণে তীব্র বৈরাগ্য, ঈশ্বরলাভের জন্য প্রাণ ব্যাকুল। এইভাবে শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের দেড় মাসের মধ্যেই বরাহনগর মঠ স্থাপিত হ'ল। আজ সমগ্র বিশ্বে যে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে, তার শুভ-সূচনা বরাহনগর মঠকে কেন্দ্র ক'রে এবং নরেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক ও অক্লান্ত চেষ্টায়।

* * *

ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ বাবুরামের ভক্তিমতী মাতা—তাঁদের গ্রাম হুগলী জেলার আঁটপুরে নরেন্দ্রাদি যুবকভক্তদের আমন্ত্রণ করেন। বাবুরাম শরৎ শশী তারক কালী নিরঞ্জন গঙ্গাধর ও সারদাকে সঙ্গে ক'রে নরেন্দ্রনাথ আঁটপুরে উপনীত হ'লেন। পল্লীগ্রামের শান্ত সুন্দর ও নির্জন আবেষ্টনীতে এসে সকলেই বিশেষ আনন্দিত। বাবুরামের মাতার আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা তাঁদের অন্তর স্পর্শ ক'রল। নরেন্দ্রাদির প্রাণে তখন তীব্র বৈরাগ্য। আঁটপুরে এসে তাঁরা ধ্যান-ভজনাদিতে ডুবে গেলেন। কখনও ভজন কীর্তনাদি হয়, আবার শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা। তাঁরা সারারাত ধ্যান ক'রে কাটিয়ে দেন। শীতকাল। রাত্রে ধুনি জ্বালিয়ে তার চারিদিকে সকলে ধ্যানে বসেন। রাত যত গভীর হয়, ধ্যানের গভীরতাও তত বেড়ে যায়। ধুনির উধ্বর্মুখ অগ্নিশিখার ন্যায় নবীন বৈরাগীদের মনও উধ্বর্মুখ হ'য়ে ব্রহ্মসংস্থ হ'য়ে যায়। গ্রামের গভীর নীরবতা ও প্রশান্তি মনঃসংযমের সাহায্য ক'রে। কখনো 'হর হর বোম্ বোম্' ধ্বনিতে গ্রামের নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয়। মাথার উপর অগনিত তারকাখচিত নীল আকাশের চন্দ্রাতপ।

একরাত্রে সকলেই ধ্যানে বসেছেন। গভীর স্তব্ধতার মধ্যে প্রথম প্রহর কেটে গেল। হঠাৎ নরেন্দ্রনাথ ভাবাবিষ্টের মতো চোখ মেলে যীশুর অনুপম জীবনকথা বলতে লাগলেন। মেরীকোলে যীশুর আবির্ভাব, তাঁর শৈশবের অনাড়ম্বর দিনগুলি, জর্ডন্ নদীর তীরে দীক্ষা, তাঁর জ্বলন্ত ত্যাগ তপস্যা বৈরাগ্য আত্মানুভূতি, শিষ্যসংগ্রহ ও প্রচার—এমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় নরেন্দ্র বর্ণনা করলেন যে, সকলের প্রাণে যেন যীশু জীবন্তরূপ ধ'রে আবির্ভূত হ'লেন। পরে যীশুর ত্যাগিসঙ্ঘ-সংগঠনের কথা ব'লে তিনি গুরুভ্রাতাদের কাছে আবেদন জানালেন—তাঁরাও যেন প্রত্যেকে খ্রীষ্টের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। পাপীতাপীর ত্রাণকর্তা যীশু। জগতকে দুঃখমুক্ত করবার জন্য ক্রুশবিদ্ধ হ'য়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেছেন। তাঁরাও যেন সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে জগতের কল্যাণে

জীবন উৎসর্গ করেন। ধুনির সামনে দাঁড়িয়ে সকলেই শ্রীভগবানের নামে সন্ন্যাসের শপথ গ্রহণ করলেন। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—এই তাঁদের সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ। যীশু ও রামকৃষ্ণের জয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হল।* শপথ গ্রহণের পরে তাঁরা যখন জানলেন যে, সে দিন ২৪শে ডিসেম্বর 'ক্রিষ্টমাস ইভ' যীশুর জন্মের পূর্বদিন, তখন তাঁদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। তাঁদের মনে হ'ল বিধাতার নির্দেশেই—ভগবানের নরশরীর-ধারণ-দিনে তাঁরাও সন্ন্যাস-জীবন-যাপনের পবিত্র ব্রত গ্রহণ করেছেন। তাঁদেরও হ'ল নবজন্ম।

* * *

আঁটপুরের পরে অনেকেই বরাহনগর মঠে বাস করতে লাগলেন। নরেন্দ্রও বেশীর ভাগ মঠেই থাকতেন। মোকদ্দমা তখনো শেষ হয়নি। তাঁকে মাঝে মাঝে কলিকাতায় যেতে হ'ত। কিন্তু তিনিই ছিলেন মঠের প্রাণস্বরূপ, সকল প্রেরণার উৎস। বরাহনগরের জীবন কৃচ্ছ্রসাধন ও ত্যাগ-তপস্যা পূর্ণ। সূর্যোদয় হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কীর্তন চলেছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তি-বোধ নেই। আবার কোন দিন চলেছে উদয়াস্ত জপ-যজ্ঞ। রাত রাত জেগে ধ্যান করছে কেউ। ব্রাহ্মমুহূর্তে নরেন্দ্রনাথ গাইতেন, "জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী।" তখন সকলেই ধ্যানে বসতেন। দুপ্রহর পর্যন্ত চলত ধ্যান জপ স্তবাদি পাঠ। আবার কখনো ধর্ম ও দর্শনাদির সঙ্গে ইতিহাস জড় বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, সাহিত্য শিল্পকলা, গীতা উপনিষদ—ক্যানট মিল হেগেল স্পেন্সার এমন কি

* খ্রীষ্ট ও রামকৃষ্ণজীবনের মধ্যে চিন্তাও কার্যে বহু সাদৃশ্য বর্তমান। যীশু দেহ ত্যাগ করার পূর্বে সন্ন্যাসীসঙ্ঘ রচনা ক'রে ভগবদ্‌বাণী ও ভাব প্রচারের ভার অর্পণ করেছিলেন ত্যাগী শিষ্যদের উপর। শ্রীরামকৃষ্ণও দেহত্যাগের পূর্বে একাদশ শিষ্য দ্বারা সন্ন্যাসী সঙ্ঘ গঠন পূর্বক জগতে মহদ্ধর্ম প্রচারের জন্য তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।...শ্রীরামকৃষ্ণ, খ্রীষ্ট-ধর্মের সাধনাকালে যীশুর দর্শন পান। যীশুখ্রীষ্ট রামকৃষ্ণকে আলিঙ্গন ক'রে তাঁর শরীরে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। যীশু ও রামকৃষ্ণ তদবধি এক আত্মা। জর্ডন নদী যেন মিলিত হল গঙ্গার সঙ্গে।...ঠাকুর বলেছিলেন, "খ্রীষ্টান ধর্মও ভগবান লাভ করার একটি পথ।"

নাস্তিক ও জড়বাদীদের মতামতেরও তুমুল আলোচনা হ'ত। সন্ধ্যায় ধূপদীপ জ্বালিয়ে কাঁসার ঘণ্টা বাজিয়ে ঠাকুরের আরাত্রিক হ'ত। শশী তালে তালে ভাবময় নৃত্য করতে করতে আরাত্রিক ক'রতেন। কখনো বা উদ্দাম নৃত্যের সঙ্গে—'জয় শিব ওঁকার, ভজ শিব ওঁকার—হর হর মহাদেব' সমস্বরে গীত হ'য়ে চারিদিক হ'ত আনন্দমুখরিত। শশী এত তন্ময় হ'য়ে যেতেন যে সময়ের জ্ঞান থাকত না। কোন কোন দিন একঘণ্টা ধরে আরতি করতেন। তাঁর সেই তন্ময়তা সকলের প্রাণেই সংক্রামিত হ'ত।

১৮৮৬'র শেষভাগ হ'তে ১৮৯২ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত ঐ বরাহনগর মঠের ভূতুড়ে বাড়ীটি নবীন বৈরাগীদের তপস্যার স্থান ছিল। ১৮৮৭ সালের প্রারম্ভে কোনও সময়ে সকলে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিরজা হোম করে সন্ন্যাস নিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের ললাটে এঁকে দিয়েছিলেন ত্যাগের চিহ্ন। নূতন নাম ও বেশে তাঁরা হ'লেন ভূষিত। অতীতের সব স্মৃতি তাঁরা মুছে দিলেন তাঁদের মন থেকে। নূতন ব্রত—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" তাঁরা করলেন গ্রহণ।* শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যদ্ভুত ত্যাগ বৈরাগ্য পবিত্রতা ও ভগবানলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা, সর্বক্ষণ ঈশ্বরলাভের চিন্তায় মগ্নতা সকলের প্রাণে জাগিয়ে তুলত নূতন প্রেরণা। তিনি যা দেখিয়েছেন, তার

* ১৮৯৫ খৃঃ (শরৎকাল)—আমেরিকা থেকে স্বামীজী তাঁর শিষ্য আলাসিঙ্গাকে লিখেছিলেন, "যখন আমি সন্ন্যাসী হই, তখন আমি বুঝেসুঝেই ঐ পথ নিয়েছিলাম। বুঝেছিলাম শরীরটাকে অনাহারে মরতে হ'বে। তাতে কি হয়েছে ? আমি তো ভিখারী। আমার বন্ধুরা সব গরিব, আমি গরিবদের ভালবাসি। আমি দারিদ্র্যকে সাদরে বরণ করি। কখনো কখনো যে আমায় উপবাস ক'রে কাটাতে হয়, তাতে আমি খুশী। আমি কারো সাহায্য চাই না—তাতে ফল কি ? সত্য নিজের প্রচার নিজেই করবে। আমার সাহায্যের অভাবে সে নষ্ট হ'য়ে যাবে না। "সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব"—সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ জয়-অজয় সব সমান জ্ঞান ক'রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও (গীতা)।...এরূপ অনন্ত ভালবাসা, সর্বাবস্থায় এরূপ অবিচলিত সাম্যভাব থাকলে এবং ঈর্ষ্যা দ্বেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'লে তবে কাজ হবে। আমার সাহায্যের অভাবে সে নষ্ট হ'য়ে যাবে না।" স্বামীজীর একথা ক'টি সন্ন্যাসের মহিমা ও দারিদ্র্য প্রকাশক।

শতাংশের একাংশও করতে পারছিনে, ধিক্ আমাদের! তাঁর শিষ্য ব'লে পরিচয় দেবার যোগ্যতা অর্জন এখনো হ'ল না—কি অপদার্থ আমরা—এই সকল চিন্তা তাঁদের মনকে অস্থির করত। নব উদ্যমে, নূতন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাঁরা আরো ডুবে যেতেন সাধন ভজনে।

বরাহনগর মঠের জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের ইতিহাসে এক অতি উজ্জ্বল অধ্যায়। ঐ ত্যাগ-তপস্যা এবং অপরিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সঙ্ঘকে দিয়েছে শতযুগের স্থায়িত্ব। ঈশ্বরদর্শনের বাসনা প্রত্যেকটি হৃদয়ে দাবাগ্নির মতো সর্বক্ষণ প্রজ্বলিত হ'য়ে থাকত। তাতে দগ্ধ হ'য়ে যেত জাগতিক সকল চিন্তা—সকল বাসনা। নরেন্দ্রাদি প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করতে উদ্যত।

আহারাদির কোন স্থিরতা ছিল না। তার জন্য কারো কোন চেষ্টাও ছিল না। সব দিন পর্যাপ্ত আহার জুটত না। গল্পচ্ছলে পরে বিবেকানন্দ সেই আনন্দময় দিনগুলির কথায় বলেছিলেন, "বরাহনগরে এমন কত দিন গিয়েছে যে খাবার কিছুই নেই। ভাত জোটে তো নুন জোটে না। দিনকতক হয়তো নুনভাত চললো। কিন্তু কারো তাতে দৃষ্টি নেই। জপ ধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা ভাসছি। কখন কখন শুধু তেলাকুচপাতা-সিদ্ধ ও নুনভাত—এই চলছে। আহা! সেসব কি দিনই গিয়েছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত, মানুষের কথা কি?..."

বরাহনগরের তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনে যেন তৃপ্ত না হ'য়ে নবীন সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ কেউ পরিব্রাজকরূপে তীর্থপর্যটন ও তপস্যাদিতে যেতে লাগলেন। সর্বাবস্থায়—সর্ববিষয়ে শ্রীভগবানের উপর নির্ভরশীল হ'য়ে থাকাই পরিব্রাজক জীবনের উদ্দেশ্য। তাতে ভগবদ্-বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়।

বিবেকানন্দের প্রাণে তখন তীব্র বৈরাগ্য। তিনিও অন্তরে অসীমের ডাক শুনতে পেতেন। কিন্তু তিনি অপরিসীম ধৈর্য অবলম্বন ক'রে অনুকূল সময়ের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ঠাকুরের শেষ আদেশ স্মরণ ক'রে তিনি তখনই

বরাহনগর মঠ ত্যাগ ক'রে যেতে পারেন নি। গুরুভাইদের সঙ্ঘবদ্ধ করা ও তাঁদের জীবনের পূর্ণতা বিধানের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। শুধু সাধন ভজন নয়, অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অনুভূতির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও প্রেমের বাণীর সামঞ্জস্য তিনি বোঝাতে লাগলেন গুরুভাইদের। তুলনামূলক ভাবে শিক্ষা দিতে লাগলেন সাংখ্য বেদান্ত ন্যায় ও যোগাদি ষড়-দর্শন, ধর্মশাস্ত্র বিজ্ঞান ইতিহাস সমাজ-বিজ্ঞান। জ্ঞান বৃক্ষের সকল শাখা প্রশাখার পরিচয় ও ফলের আস্বাদ দিয়ে তিনি সকলকে আচার্যরূপে গড়ে তুলছিলেন।

সন্ন্যাসীরা প্রায় সকলেই মঠত্যাগ ক'রে ভ্রমণে বহির্গত হতেন। একমাত্র স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কখনো তা করেন নি। তিনি ছিলেন 'মঠের সুস্থির কেন্দ্র'—শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বস্ত সেবক। তিনি ঠাকুরের সেবা-পূজাদি নিয়ে বরাহনগর মঠেই পড়ে থাকতেন। তাঁর একনিষ্ঠ সেবার আদর্শ শত শত প্রাণে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে দিয়েছে। তিনি ঠাকুরকে কেন্দ্র ক'রে—ঠাকুরের সেবা-পূজাকে চরম সাধনা ও পরমার্থ জ্ঞান ক'রে—আশ্রম ছেড়ে কোথাও যান নি।...

কাশীপুর উদ্যানে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে শ্রীসারদাদেবীকে বলেছিলেন, "...ওগো, তোমরা ভেবো না।...কালে ঘরে ঘরে (নিজের শরীর দেখিয়ে) এর পূজা হবে।" দক্ষিণেশ্বরে নহবতের নীচের ঘরে যেখানে শ্রীসারদাদেবী থাকতেন, সেখানে অন্যান্য ঠাকুর-দেবতার ছবির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি ছবিও রক্ষিত ছিল। শ্রীসারদাদেবী তা পূজা করতেন। একদিন ঠাকুর ভাবাবেশে নহবতে গিয়ে, তাঁর ঐ ছবিখানি ফুল বিল্বপত্র দিয়ে পূজা করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্‌বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হ'তে চলেছে। আজ সমগ্র বিশ্বে অগণিত নরনারী তাঁকে শ্রীভগবানের নবতম বিকাশ জ্ঞানে পূজা করছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের একনিষ্ঠ পূজা হয়েছে তার পথপ্রদর্শক।

নয়

বরাহনগর মঠকে প্রতিষ্ঠিত দেখে স্বামীজী একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর গুরুভাইরা তীর্থপর্যটনে যেতেন ; কিন্তু বরাহনগর মঠই ছিল তাঁদের একমাত্র স্থায়ী কেন্দ্র—যেখানে ক্লান্ত-বিহঙ্গের মতো তাঁরা ফিরে আসতেন। স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা শিবানন্দ বলেছিলেন, "...যদিও আমরা পরিব্রাজকরূপে তপস্যা ও তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে যেতুম, কিন্তু আমাদের মন প'ড়ে থাকত বরাহনগর মঠে 'আত্মারামকে' কেন্দ্র ক'রে।..."

প্রথমটায় স্বামীজী দিন কতকের জন্য বৈদ্যনাথ ও সিমুলতলা প্রভৃতি স্থানে গিয়েছিলেন। আবার ফিরে এলেন বরাহনগরে। কিন্তু ১৮৮৮ খৃঃ তিনি হঠাৎ বেরিয়ে পড়েন এবং বারাণসী অযোধ্যা লক্ষ্ণৌ আগ্রা বৃন্দাবন হাতরাস হ'য়ে হিমালয়ের পাদদেশে হরিদ্বার হৃষীকেশ পর্যন্ত গমন করেন—পরিব্রাজকরূপে। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ও গুরুভাইদের বিশেষ অনুরোধে তিনি বরাহনগরে ফিরে এলেন।...

এই ভ্রমণের ভিতর দিয়ে তিনি অনেক কিছু শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং তাঁর অন্তরে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি একটা সক্রিয় রূপ নিয়েছিল। তিনি নিঃসম্বল দণ্ডকমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর বেশেই ভ্রমণ করতেন। সাধারণ সন্ন্যাসীর মতো ভিক্ষান্নের উপরই তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। অনেক সময় দেহরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত আহারও তাঁর জুটত না।

কাশীতে অবস্থানকালে তিনি একটি বড় শিক্ষা লাভ করেন। একদিন ৺দুর্গাবাড়ির মন্দির দর্শনে যাত্রা করেছেন, এমন সময় একদল বানর তাঁকে তাড়া ক'রল। তিনি নিরুপায় হ'য়ে যত ছুটছেন, বানরগুলোও তত বেশী তেড়ে এল। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, কে যেন বলছে—"থামো থামো। পালিও না—রুখে দাঁড়াও।" স্বামীজীও রুখে দাঁড়াতেই বানরের দল

ভয়ে পালিয়ে গেল। স্বামীজী ঐ ঘটনার উল্লেখ ক'রে বলতেন, "Face the brutes. Face nature, face ignorance, illusion. Never fly !" অর্থাৎ পশুদের সামনে রুখে দাঁড়াও। বীরের মতো প্রকৃতি, অজ্ঞান ও মায়ার সম্মুখীন হও। কদাচ তাদের ভয়ে কাপুরুষের মতো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না।

কাশী হ'তে অযোধ্যা লক্ষ্ণৌ হ'য়ে তিনি এলেন আগ্রায়। 'করতল ভিক্ষা তরুতল বাস'—এইভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে বেড়াতেন। ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'ত! কিন্তু তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি। তিনি শ্রীভগবানকে প্রতিপদে 'যাচিয়ে বাজিয়ে' নিয়েছেন।

আগ্রায় তাজমহল দেখে তিনি বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলতেন, "এই বিশাল অনুপম ভাস্কর্যের তুলনা হয় না। এর অতি ক্ষুদ্র অংশ পর্যন্ত একদিন ধ'রে দেখবার যোগ্য। সমগ্র সৌধটি ভাল ভাবে দেখতে গেলে অন্ততঃ ছ'মাস সময়ের প্রয়োজন।"

বৃন্দাবনের পথে চলেছেন—ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত। ধূলিধূসর মলিন দেহ। পথে দেখলেন একজন বেশ আরাম ক'রে বসে তামাক খাচ্ছে। তাঁরও তামাক খাবার ইচ্ছা হ'ল। লোকটির কাছে কল্‌কেটি চাইতেই সে বিশেষ সঙ্কুচিত হ'য়ে বলল, "মহারাজ, ম্যায় ভঙ্গী হুঁ।" তিনি তার তামাক খেলেন না।

অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে তাঁর মনে হ'ল, "আমি না সন্ন্যাসী! এই আমার সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন! এখনো সামান্য জাতিভেদের পারে যেতে পারলুম না!"

ফিরলেন স্বামীজী। লোকটি তখনো তামাক খাচ্ছিল। তার কোন আপত্তি গ্রাহ্য করলেন না। তার হাত থেকে কল্‌কেটি নিয়ে তামাক খেয়ে এগিয়ে চললেন বৃন্দাবনের দিকে।*

* স্বামীজীর মুখে ঐ গল্প শুনে গিরিশ বাবু ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন, "তুমি গাঁজাখোর। তাই নেশার ঝোঁকে মেথরের কলকে টেনেছিলে।" তিনি বলেছিলেন, "না না, জি সি। সত্যই নিজেকে পরীক্ষা

বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে আশ্রয় নিলেন স্বামীজী। শ্রীকৃষ্ণ-মহিমার জ্যোতিতে তাঁর অন্তর ভ'রে গেল। নূতন চোখ খুলে গেল। নিষ্কাম-জীব-কল্যাণরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বামীজীর মনপ্রাণ অধিকার করেছেন—তিনি পূর্ণকাম হয়েও জগতের কল্যাণের জন্য অক্লান্ত কর্ম ক'রে গিয়েছেন।

গিরিগোবর্ধন পরিক্রমা-কালে স্বামীজী সংকল্প করলেন—আজ কারো কাছে ভিক্ষা চাইব না। শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যে এসেছি—দেখি তিনি খেতে দেন কি না। যা সংকল্প, তাই কাজ। দু'প্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর—তার উপর মুসলধারে বৃষ্টি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। শরীর অবসন্ন। আর চলতে পারেন না—তবু ভিক্ষাপ্রার্থী হলেন না কারো কাছে। এগিয়েই চলেছেন। এমন সময় শুনতে পেলেন কে যেন পেছন থেকে তাঁকে থামবার জন্য ডাকছে। তিনি তা গ্রাহ্য করলেন না। আপন মনে চলেছেন। ক্রমে একটি লোক ছুটতে ছুটতে এসে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল। তার হাতে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য। স্বামীজীকে মিনতি ক'রে ঐ খাবার গ্রহণ ক'রতে বলল। তিনি বিস্মিত হ'লেন। বুঝলেন সবই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কাজ। আবেগে তাঁর চোখে জল এল।...

শ্রীবৃন্দাবনে আর একটি ঘটনা স্বামীজীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি রাধাকুণ্ডে গিয়েছেন। একমাত্র বহির্বাস সম্বল। কুণ্ডের জলে সেখানি ধুয়ে শুকাতে দিয়ে তিনি নেমেছেন স্নান করতে। স্নানান্তে দেখলেন যে বহির্বাস সেখানে নেই। জনমানব শূন্য স্থান। অবাক হ'য়ে দেখলেন এক বানর তাঁর কাপড়খানি নিয়ে গাছের এক উঁচু ডালে বসে আছে। তাঁর অন্তর বেদনা ও তিক্ততায় ভ'রে গেল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। ফল কিছুই

ক'রে দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। সন্ন্যাস নিয়ে পূর্বসংস্কার দূর হয়েছে কিনা, জাতিবর্ণের পারে চলে গেছি কিনা তা-ই পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলাম। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী হওয়া বড় কঠিন। কথা ও কাজে একচুল এদিক সেদিক হবার জো নেই।"

হল না। কাপড়খানি ফিরে না পেয়ে তাঁর দারুণ অভিমান হ'ল কুণ্ডাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধারাণীর উপর। তাঁর রাজ্যে এ হেন অত্যাচার! লোকালয়ে না গিয়ে তিনি নিরুপায় হ'য়ে চললেন জঙ্গলের দিকে। কিছু দূর যাবার পরেই শুনতে পেলেন, কে যেন তাঁকে ডাকছে পিছন থেকে। মুখ ঘুরিয়ে একবারও তাকালেন না তিনি। কণ্ঠস্বর ক্রমে নিকটবর্তী হ'তে লাগল। একটি লোক দ্রুতবেগে এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে, লোকটির হাতে কাষায় বস্ত্র ও খাবার। স্বামীজীর বুঝতে দেরী হ'ল না—এসব রাধারাণীর কাণ্ড।

চিন্ময়ধাম শ্রীবৃন্দাবনের মহিমায় তাঁর অন্তর ভরে গেল। চিন্ময় শ্যাম ও চিন্ময়ী রাধারাণীর অবস্থিতি অনুভব ক'রে তিনি বিশেষ আনন্দিত হলেন। * "নিত্যভগবান, নিত্যধাম, নিত্যভক্ত।"...

বৃন্দাবনের পরে হরিদ্বারের পথে হাথরাসে এসেছেন। ষ্টেশান প্লাটফরমের এক কোণে বসে আছেন চুপচাপ। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন। এমন সময় এসিষ্টেণ্ট্ ষ্টেশান মাষ্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তের নজর পড়ল স্বামীজীর উপর। থমকে দাঁড়ালেন। যেন দীপ্তপাবক—এ সৌম্য কে? দেখেই তাঁর মনে হ'ল; "বা, এমন সাধু তো কথনো দেখি নি!"

কৌতুহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার খাওয়া হয়েছে?" খাওয়া হয়নি জানতে পেরে, বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজ আস্তানায়।

ক্রমে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হ'ল। স্বামীজীর সঙ্গে যত মিশতে

* শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে প্রথমে তিনি মানতেন না ঐতিহাসিক ব্যক্তি ব'লে। ঠাকুরের সঙ্গে তিনি কত তর্ক করেছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলার কত কঠোর সমালোচনা করতেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের তর্ক শুনে শুধু বলেছিলেন, "বেশ তো—শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে তোর মেনে কাজ নেই। কিন্তু তাঁদের ভাবগুলি তো তুই নিতে পারিস। ভাবগুলিই তুই নে না।" ঠাকুরের কথা সত্য হয়েছে। স্বামীজী কৃষ্ণ ও রাধাকে শুধু মানেননি। তাঁরা ভাবঘনরূপে তাঁর অন্তরে প্রবেশ ক'রে তাঁকে বিহ্বল করেছেন।

লাগলেন ততই তিনি মুগ্ধ হ'লেন। স্বামীজীর কপালে ভগবান স্বহস্তে রাজ-তিলক এঁকে দিয়েছিলেন। কোথাও আত্মগোপন ক'রে থাকার জো ছিল না। তাঁর সুঠাম মূর্তি বহু লোকের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী সাধারণতঃ কোন স্থানে তিন দিনের বেশী অবস্থান করতেন না। কিন্তু হাথরাসে তাঁর মুখে বিবিধ ধর্মপ্রসঙ্গ ও মধুর সঙ্গীত শ্রবণ ক'রে স্থানীয় পদস্থ ব্যক্তিগণও এত আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁরা কিছুতেই স্বামীজীকে ছাড়তে চাইলেন না। সকলের বিশেষ অনুরোধে স্বামীজীকে কিছুদিন তথায় থাকতে হ'ল। দিনের পর দিন অধিকতর লোক তাঁর মুখে ধর্মপ্রসঙ্গ শুনবার জন্য অসতে লাগল। ঐ যুবক সন্ন্যাসী সমগ্র হাথরাসকে ধর্মভাবে মাতিয়ে তুলেছিলেন।

শরৎবাবু* একদিন শিষ্যের ন্যায় বিনীত হ'য়ে কিছু তত্ত্বোপদেশের জন্য স্বামীজীকে ধ'রে বসলেন। স্বামীজী তার জবাব দিলেন শুধু একটি গান গেয়ে—

"বিদ্যা যদি লভিতে চাও,
চাঁদ মুখে ছাই মাখ, নইলে এই বেলা পথ দেখ।"

গানটির ব্যঞ্জনা শরৎবাবুর অন্তর স্পর্শ করল। তিনি বুঝলেন স্বামীজীর ইঙ্গিত। ত্যাগ ছাড়া অমৃতত্ব লাভ হয় না। তিনি করজোড়ে বললেন, "আপনার আদেশ পালনে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি।"

কয়েক দিন হাথরাসবাসীদের প্রাণে উচ্চ আধ্যাত্মিকভাব জাগ্রত ক'রে স্বামীজী একদিন বললেন যে, পরদিনই তিনি হৃষীকেশ যাত্রা করবেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে একস্থানে বেশী দিন থাকা উচিত নয়। কিন্তু শরৎবাবু স্বামীজীকে ছেড়ে

* ইনিই পরে সদানন্দরূপে স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য হ'লেন। ইনি বলতেন যে স্বামীজীর চোখ দুটিই তাঁকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছিল। এবং প্রথম দর্শনেই তাঁর উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ হয়।

থাকতে পারবেন না। তিনি তাঁর অনুগমনের সংকল্প ক'রে প্রাণের ইচ্ছা নিবেদন করলেন। স্বামীজী তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন, "তুমি সত্যই আমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত? পারবে অহংকার অভিমান ত্যাগ করতে—পারবে দারিদ্র্যকে বরণ ক'রে নিতে?"

শরৎবাবু অবনত মস্তকে সম্মতি জানাতেই তিনি বললেন, "এই নাও আমার ভিক্ষাপাত্রটি। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসো।"

ষ্টেশান-মাষ্টার শরৎবাবু একটুও দ্বিধা না ক'রে হাত বাড়িয়ে নিলেন ভিক্ষা-পাত্রটি। ষ্টেশানের কুলিদের কাছে ও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে লাগলেন। স্বামীজী খুব খুশী হ'য়ে তাঁকে সঙ্গে যাবার অনুমতি দিলেন।...

তপোভূমি হৃষীকেশে এসে স্বামীজী বিশেষ আনন্দিত হ'লেন। সাধারণ সাধুদের মতোই তিনি সশিষ্য ভিক্ষান্ন গ্রহণ ক'রে সাধন-ভজনে কালাতিপাত করতেন। তখনকার দিনে হৃষীকেশনিবিড়-বনানী-পরিবৃত সাধনভজনের অনুকূল স্থান ছিল। তাঁর অন্তরে হিমালয়ের গভীরে কেদারবদরী-দর্শনে যাবার ইচ্ছা হ'ল। হৃষীকেশের জলবায়ু তখন স্বাস্থ্যকর ছিল না। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল খুব। একবেলা ক'রে কোনপ্রকারে ভিক্ষান্ন খেয়ে দু'জনেরই শরীর বিশেষ ক্ষীণ ও দুর্বল হয়েছিল। এমন সময় শিষ্য কঠিন অসুখে আক্রান্ত হ'ল। স্বামীজী তো কপর্দকহীন সন্ন্যাসী। শিষ্যের প্রাণরক্ষার জন্য বিশেষ বিব্রত হ'য়ে পড়লেন। সেবাশুশ্রূষা দ্বারা শিষ্যকে রোগমুক্ত করাই হ'ল তাঁর একমাত্র চিন্তার বিষয়। ঐ সময়ের অবস্থা বর্ণনা ক'রে শরৎবাবু বলেছিলেন,..."আমি তো অসুস্থ হ'য়ে পড়লুম।...তিনি আমার জুতা সমেত সমস্ত জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে এলেন নিরাপদ স্থানে।...তাঁর সঙ্গে থাকলে মৃত্যুভয়ও তুচ্ছ জ্ঞান হ'ত।...তাঁর প্রেম-ভালবাসার কথা আর কি বলব? তিনি ছিলেন প্রেমের অবতার।..."

স্বামীজীর ভালবাসায় তিনি চিরতরে তাঁর গোলাম হ'য়ে গিয়েছিলেন। শরৎবাবুর গুরুভক্তি এত গভীর ছিল যে গর্ব ক'রে তিনি বলতেন, "আমি স্বামীজীর কুকুর।" প্রভুভক্তির প্রতীক কুকুর।...

শিষ্যের অসুস্থতার দরুণ কেদারবদরী দর্শনের সংকল্প ত্যাগ ক'রে কিছুদিন পরে স্বামীজী হাথরাসে ফিরে এলেন। স্বামীজীকে পুনরায় পেয়ে হাথরাস-বাসীদের আনন্দ আর ধরে না। কয়েকদিন পরেই স্বামীজী ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত হ'লেন। শরৎবাবু ও পুনরায় জ্বরে পড়লেন। দৈবক্রমে ঠিক সে সময়ে স্বামীজীর গুরুভ্রাতা শিবানন্দ বৃন্দাবনের পথে হাথরাসে উপস্থিত হন। স্বামীজীকে অসুস্থ দেখে বরাহনগর মঠে ফিরে যাবার জন্য তিনি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। ঐ মঠে স্বামীজীর অসুস্থতার খবর পৌঁছতেই গুরুভাইরা তাঁকে ফিরে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ক'রে পত্র লিখলেন।

দুর্বল শরীরেই তিনি স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে বরাহনগরের দিকে রওনা হ'লেন। গভীর বেদনাভরা প্রাণে শরৎবাবু স্বামীজীকে বিদায় দিলেন; কিন্তু তিনি তাঁর অভাব সহ্য করতে পারলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই কর্মত্যাগ ক'রে গুরুদেবের সঙ্গে মিলিত হ'লেন বরাহনগর মঠে।

আচার্য শঙ্কর ঠিকই বলেছেন :—

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।"

সাধুসঙ্গের মহিমা অপার। সাধু যেন স্পর্শমণি—যার সংস্পর্শে লোহাও সোনায় পরিণত হয়। তরুণ শরৎচন্দ্র স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে জীবনের অনিত্যতা বোধ করলেন—তাঁর মনে বিবেক ও বৈরাগ্যের উদয় হ'ল। শ্রেয়োলাভের পথ তিনি বেছে নিলেন। স্বামীজীই হ'লেন তাঁর জীবনতরীর কর্ণধার। সর্বোপরি তিনি স্বামীজীর মধ্যে এমন এক অপার্থিব প্রেমের সন্ধান পেয়েছিলেন, যা'র আকর্ষণ তাঁর সব সংসারবন্ধন ছিন্ন করে দিল।...

স্বামীজীকে পুনরায় বরাহনগর মঠে পেয়ে গুরুভ্রাতাগণ বিশেষ আনন্দিত। তিনিও ভ্রমণকালে যে শিক্ষালাভ করেছেন, তার সঙ্গে পরিচিত করলেন গুরুভাইদের। দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতার ঋত্বিক বিবেকানন্দ ভ্রমণের মাধ্যমে বুঝেছিলেন যে জগতের কল্যাণের জন্য, মুখ্যতঃ ভারতের কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং সে কঠিন কার্য-সম্পাদনের দায়িত্ব তাঁরই উপর রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "রামকৃষ্ণের প্রভাবে আপাতবিচ্ছিন্ন ভারত আবার এক হবে।" অন্যত্র লিখেছিলেন, "...শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে পারবে। তাঁর জীবন, তাঁর উপদেশ, চারিদিকে প্রচার করতে হবে—যে'ন হিন্দুসমাজের সর্বাংশে—প্রতি অণুতে পরমাণুতে এই উপদেশ ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কে এ কাজ করবে? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পতাকা বহন ক'রে কে সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্য যাত্রা করবে?...প্রভু যাকে মনোনীত করবেন, সে-ই ধন্য—সে-ই মহাগৌরবের অধিকারী।"...

ভারতের ঐক্য এবং তাকে অবলম্বন ক'রে সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডের এবং বিশ্বের ঐক্য-সাধনের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তাঁর সমন্বয়পূর্ণ জীবন। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও ঐ আদর্শ থেকে গ'ড়ে উঠবে বিশ্বমানবতা বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বপ্রেম। কি ভাবে তা ফলপ্রসূ হ'তে পারে, তা-ই হ'ল বিবেকানন্দের একমাত্র চিন্তার বিষয়।

উত্তর ভারতের একাংশ পর্যটন কালেই তাঁর সম্মুখে প্রাচীন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে *। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অভ্রান্ত

* আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ শুধু যে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে মিলনের প্রকৃষ্ট সেতু-স্বরূপ ছিলেন তা নয়, তিনি ভারতের অতীত ও বর্তমানের মধ্যেও সেতুর মতো এবং ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শক ছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতাও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে তিনি অনেক কথাই বলেছেন। সমগ্র বিশ্বে সাম্য ও মৈত্রী স্থাপনের জন্য ভারতীয় সংস্কৃতি প্রকৃষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে, তাও তিনি করেছেন

দৃষ্টির সামনে ভবিষ্যতে বিশ্বমানবতার নবদিগন্ত প্রতিভাত হ'ল। তাঁর অন্তরে সেই সনাতন বৈদিক ভারত—পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ও কিংবদন্তীর মহিমামণ্ডিত অগণিত দেবদেবীর ভারত—সেই দ্রাবিড় আর্য ও বিভিন্ন সভ্যতার মিলন-ভূমি—সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা ছিল যে সভ্যতার মর্মবাণী—সেই আর্য ভারত, এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ হ'তে যে দেশ জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল দেশের, সকল ধর্মের লোককেই নিজের বুকে অভয়-আশ্রয় দিয়েছে—বিশ্বমানবতার জন্মভূমি সেই ভারত যেন জাগ্রত হয়ে উঠল।

ঘোষণা। সে জন্য ভারতীয় সংস্কৃতির বিশুদ্ধিরক্ষা প্রথম প্রয়োজন। তাঁর বাণী : "সাংস্কৃতিক জীবনে পূর্ণতা বিধানের জন্য আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী আমাদের বেড়ে উঠতে হ'বে। আমাদের দেশে বিদেশী সমাজের প্রবর্তিত কর্মপন্থা অনুসরণ করা নিষ্ফল, বস্তুতঃ তা অসম্ভব।...

আমরা পাশ্চাত্য বনতে পারিনে, কাজেই পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণ করা আমাদের পক্ষে নিরর্থক।...ভারতে আমাদের অগ্রগতির পথে দু'টি বিরাট বাধা—প্রাচীন গোড়ামী ও বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার উভয় সঙ্কট। এ দু'য়ের মধ্যে আমি ইউরোপীয় জীবনধারার পরিবর্তে সনাতন গোড়ামিরই পক্ষপাতী। প্রাচীনপন্থী অন্ধবিশ্বাসী মানুষ কুসংস্কারাপন্ন ও স্থূলবুদ্ধি হ'তে পারে, কিন্তু তার মনুষত্ব আছে, বিশ্বাস আছে, আত্মশক্তি আছে—নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। অপর দিকে, ইউরোপীয় ছাঁচে গড়া মানুষটি কিন্তু মেরুদণ্ডহীন।...এই উভয়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রথম ব্যক্তিই বরণীয়, কারণ তাহারই উন্নতির সম্ভাবনা আছে। জাতীয় সংস্কৃতিতে তার আস্থা আছে, তা অবলম্বন ক'রে সে বাঁচতে পারবে। অপর ব্যক্তির কিন্তু বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আধ্যাত্মিকতা বিসর্জন দিয়ে যদি তোমরা জড়াশ্রয়ী পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে অগ্রসর হও, তা হ'লে তিন পুরুষ পরে এই জাতির লোপ অনিবার্য। এর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে, জাতীয় সৌধের বনিবাদ ধ্বসে পড়বে, ফলে সামগ্রিক ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।''...সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের জন্য তিনি বলেছেন, "ভারতের বাইরের জগৎ বাদ দিয়ে আমরা চলতে পারি না, অথচ আমরা এতকাল নির্বোধের মত ভেবেছি যে, তা পারা যায়। আমাদের—হাজার বৎসরের দাসত্ব এই নির্বুদ্ধিতারই দণ্ড। এ দণ্ড আমরা ভোগ করেছি, আর যেন তা করতে না হয়। ভারতবাসী ভারতের বাইরে যাবে না, এ প্রকার মূঢ় ধারণা নিতান্ত ছেলেমানুষি। তোমরা যতই ভারতের বাইরে গিয়ে পৃথিবীর জাতিপুঞ্জের সঙ্গে মেলামেশা করবে, ততই তোমাদের ও দেশের পক্ষে মঙ্গল।...ভারতের উন্নতির পক্ষে বহু বিঘ্নের অন্যতম আমাদের এই উৎকট ধারণা যে, পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ জাতি।...মনে রেখো যে, প্রত্যেক জাতির কাছে শিক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। তাই আমাদের সকল জাতির কাছেই শিক্ষা গ্রহণ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হ'বে। আমাদের শ্রেষ্ঠ বিধান দাতা মনু বলেছেন—'উৎকৃষ্ট জ্ঞান, এমন কি হীনজন্মা ব্যক্তির নিকট হ'তেও

স্বামীজী গুরুভাইদের তাঁর ভাবধারার ভাগী করলেন। সকলেই ঐ ভাবধারা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন কিনা, তা জানা নেই। স্বামীজীকে আমরা দেখতে পাই—বরাহনগরে ফিরে সাধন ভজনের দিকে তিনি যেমন জোর দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বেদান্তভাষ্যাদি ও অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি ব্যাকরণ মন দিয়ে পড়তে লাগলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনরূপ ভাষ্যের আলোতে সব শাস্ত্রের মর্মোদ্ঘাটনে হ'লেন প্রবৃত্ত। গুরুভাইদের নিয়েও সে সব আলোচনা হ'ত। কিন্তু রামকৃষ্ণের চিন্তাধারাকে সক্রিয় করতে তাঁর বহু বৎসর লেগেছিল; এবং বহু সংঘাত ও সংঘর্ষের প্রয়োজন হয়েছিল।...

ঐ সময় দু'টি বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব বিবেকানন্দের অন্তরকে আলোড়িত করছিল। একটি ছিল ভগবান লাভের প্রকৃতিগত প্রবল ইচ্ছা—পার্থিব সব কিছু বিসর্জন দিয়ে আত্মানন্দে ডুবে থাকা। অন্যটি হল 'জগদ্ধিতায় কর্ম'—যে বিশেষ কাজের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে এনেছিলেন। যদিও নিজের মুক্তির কথা ছেড়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আজ্ঞা-পালনে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তথাপি

অর্জন করতে হ'বে।' অতএব মনুর যথার্থ বংশধরের মতো আমরা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ঐহিক বা পারত্রিক বিষয়ে জাতি নির্বিশেষে যে-কোন উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকব।"...

ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁর নির্দেশ: "আমাদের জাতির প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও তেজোদ্দীপ্ত করবার একমাত্র পন্থা ভারতীয় ভাবধারার মাধ্যমে পৃথিবী বিজয়।...এই প্রসঙ্গে এও ভুললে চলবে না যে, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জগৎ জয় করা ব'লতে আমি জীবনপ্রদ তত্ত্বগুলির প্রচার বুঝি।...যে দিন ধর্মের ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য দেশবাসীর হস্তে সমর্পণ ক'রে এই দেশবাসী তাদের পাদমূলে ধর্ম শিখতে বসবে, সে দিন অধঃপতিত ভারতবাসীর জাতীয় বৈশিষ্ট চিরকালের মতো লুপ্ত হবে।...আমার বিশ্বাস, এই ধর্মানুশীলন এবং বেদান্তের ব্যাপক প্রচারের দ্বারা এই দেশ এবং পাশ্চাত্য ভূখণ্ড উভয়ই প্রচুর লাভবান হ'বে।"...

স্বামীজী নিজের জীবনে এ কার্যের শুভ সূচনা করে গিয়েছেন।

সচেতনভাবে না হলেও, তাঁর অবচেতন মনে ভগবান লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে কম ব্যাকুল করেনি। তাই দেখা যায়, বিবেকানন্দ জগতের কোলাহল থেকে দূরে—হিমালয়ের নীরবতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবার জন্য বারংবার চেষ্টা করছেন ; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অলক্ষ্য হস্ত তাঁকে নির্মমভাবে টেনে নামিয়ে আনছে। যতবার তিনি আত্মানুভূতির জন্য গিয়েছিলেন হিমালয়ে, ততবারই কঠিন রোগাক্রান্ত হ'য়ে বা অন্য কারণে তাঁকে নেবে আসতে হয়েছিল। তা আমরা পরে দেখতে পাব তাঁর পরিব্রাজক জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে।...

বরাহনগর মঠে ফি'রে আসার পরে তাঁর মানসিক অবস্থার একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাই তাঁর ১৮৮৯, ৪ঠা জুলাইর পত্রে, "...ঈশ্বরের মঙ্গল হস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে—শাস্ত্রে বিশ্বাসও আমার টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় গত ৫।৭ বৎসর আমার জীবন ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্ন-বাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মানুষ চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছিনা, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট। বিশেষ করিয়া কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবার কোন উপায়ও দেখিনা।...(পারিবারিক) দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকার-স্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে।"...

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে ভুলিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর চিন্তাজগতে আমূল পরিবর্তন আনার জন্য তাঁকে শারীরিক মানসিক ও জাগতিক দুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণই গ'ড়ে তুলেছিলেন বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দকে। *

---

* ঐ ঘটনাটির সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ পরবর্তিকালে কর্মযোগিন পত্রিকায় ১৯০৯ খৃঃ লিখেছিলেন, "যিনি পূর্ণ যুগপ্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিস্বরূপ, তিনি ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই- একথা আমরা বিশ্বাস করি না।...তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে নিজের

স্বামীজী ছিলেন শক্তির মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর অন্তরে বাস করত একটি জাগ্রত পুরুষ-সিংহ। নিষ্ক্রিয়তার উপর তাঁর একটা প্রচণ্ড ঘৃণা ছিল। ভারতের জাতীয় জীবনে বর্তমান অবনতির জন্য কর্মবিমুখতাকেই তিনি দায়ী করতেন। তাই ভারতের প্রতি তাঁর বাণী ছিল। "...সর্বোপরি শক্তিশালী হও। পৌরুষ লাভ কর।"

স্বামীজী বরাহনগরে গুরুভাইদেরও সেই ভাবে গ'ড়ে তুলবার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। ধ্যান-ভজনের সঙ্গে সেবামূলক কর্ম ও স্বাধ্যায়ের মিলন ক'রে নূতন সন্ন্যাসিসঙ্ঘ তিনি সৃজন করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ অন্তরের নিভৃতে বিবেকের আহ্বান শুনতে পেতেন। তিনি জেনেছিলেন যে, বিশ্বআলোড়নকারী বিরাট কর্তব্য তাঁর প্রতীক্ষা করছে। তাঁর চিন্তার মধ্যে ভে'সে উঠত নবযুগের উন্মাদনা, পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী বুভুক্ষা ও তার ফলস্বরূপ দুঃখবেদনা, চতুর্দিক হ'তে উত্থিত নির্যাতিত মানবতার নীরব আবেদন, এবং ভারতের অতীতকালের অভ্যুদয় ও ভবিষ্যতের সমুত্থান ও শক্তির সমারোহ। সেই পুনরভ্যুত্থান হ'বে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে। ভারতকে বাঁচতে হ'বে সর্বজনীন কল্যাণের জন্য। সমগ্র বিশ্বের আধ্যাত্মিক ভাবধারা পুনরুদ্দীপিত করার সঙ্গে ভারতের কল্যাণ যে বিজড়িত। বিশ্বের জন্য ভারতকে বাঁচতে হ'বে। কিন্তু সেটা কি ভাবে ঘটবে তা তিনি তখনো পুরাপুরি জানেননি। ঈশ্বরের নির্দেশের জন্য তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।...

সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ।... স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম তাঁহার পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন যে, তাঁহার ভিতর যে শক্তিসঞ্চার করিয়া যাইতেছেন, কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্যকিরণজালে আবৃত হইবে।"

স্বামীজী আবার কিছু দিনের জন্য বৈদ্যনাথ গাজীপুর কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান দর্শনের উদ্দেশ্যে বে'র হ'লেন। কিন্তু তাঁকে প্রতি পদে বাধা পেতে হ'ল। একটা অজ্ঞাত শক্তি যেন তাঁর পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল। গাজীপুরে অবস্থান-কালে ভক্তপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের কঠিন অসুখের সংবাদ পেয়ে তিনি কলিকাতা যাবার পূর্বে কাশীতে এলেন, এবং প্রমদাদাস মিত্রের সঙ্গে থাকাকালে ঠাকুরের পরমভক্ত বলরাম বাবুর সংকটাপন্ন অসুখের খবর পেয়ে তিনি অবিলম্বে কলিকাতায় ফি'রে এলেন। বলরাম বাবুর অসুস্থতার সংবাদে স্বামীজীকে বিশেষ কাতর দেখে প্রমদাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এত শোকাকুল হওয়া কি উচিত?"

স্বামীজী জবাব দিলেন, "বলেন কি? সন্ন্যাসী হয়েছি ব'লে কি হৃদয়টা বিসর্জন দিয়েছি? প্রকৃত সন্ন্যাসীর হৃদয় সাধারণ লোকের হৃদয় অপেক্ষা বরং আরো বেশী কোমল হওয়া উচিত। হাজার হো'ক আমরা মানুষ তো বটে? তা ছাড়া তিনি যে আমার গুরুভাই। আমরা এক গুরুর চরণতলে বসে শিক্ষালাভ করেছি! যে সন্ন্যাস হৃদয় পাষাণ ক'রতে উপদেশ দেয়, সে-সন্ন্যাস আমি গ্রাহ্য করিনে!" সন্ন্যাসীর প্রাণ যে কুসুমের অপেক্ষাও কোমল!

স্বামীজী অবিলম্বে কলিকাতায় এলেন। মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত বলরাম বাবু স্বামীজীকে পেয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা ভু'লে গেলেন। ডুবে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিন্তাতে। তাঁর চিত্ত এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেল। তিনি স্বামীজীকে কাছছাড়া করতে চান না। ঠাকুর আর স্বামীজী যে অভিন্ন! শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ক'রতে ক'রতে বলরাম বাবু মহাপ্রয়াণ করলেন ১৩ই মে, ১৮৯০। এ'র কয়েক দিন পরেই ২০শে মে, সুরেন্দ্রনাথ মিত্রও শ্রীগুরুপদে মিলিত হ'লেন।

সুরেন্দ্রনাথ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম রসদদার ছিলেন। এঁকে যন্ত্র করেই—বরাহনগর মঠ স্থাপিত হয়। এবং প্রধানতঃ এঁর আনুকূল্যেই মঠের

ব্যয় কোন প্রকারে নির্বাহ হ'ত। সুরেন্দ্রনাথের অসুস্থতার সময় হ'তেই মঠবাসীদের জীবন অধিকতর কৃচ্ছ্রতার মধ্যে চলছিল। পর পর দু'জন বিশিষ্ট ভক্তের দেহত্যাগে মঠের তখন শোচনীয় অবস্থা।

কিন্তু স্বামীজী কিছুতেই দমবার পাত্র ছিলেন না। নানাভাবে চেষ্টা ক'রে মঠের চরম দারিদ্র্যের একটু উন্নতি করলেন। ঐ দারুণ অভাবের সময় মঠের সন্ন্যাসীদের প্রাণে বৈরাগ্য ও তপস্যার ভাব আরো তীব্র হ'ল। শ্রীভগবানের উপর নির্ভরতায় তাঁদের মন ভরপুর। একদিন সংকল্প করলেন—আজ কেউ ভিক্ষায় যা'ব না। যাঁর নামে ঘর-দোর ছেড়েছি, দেখব তিনি খেতে দেন কিনা। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে সকলেই ধ্যানে বসলেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত ধ্যান। তারপর আরম্ভ হ'ল কীর্তন। সংকীর্তন ভাবাবেশ তাণ্ডব নৃত্য—চলল অনেক রাত পর্য্যন্ত। সকলেই উপবাসী। ভগবদানন্দে বিভোর।

অধিক রাত্রে কে যেন দরজার কড়া নাড়ছে। দরজা খুলে দেখা গেল ৺গোপালের মন্দির থেকে প্রচুর প্রসাদ এসেছে। স্বামীজী সোল্লাসে রামকৃষ্ণানন্দকে বললেন, "নে, ঠাকুরের ভোগ লাগা।" ভোগ নিবেদন ক'রে সকলে আনন্দে ভগবানের দয়ার কথা আলোচনা করতে করতে প্রসাদ পেলেন। শুধু একদিন নয়, বহুদিন এমন হয়েছে। তাঁরা ধ্যান-জপ-ভজন-কীর্তন-শাস্ত্রালোচনাতে মেতে থাকতেন, ভিক্ষায় বে'র হ'তেন না। কিন্তু তাঁদের অভুক্ত থাকতে হয়নি একদিনও। কোন দিন দেবালয় থেকে, কোন-দিন বা অযাচিতভাবে ভক্তগৃহ হ'তে তাঁদের খাবার এসে যেত। এতে তাঁদের বিশ্বাস ও ভগবানের উপর নির্ভরতা আরো বে'ড়ে গেল। সুরেন্দ্রনাথ ও বলরাম বাবু মারা গিয়েছেন—তাতে কি? যদি ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠ হ'য়ে থাকে তো—তা থাকবে। হ'লও তাই। স্বামীজীর চেষ্টায় মঠের স্থায়িত্ব ক্রমেই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আশা ও আনন্দে সকলের প্রাণ ভ'রে গেল।...

দশ

হিমালয়ের ডাক স্বামীজীর মনকে পাগল ক'রে তুলেছিল। এবার কিন্তু শুধু তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা নয়। তিনি নিজেকে মানব-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, জাগতিক সকল দায়িত্ব হ'তে মুক্ত হ'য়ে হিমালয়ের নির্জনতার মধ্যে আত্মানন্দে ডু'বে থাকতে চান। অন্তরে একটা প্রচণ্ড শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠছে, তাও তিনি অনুভব করলেন। মঠত্যাগের প্রাক্কালে তিনি সন্ন্যাসী ভ্রাতাদের ব'লেছিলেন, "স্পর্শমাত্র লোককে বদলে ফেলতে পারার ক্ষমতা লাভ না ক'রে এবার আর ফিরছি না।"

শ্রীরামকৃষ্ণস্মৃতিপূত বরাহনগর মঠ ত্যাগ ক'রে তিনি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বে'র হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু এই দীর্ঘ যাত্রার প্রাক্কালে তিনি শ্রীসারদা দেবীর * আশীর্বাদ নিতে গেলেন—বেলুড় গ্রামের অন্তর্গত ঘুযুড়ি নামক স্থানে। শ্রীমা তপস্যা ও নির্জনবাসের জন্য তথায় অবস্থান করছিলেন।

* শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-সঙ্ঘের নিকট তিনি 'শ্রীমা' বা শুধু 'মা' নামে পরিচিতা। স্বামীজী শ্রীমা'কে ঠাকুরের মতোই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। যেন আরো বেশী গভীরতা ছিল সেই শ্রদ্ধার মধ্যে। তিনি শুধু 'গুরু-পত্নী' ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন ছিলেন নরদেহে ভগবান, শ্রীমাও ছিলেন নরদেহে ভগবতী। স্বামীজী শ্রীমায়ের আশীর্বাদের খুব মূল্য দিতেন। আমেরিকা থেকে ১৮৯৪ খৃঃ তিনি তাঁর গুরুভ্রাতা শিবানন্দকে লিখেছিলেন, "...মা ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পারনি। এখনো কেউ পার না। ক্রমে পারবে।...দাদা ; রাগ করো না, তোমরা এখনো কেউ মা'কে বোঝনি। মায়ের কৃপা আমার কাছে বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড় !...দাদা মাফ্ করবে! দুটা খোলা কথা ব'লে ফেললুম। ঐ মায়ের দিকে আমি একটু গোঁড়া।...তারক ভায়া, আমেরিকা আসার আগে মা'কে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন। অমনি হুপ্ করে পগার পার। এই বুঝ।...বাবুরামের মায়ের বুড়ো বয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জেন্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গাপূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন। দাদা, জেন্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম।" স্বামী প্রেমানন্দের মাতা প্রতিমায় দুর্গাদেবীর আরাধনার আয়োজন ক'রে শ্রীমা'কে ঐ পূজায় উপস্থিত থাকার জন্য হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে আমন্ত্রণ করেছিলেন—ঐ ঘটনার উল্লেখ ক'রে স্বামীজী চিঠিতে স্বামী শিবানন্দকে এ কথাটি লিখেছিলেন।

প্রণত হ'য়ে স্বামীজী বললেন, "মা, আমি তীর্থ-পর্যটনে হিমালয়ে যাচ্ছি। মাগো, যে পর্যন্ত আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হই, ততদিন আর ফিরছি না।"

শ্রীমা বললেন, "বাবা, সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি, তুমি সিদ্ধকাম হ'য়ে ফিরে এসো। তোমার ভিতরই যে ঠাকুর বাস ক'রছেন।"

শ্রীমায়ের আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ ক'রে অমিত বলে বলীয়ান স্বামীজী বে'র হ'লেন বরাহনগর মঠ থেকে। তাঁর পথপ্রদর্শকরূপে চলেছেন হিমালয় ও তিব্বতের পথঘাট সম্বন্ধে অভিজ্ঞ গঙ্গাধর (অখণ্ডানন্দ)। স্বামীজী বেরিয়েছেন অমরজীবনের আস্বাদনে—অব্যক্তকে অন্তরে প্রকাশিত করতে। সমগ্র ভারতের এই তীর্থযাত্রার ভিতরেই যেন বিবেকানন্দের নবজন্ম লাভ হ'ল।* ভারতের পবিত্র ধূলিকণার মধ্যে জাত এই বিবেকানন্দকেই ভারতবাসী পেয়েছিল, বিশ্ববাসী বরণ ক'রে নিয়েছিল।

প্রথমে ভাগলপুর বৈদ্যনাথ ও কাশী। সেই তরুণ ভাস্কর কোথাও আত্মগোপন করতে পারলেন না। সর্বত্রই তিনি ধরা প'ড়ে গেলেন। যে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে সে-ই তাঁর ভিতর মহাশক্তির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছে। তিনি শুধু ছিন্নবাস-পরিহিত মুণ্ডিত-মস্তক শ্রমণ ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যে প্রতিভার অনল তাঁর চোখে জ্বলত, তা তিনি কিছুতেই গোপন করতে পারলেন না।...

কাশীতে প্রমদাদাস মিত্র মহাশয় সাদরে স্বামীজীকে গ্রহণ করলেন।

* বিবেকানন্দের প্রতি শ্রীঅরবিন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে গিয়ে বলেছেন, "শক্তিধর পুরুষ বলিতে যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ পুরুষ সিংহ। আমরা অনুভব করি, বিবেকানন্দের শক্তি ও প্রভাব প্রচণ্ড ভাবে কাজ করিতেছে।...(তাঁহার জীবনের) যাহা কিছু মহৎ, সিংহসদৃশ বীর্যসম্পন্ন অথচ কমনীয়, স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি দ্বারা লব্ধ ও উজ্জীবক—তাহা ভারতের আত্মায় প্রবেশ করিয়াছে। আমরা বলি, ঐ দেখ! বিবেকানন্দ ভারতমাতা ও তাঁহার সন্তানদের অন্তরাত্মায় এখনো বাস করিতেছেন।" উদ্বোধন—১৩৬৫ চৈত্র সংখ্যা

পাণ্ডিত্য শাস্ত্রজ্ঞান ও পদমর্যাদায় তিনি সমগ্র উত্তর প্রদেশে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। প্রমদা বাবুর সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপে স্বামীজী বিশেষ আনন্দিত হ'লেন। অন্তরের শক্তির উত্তেজনায় একদিন একটি কঠোর উক্তি স্বামীজীর মুখ থেকে বে'র হয়েছিল, "আমি যাচ্ছি। কিন্তু যতদিন না সমাজের উপর বোমার মতো ফেটে পড়তে পারি, যতদিন সমাজকে অনুগত ভৃত্যের মতো আমার অনুসরণ করাতে না পারি, ততদিন আমি ফিরব না।"—এটি স্বামীজীর দাম্ভিক উক্তি নয়। তাঁর ভিতর যে ঋষি বাস করতেন—তাঁরই কল্যাণবাণী।

অযোধ্যা হ'য়ে গঙ্গাধরের সঙ্গে তিনি চলেছেন হিমালয়ের দিকে, কাঠ-গোদাম হ'তে নৈনীতাল ও আলমোড়ার পথে। সঙ্গে একটি পয়সাও নেই। কোথায় আহার, কোথায় রাত্রিবাস কিছুরই স্থিরতা নেই—দু'জনেই চলেছেন অসীমের যাত্রাপথে। তিন-চারদিন ভ্রমণের পরে শ্রান্ত দেহে স্বামীজী এক প্রকাণ্ড গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছেন। পাশেই বেগবতী পার্বত্যনদী। নদীজলে স্নান ক'রে বৃক্ষতলে ধ্যানে বসলেন স্বামীজী। গভীর ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে গেলেন। ধ্যানভঙ্গের পর বললেন, "গঙ্গাধর, আজ এই বৃক্ষমূলে আমার জীবনের একটা অমূল্য ক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল—তাতে একটা মস্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে।"

আর কিছুই বললেন না, তিনি। কিন্তু তাঁর মুখে নেমে এসেছিল স্বর্গীয় আভা—ব্রহ্মানন্দের দীপ্তি! অখণ্ডানন্দ পরে স্বামীজীর নোট বই খুলে দেখেছিলেন তাতে লেখা আছে, "আমি আজ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের একাত্মতা অনুভব করেছি। বিশ্বের যা' কিছু, সব এই ক্ষুদ্র দেহ-মধ্যে আছে। দেখলাম প্রতি পরমাণুর মধ্যে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান।"*

* স্বামীজীর নোটবুকে ঐ অনুভূতি-প্রসঙ্গে আরো যা লেখা ছিল, তার অনুবাদ: "আদিতে শব্দ (শব্দব্রহ্ম বা নাদ) মাত্র ছিল।…ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড (microcosm) ও বিরাট ব্রহ্মাণ্ড (macrocosm) একই নিয়মে রচিত। এই শরীর মধ্যে যে ব্যষ্টি জীবাত্মা আচ্ছাদিত, সেরূপ এই দৃশ্যমান জগতে জড়া

বিবেকানন্দের জীবনে এ ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সবই ব্রহ্মের প্রকাশ, ঈশ্বরের অংশ—এই অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েই তিনি বিশ্বের অগণিত নরনারীর সেবা করেছিলেন—শিবজ্ঞানে এবং বলতে পেরেছিলেন :

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম ক'রে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ॥"

প্রাণীমাত্রের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। তাঁর ব্রহ্মদৃষ্টি শুধু মানুষে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর করুণা ছিল সকল জীবের প্রতি। তাই তিনি 'জীবে প্রেমে'র মন্ত্র শুনিয়েছিলেন।...

আলমোড়ার পথে একস্থানে তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণায় মূর্ছিত হ'য়ে পথের ধারে প'ড়ে গেলেন। অখণ্ডানন্দ ভীত ও নিরুপায়। তিনি ছুটে গেলেন জলের সন্ধানে। দৈবক্রমে একজন মুসলমান ফকির ঐ পথে যাচ্ছিলেন। স্বামীজীর মূর্ছার কারণ জানতে পেরে তিনি নিকটস্থ কবর স্থান, তাঁর পর্ণকুটীর থেকে তাড়াতাড়ি একটি শশা এনে তাঁকে খেতে দিলেন। তাতেই সেদিন স্বামীজীর প্রাণরক্ষা হ'য়েছিল। ঐ ঘটনার উল্লেখ ক'রে তিনি বলেছিলেন, "লোকটি বাস্তবিকই সেদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল।...ক্ষুধায় এতটা কাতর আর কখনো হইনি ..."

হিমালয়ভ্রমণের প্রথম অংশটি তিনি খুবই উপভোগ করেছিলেন। দীর্ঘ পথশ্রম ও অনাহারের মধ্যেও চিরতুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী হিমালয়ের শান্ত ভাবগাম্ভীর্য তাঁর প্রাণে অপূর্ব আনন্দ ও শান্তি দিত।

প্রকৃতিদ্বারা সমষ্টি আত্মা (হিরণ্যগর্ভ) আচ্ছাদিত। শিব শিবাকে আলিঙ্গন ক'রে আছে তা. কল্পনা মাত্র নয়। শব্দ ও তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের মধ্যে যে অভেদসম্বন্ধ সেই সম্বন্ধই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিত। তত্ত্বতঃ একই বস্তু, কেবল বুদ্ধির ভেদে পার্থক্য অনুভূত হয়। শব্দ ব্যতীত চিন্তা অসম্ভব। অতএব আদিতে শব্দমাত্রই ছিল, ইহা সত্য। একই পরমাত্মার এ দু'ভাবে অনুভূতি চিরকালই বর্তমান। অতএব আমরা যা কিছু অনুভব করি, তা অনাদি সাকার ও নিত্য নিরাকারেই মিলিত জ্ঞান।"

আলমোড়ার সব কিছুই জানা ছিল অখণ্ডানন্দের। অম্বাদত্তের বাগান-বাটীতে সাধুসন্তদের জন্য দরাজ ব্যবস্থা। দু'জনেই গিয়ে উঠলেন সেখানে। সারদানন্দ ও কৃপানন্দ আগে থেকেই আলমোড়ায় ছিলেন। খবর পেয়ে তাঁরাও এসে জুটলেন।

বদ্রীশা ঠুল ঘরিয়া আলমোড়ার একজন বিশিষ্ট লোক। কয়েক বৎসর পূর্বে স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। স্বামীজীর আগমনবার্তা শু'নেই তাঁকে—বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য এলেন। সারদানন্দ ও কৃপানন্দও তাঁর বাড়ীতে থেকেই ভজন-সাধন করছিলেন। স্বামীজীকেও যেতে হ'ল সেখানে। চারজন গুরুভ্রাতা একত্রে সাধন-ভজন ও শাস্ত্রালোচনায় কিছুদিন বেশ আনন্দে আছেন, এমন সময় হঠাৎ কলিকাতা থেকে তারযোগে স্বামীজীর ছোট বোনের আত্মহত্যার সংবাদ এল। বাণবিদ্ধ পক্ষীর মতো তিনি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন। পরে চিঠিতে বোনের শোচনীয় মৃত্যুর বিস্তারিত খবর পে'য়ে স্বামীজীর দুঃখের আর অবধি ছিল না।

তিনি যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে উঠলেন। ছোট রোনের মৃত্যু বলে নয়, ঐ বোনটির জীবন হৃদয়হীন হিন্দুসমাজের বেদীমূলে অকালে বলি প্রদত্ত হয়েছিল। ভগ্নীর শোকাবহ মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করতেই তাঁর মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল হিন্দুসমাজের প্রতি। মনে পড়ল হিন্দুরমণীদের দুর্ভাগ্যের কথা। আহা, কত অসহায় তারা! সকল অধিকার হ'তে বঞ্চিত, নিপীড়িত দলিত! তাদের জীবনে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই—শুধু সন্তান-পোষণের যন্ত্র মাত্র! সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র পদদলিত, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর দুর্দশার যে ছবি তিনি দেখেছেন ভ্রমণের সময়ে, সে দৃশ্যগুলিও উঁকি মারল তাঁর মনের মধ্যে। আরো শত জাতীয় সমস্যাও জাগল তাঁর মনে। তিনি যেন উন্মত্ত

হ'য়ে গেলেন। নির্লিপ্ত দ্রষ্টার মতো দেখা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি প্রতিকার-চিন্তা করতে লাগলেন। * সমাধিস্থ হ'য়ে থাকার চিন্তাটা যেন সে সময়ের জন্য চাপা পড়ে গেল তাঁর মনের এক নিভৃত কোণে।...

স্ত্রীজাতির উন্নতি না হ'লে জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব। তাই তো সারদা-দেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা, ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে গুরুরূপে গ্রহণ এবং বর্তমান যুগের কল্যাণের জন্য তাঁর মাতৃভাব-প্রচার।

* * *

আলমোড়াতে আর মন টিকল না। বিশেষ, বাড়ির লোকেরা সন্ধান

---

* ভারতে নারী জাতির উন্নতি জাতীয় জীবনের উন্নতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে বিষয়ে স্বামীজী বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছেন। "...তোমাদের স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পার কি? তবেই তোমাদের কল্যাণের আশা আছে! জননীগণ উন্নত হ'লে তাঁদের কৃতী সন্তানবর্গের মহৎ কীর্তি দেশের মুখোজ্জ্বল করতে পারবে। এবং তখনই দেশে ঘটবে সংস্কৃতি পরাক্রম জ্ঞান ও ভক্তির পুনরভ্যুত্থান।...মনু বলেছেন—'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'—নারী যেখানে পূজিত হন, সেখানেই দেবতারা প্রসন্ন হ'ন। আর যেখানে তার ব্যতিক্রম ঘটে, সেখানে মানুষের সকল কর্ম ও চেষ্টাই নিষ্ফল হ'য়ে যায়।.. নারীর প্রতি ন্যায্য সম্মান দিয়েই সব জাতি বড় হয়েছে।.. তোমাদের জাতির যে এত অধোগতি, তার প্রধান কারণ—শক্তির এই জীবন্ত মূর্তিগুলিকে তোমরা যথার্থ মর্যাদা দাওনি।...বহু স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন ক'রে পুরুষেরা নারীদের বিধি-নিষেধের কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধে শুধু সন্তানপ্রসবের যন্ত্রস্বরূপ করেছে। তারা কত অসহায়...কত পরমুখাপেক্ষী।

...বৈদিক বা উপনিষদের যুগে দেখতে পাওয়া যায় মৈত্রেয়ী গার্গী প্রভৃতি পুণ্যশ্লোকা নারী ব্রহ্মবাদিনী হ'য়ে ঋষির স্থান লাভ করেছেন।...প্রাচীনকালে নারীদের জ্ঞানলাভের অধিকার ছিল। বর্তমান যুগে সে অধিকার থেকে তারা কেন বঞ্চিত থাকবে?...

অবনতির যুগে যখন পুরোহিতকুল ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে বেদপাঠের অনধিকারী বলে নির্দেশ দিলেন, সেই সময় তাঁরা স্ত্রীলোকদেরও সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন।...অগ্নিহোত্রের মত বৈদিক কর্মেও গৃহস্থের সহধর্মিনীর প্রয়োজন ছিল; অথচ পৌরাণিক যুগে প্রচলিত শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি গৃহদেবতাকেও স্পর্শ করবার অধিকার স্ত্রীলোকের নেই।.. আর্য ও সেমিটিক্ জাতির দৃষ্টি ভঙ্গিতে নারীর আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত। সেমিটিক্ মতে নারীর সাহচর্য ঈশ্বর-ভক্তির পক্ষে অনিষ্টকর। তাই কোন প্রকার ধর্মানুষ্ঠানে নারীর অধিকার নেই। আর্যমতে কিন্তু স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোন প্রকার ধর্মানুষ্ঠানই পূর্ণাঙ্গ হয় না।...এক পক্ষ পক্ষীর উড্ডয়ন যেমন অসম্ভব, তেমনি নারীকে বাদ দিয়ে কোন জাতই উঠতে পারে না—কোন সমাজই উন্নত হ'তে পারে না।.. দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়গণ সুসভ্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে নারীর স্থান উচ্চে ছিল।..."

পেয়েছে! তিনি বেরিয়ে পড়লেন গাড়োয়ালের পথে। সঙ্গে তিনজন গুরুভ্রাতা। কর্ণপ্রয়াগ অতিক্রম ক'রে চলেছেন, এমন সময় এক চটিতে অখণ্ডানন্দ হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন—তিন দিন অপেক্ষা করতে হ'ল। তিনি একটু সুস্থবোধ করতেই সকলেই এগিয়ে চললেন পথের ডাকে। সে বার পার্বত্য অঞ্চলে সর্বত্র ভীষণ দুর্ভিক্ষ। পাহাড়ীরা গাছের পাতা শিকড় খেতে আরম্ভ করেছে। সরকার যাত্রীদের জন্য যাত্রাপথ বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। স্বামীজী কেদার-বদরী দর্শনের আশা ত্যাগ ক'রে চললেন রুদ্রপ্রয়াগের দিকে। চারিদিকে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যসম্ভার ও বিরাট স্তব্ধতা। মাঝে মঝে গিরি-নির্ঝরিণীর কলহাস্য মধুর সঙ্গীতের মতো ভেসে আসে। চিরতুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ ও হিমালয়ের অনুপম রূপবৈভব স্বামীজীর বাল্যের স্বপ্ন, জীবনের সুখবিলাস। তিনি বিরাটের ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে যান।...

রুদ্রপ্রয়াগের পরেই হাড় কাঁপিয়ে স্বামীজীর জ্বর এল। অখণ্ডানন্দও জ্বরে পড়লেন। অগত্যা এক ধর্মশালাতে সকলে আশ্রয় নিলেন। দৈবক্রমে সরকারী সদর আমিন নিকটেই তাঁবু ফেলেছিলেন। সারদানন্দ স্বামীজীর অসুস্থতার কথা জানাতেই তিনি কিছু কবিরাজী ঔষধ দিলেন। তাতেই দু'জনের জ্বর বন্ধ হ'ল। সদর-আমিন স্বামীজীদের সঙ্গে আলাপ ক'রে বিশেষ প্রীত হ'ন। তিনি ডাণ্ডী ক'রে তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন অলকানন্দার তীরে শ্রীনগরে। একটু সুস্থ হ'তেই সকলে ধ্যান ভজনে ডুবে গেলেন ; অবকাশ সময়ে চলত উপনিষদ পাঠ ও আলোচনা।

কয়েকদিন পরে স্বামীজী গুরুভাইদের নিয়ে টিহিরি অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। পার্বত্য অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ। কোথাও ভিক্ষা পাওয়া দুষ্কর হ'য়ে উঠল। অনাহারে অর্ধমৃতপ্রায় অবস্থায় সকলে ধীরে ধীরে গাড়োয়ালের রাজধানী টিহিরিতে পৌঁছলেন। একটি অনুকূল কুটিয়াতে আশ্রয় নিলেন সকলে।

সামান্য ভিক্ষায় যা জুটতো তাতেই তৃপ্ত থেকে স্বামীজী নিঃসঙ্গতার আনন্দে ডুবে থাকতেন দিনরাত। কথনো বা তিনি বেদান্ত ও আর্যঋষিদের জীবন আলোচনা করতেন। "আমাদের আর্যঋষি হ'তে হ'বে। ঋষিত্ব পদবীতে আরূঢ় হ'তে হ'বে"—বলতেন তিনি।

ঘটনাচক্রে রাজসরকারের দেওয়ান রঘুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ হয়। তিনি পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দাদা। আলাপ ক্রমে পরিণত হ'ল নিবিড় অন্তরঙ্গতায়। স্বামীজীর গভীর পাণ্ডিত্য শাস্ত্রানুভূতি ত্যাগ বৈরাগ্য দেওয়ানজীকে বিশেষ অভিভূত করেছিল। তিনি দেখলেন, ইনি তো সাধারণ সাধুদের মতো নন।...

তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে গঙ্গা ও ভিলাঙ্গনার সঙ্গমস্থল, গণেশ-প্রয়াগে এঁদের সাধনভজনের সব ব্যবস্থা ক'রে দিতে চাইলেন। যাত্রার সব ঠিক। এমন সময় অখণ্ডানন্দ পুনরায় অসুস্থ হ'লেন। টিহিরির সিভিল সার্জন রোগীর বক্ষ পরীক্ষা ক'রে বললেন, "ব্রংকাইটিস্ হ'য়েছে। পাহাড়ে থাকা আদৌ উচিত নয়। সমতল প্রদেশে চিকিৎসা করাতে হ'বে।"

গুরুভ্রাতার প্রাণ রক্ষার জন্য স্বামীজী হিমালয়ের নির্জনতা বিসর্জন দিয়ে মুসৌরী ও রাজপুর হ'য়ে এলেন দেরাদুনে। রাজপুরের পথে হঠাৎ তুরীয়ানন্দের সঙ্গে দেখা। তিনিও স্বামীজীর সঙ্গ নিলেন। রঘুনাথ ভট্টাচার্য দেরাদুনের সিভিল সার্জনের নামে একখানি পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন। অল্পক্ষণ আলাপেই সিভিল সার্জন স্বামীজীর মুখে ধর্ম দর্শন ও বাইবেলের ব্যাখ্যা শু'নে বিশেষ আনন্দিত হ'লেন।

সিভিল সার্জনের চিকিৎসাতে অখণ্ডানন্দ একটু সুস্থ হওয়ার পরে তাঁকে কৃপানন্দের সঙ্গে এলাহাবাদে এক বন্ধুর বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে স্বামীজী গুরুভাইদের নিয়ে এলেন হৃষীকেশে।...

পুরাকালের মুনিঋষি-সেবিত হৃষীকেশ। হিমালয়ের পাদদেশ বেষ্টন ক'রে নির্জন বনানী—পবিত্র গঙ্গার কলধ্বনি। ভিক্ষার উপর নির্ভর ক'রে স্বামীজী গুরুভাইদের সঙ্গে কঠোর সাধনায় ডুবে গেলেন। অবসর-সময়ে ব্রহ্মসূত্র উপনিষদ গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। রাত্রি যত গভীর হয় ধ্যানের গভীরতাও তত বে'ড়ে যায়। স্বামীজী মহানন্দে আছেন। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা। কয়েকদিন ঐভাবে কাটাবার পরেই তিনি প্রবল জরাক্রান্ত হ'লেন। অথচ নিরুপায়। কোন ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা অসম্ভব। গুরুভ্রাতারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একদিন প্রবল জ্বরের প্রকোপে স্বামীজীর সংজ্ঞা লোপ পেল। সর্বাঙ্গ শীতল—নাড়ীও বিলুপ্ত। অন্তিমকাল উপস্থিত মনে ক'রে গুরুভ্রাতারা শোকে মুহ্যমান। স্বামীজীই যে তাঁদের বলভরসা। শ্রীঠাকুরের অদর্শনের পরে তাঁকে আশ্রয় ক'রেই যে সকলে রয়েছেন। অনন্যমনে তাঁরা শ্রীভগবানের কাছে স্বামীজীর প্রাণভিক্ষা করতে লাগলেন। এমন সময় যেন দেবপ্রেরিত হ'য়ে কুটীয়ার দ্বারে একজন অজ্ঞাত সাধু উপস্থিত। তিনি সব অবস্থা শুনে তাঁর ঝুলি থেকে একটি ঔষধ বের ক'রে মধুর সঙ্গে মেড়ে স্বামীজীকে খেতে দিলেন। কোনপ্রকারে ঐ ঔষধ স্বামীজীর মুখের মধ্যে দেওয়া হ'ল। আশ্চর্য! অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁর দেহে প্রচুর ঘাম হ'তে লাগল এবং দেখা দিল প্রাণের চিহ্ন। ক্রমে তিনি চক্ষু উন্মীলন করলেন। পরে ক্ষীণ স্বরে বললেন যে, ঐ অজ্ঞান অবস্থায় তাঁর এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হ'য়েছে। তিনি জেনেছেন, তাঁর এখন মৃত্যু হ'বে না। তাঁকে শ্রীভগবানের বিশেষ কার্য সম্পাদন করতে হ'বে। তাই মৃত্যুর মুখ থেকে তিনি ফি'রে এসেছেন। ঐ ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনে গুরুভ্রাতাদের প্রাণ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হ'ল। তিনিও ধীরে ধীরে সুস্থ হ'লেন। হৃষীকেশের জলবায়ু তখন বিশেষ অস্বাস্থ্যকর। তাই স্বামীজীকে দুর্বল শরীরেই আনা হ'ল হরিদ্বারে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কনখলেই তপস্যায় রত ছিলেন। সংবাদ শুনে তিনিও স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হ'লেন।

ঐস্থান হ'তে স্বামীজী গুরুভ্রাতাদের নিয়ে এলেন সাহারানপুরে—পূর্বপরিচিত উকিল বন্ধুবাবুর বাড়ীতে।

স্বামীজীর শরীর তখনো খুবই দুর্বল। অখণ্ডানন্দ ততদিনে মীরাটে এসে বেশ সুস্থ বোধ করছিলেন। তাঁর বিশেষ আগ্রহে স্বামীজী গুরুভ্রাতাদের নিয়ে এলেন মীরাটে। স্থানীয় ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ ও যজ্ঞেশ্বরবাবু* স্বামীজীদের সাদরে স্বাগত করলেন।

মীরাটে শেঠের বাগান যেন বরাহনগর মঠে পরিণত হ'ল।

এগার

স্বামীজী তাঁর ছয়জন গুরুভ্রাতাকে (ব্রহ্মানন্দ সারদানন্দ তুরীয়ানন্দ অখণ্ডানন্দ কৃপানন্দ ও অদ্বৈতানন্দ) নিয়ে শেঠের বাগানে আছেন। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট লোক ধর্মালোচনা শুনতে প্রতিদিন তাঁর কাছে আসতেন। তিনি যে নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা চেয়েছিলেন, তার ক্রমেই অভাব হ'য়ে পড়ল। সেই সময় হ'তে তাঁর ভিতর একটা বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ দেখে তাঁর গুরুভ্রাতারা বিস্মিত হ'ন। ঐ শক্তি যেন নির্গমন-পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ধ্যান-ভজনের অবকাশে তিনি গুরুভ্রাতাদের সহিত 'মৃচ্ছকটিক' 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' 'কুমার-সম্ভব', 'মেঘদূত' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'ন এবং পুরাণাদির পাঠও চলত। স্থানীয় গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে অখণ্ডানন্দ ইতঃপূর্বেই পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি ঐ গ্রন্থাগার থেকে স্বামীজীর জন্য অনেক বই

* ইনি পরে 'ভারতধর্ম মহামণ্ডলের' প্রতিষ্ঠাতা স্বামী জ্ঞানানন্দ।

নিয়ে আসতেন। তখন স্বামীজীর অন্তরে জ্ঞানস্পৃহা এত বেড়ে গিয়েছিল যে তিনি খুব পড়তেন।

অখণ্ডানন্দের হাতে প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক স্যার জন লাবকের বই দেখে তিনি খুশী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ বই কোথা পেলি ?" "লাইব্রেরী থেকে এনেছি।"..."বেশ করেছিস" বলেই তিনি নিলেন গ্রন্থখানি। পরদিন সে বইখানি ফিরিয়ে দিয়ে—বললেন, "এখানি ফিরিয়ে দিয়ে লাবকের আর বই থাকে তো নিয়ে আসবি।"

অখণ্ডানন্দ রোজ একখানি বই নিয়ে আসেন। স্বামীজী তা প'ড়ে পরদিনই ফেরৎ দেন। এভাবে লাবকের লেখা সব বই-ই তিনি প'ড়ে ফেললেন। রোজই লাবকের একখানি বই নিয়ে যাচ্ছে, আবার পরদিনই ফেরৎ দিচ্ছে দেখে গ্রন্থাগারিকের কৌতূহল হ'ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার! রোজই বই নিয়ে যাচ্ছেন, আবার পরদিনই ফেরৎ দেন। কেন নেন এত বই ?"

অখণ্ডানন্দ বললেন সোৎসাহে, "স্বামীজীর জন্য বই নিচ্ছি। তিনি পড়েন।"

"তাও কি সম্ভব ? একদিনেই লাবকের একখানি বই প'ড়ে ফেলা !—" একটু ব্যঙ্গস্বরেই বললেন গ্রন্থাগারিক।

অখণ্ডানন্দের মুখে ঐ কথা শু'নে স্বামীজী নিজেই গেলেন লাইব্রেরীয়ানের সঙ্গে দেখা করতে। দু' এক কথার পরে তিনি বললেন—হাসতে হাসতে, 'আমি বইগুলি বেশ ভাল ক'রেই পড়েছি। ইচ্ছা হয় তো প্রশ্ন ক'রে দেখতে পারেন।"

লাইব্রেরীয়ানের কৌতূহল হ'ল। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন স্বামীজীকে। প্রত্যেক প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর শুধু নয়, লাবকের ভাষা পর্যন্ত স্বামীজী উদ্ধৃত করছেন দেখে—গ্রন্থাগারিকের আর বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না। ম্লান হ'য়ে গেল তাঁর মুখ।

স্বামীজী বললেন, "আমি ছেলেদের মতো শব্দ বা পংক্তিতে নজর দিয়ে পড়িনে। এক এক প্যারা একসঙ্গে পড়ি। এক এক পৃষ্ঠার গোড়ার ও শেষের লাইন প'ড়েই গ্রন্থকারের বক্তব্য বুঝতে পারা যায়!..."

তিন মাসের অধিককাল স্বামীজী গুরুভাইদের সঙ্গে মীরাটে ছিলেন। সে সময়ের মধ্যে গুরুভাইদের আধ্যাত্মিক জীবন যেমন সমৃদ্ধ হয়েছিল, স্থানীয় বহুলোকও তেমনি স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে ধর্মালোক লাভে ধন্য হ'ল। তাদের মধ্যে ছিল ধনী-নির্ধন পণ্ডিত-মুর্খ—সমাজের সকল স্তরের লোক।

স্বামীজী অন্তরে এক মহাশক্তির স্ফুরণ অনুভব করলেন এবং জীবনের বৃহত্তর কর্তব্য সম্বন্ধেও পেলেন ইঙ্গিত। সংকল্পে দৃঢ় হ'য়ে তিনি একদিন গুরুভাইদের ডে'কে বললেন, "আমার জীবনের ব্রত স্থির হয়েছে।...এখন থেকে আমাকে নিঃসঙ্গ হ'য়ে থাকতে হ'বে। তোমরা আমার সঙ্গ ত্যাগ কর।... গুরুভাইদের সঙ্গে থাকাও একপ্রকার মায়ার বন্ধন। সর্ববন্ধন-মুক্ত হ'য়ে আমি একলা ভ্রমণ করতে চাই।...আমার সঙ্গে থাকবেন একমাত্র ভগবান্।"...

গুরুভাইদের কোন অনুরোধই তিনি শুনলেন না। ১৮৯১ খৃঃ, জানুআরির শেষের দিকে তিনি একাকী বেরিয়ে পড়লেন। ভারতের অগণিত জনসমুদ্রের মধ্যে মিশে গেলেন তিনি। শত শত সন্ন্যাসীর মতো তিনিও কাষায়-বস্ত্র-পরিহিত একজন সন্ন্যাসী মাত্র।...

দু'বৎসর যাবৎ তিনি একাকী ভ্রমণ করতে লাগলেন। ভারতের ধূলিকণার মধ্যে তাঁর পদচিহ্ন বিলীন হয়ে গেল। কখনো গ্রামে কখনো শহরে, ধনীর গৃহে আবার দরিদ্রের কুটিরে, বৃক্ষতলে দেবদেউলে। কখনো বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সম্মানিত অতিথি—আবার অস্পৃশ্যদের ধন্য করবার জন্য তাদের সুখদুঃখের ভাগী। রাজা-মহারাজাদের প্রাসাদে গণ্যমান্য সন্ন্যাসী-গুরুরূপে উচ্চাসনে বসেছেন। রাজারা তাঁর পদসেবা করেন। তাঁদের ভোগবিলাসমত্ত

প্রাণে তিনি জ্বেলে দিচ্ছেন জ্ঞানের বর্তিকা—সংসারের অনিত্যত্ব বোধ এবং ভূমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হবার আকাজ্ক্ষা। তাঁদের সুপ্ত হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করছেন জনসেবার চেতনা। আবার আমরা তাঁকে দেখতে পাই আর্তনিপীড়িতের বন্ধুরূপে—বেদনাবিধুর প্রাণে তাদের সেবায় ব্রতী। দিনে দিনে মহা-ভারতের বাস্তবরূপ তাঁর অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি দেখলেন মানুষের ভিতর আত্মা কিভাবে বিক্ষুব্ধ ও ক্লিষ্ট হ'য়ে আছেন। ভারতের জনসাধারণের করুণ আর্তনাদ তাঁর মর্মকে আলোড়িত করল। আহা! তারা কত নিরুপায়!...

মীরাট পরিত্যাগ ক'রে স্বামীজী এলেন দিল্লীতে। দিল্লীর স্মৃতির সঙ্গে কত উত্থান-পতনের ইতিহাস জড়িত। বিবিদিষানন্দ নাম নিয়ে কয়েক দিন ঘুরে ঘুরে দেখলেন। প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে তাঁর মন ডুবে গেল। দিন কতক রইলেন শ্যামদাস শেঠের বাগানে। অনেক লোক আসতে লাগল তাঁর কাছে; চারিদিকে রটে গেল মহাপণ্ডিত ইংরাজী জানা এক সাধু এসেছেন। যে আলাপ করে, সে-ই মুগ্ধ হয়। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞান সকলকে স্তম্ভিত করে।...

অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন গুরুভাই তাঁকে অনুসরণ ক'রে দিল্লীতে এসে হাজির। স্বামীজী তাঁদের দেখেই বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বললেন, "তোমরা আবার এখানে এসে জুটেছ?" তবু একসঙ্গে রইলেন কয়েক দিন। কিন্তু তিনি অন্তরে এক মহাশক্তির আহ্বান শুনতে পাচ্ছিলেন।...নিঃসঙ্গ নিরঙ্কুশ হ'য়ে গণ্ডারের মতো একাকী বিচরণ করার ইচ্ছা তাঁকে নিয়ে চলল অজানা পথে। ভাবী বিবেকানন্দ গড়ে উঠার পক্ষে তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

গুরুভাইদের বললেন; "তোমরা ধ্যানভজনে ডুবে যাও। বৃথা আমার সঙ্গে এসো না। আমাকে একলা থাকতে দাও। আমার অন্তর তাই চাইছে।

আমি প্রকৃত ভারতের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চাই। বিবেকের ডাকে আমি সাড়া দিয়েছি।"

১৮৯১ খৃঃ, ফেব্রুয়ারীর শেষে তিনি একলা বেরিয়ে পড়লেন, রাজপুতনায় পথে। এর পরে দু'বৎসরব্যাপী ভারতভ্রমণ। তিনি অজ্ঞাত সন্ন্যাসিরূপে একাকী। না রইল বিশেষ পরিচয়, না ছিল কোন নির্দিষ্ট আবাস। তিনি ছিলেন মানবমাত্র, ছিলেন ভারতবাসী মাত্র। কিন্তু আত্মগোপন করতে পারলেন না। যেখানেই যেতেন বিদ্বান অথবা সরল মূর্খদের মধ্যেও সকলেই তাঁকে অসাধারণ ব'লে চিনে নিত। গ্রামে নগরে, উচ্চনীচের মধ্যে, এবং ধনী দরিদ্র, রুগ্ন বঞ্চিত ও সর্বহারাদের দুঃখ বেদনা আশা আকাঙ্ক্ষা উত্তেজনা ও সুখদুঃখের সঙ্গে, তিনি এক হ'য়ে গেলেন। সর্বত্রই পেলেন তাঁর অন্তরের দেবতার সন্ধান। শতশত মন্দিরে বিভিন্ন নামে ও রূপে—আবার নাম-রূপহীন-রূপে মানবজাতি যে ভগবানকে পূজার্চনা করে, সেই ভগবানকেই তিনি পেলেন সাধুর মধ্যে চোরের মধ্যে, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে, পূজা-ব্রতচারী ও মদ্যপায়ীর মধ্যে। তিনি সকলকে পূজা করলেন। তিনি সকলের জীবনের সঙ্গে এক হ'য়ে গেলেন সর্বোপরি বেদনাক্লিষ্ট মানবের সকরুণ আর্তনাদ তাঁর অন্তরে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল।

এই ভ্রমণের দিনগুলি ছিল—তাঁর কাছে মহা শিক্ষার দিন। তিনি কেবলই শিখেছিলেন। নিয়েছিলেন প্রচুর।...ডুবুরীর মতো করেছিলেন ভারত-মহাদেশের রত্নরাজি আহরণ। ধর্মভূমি ভারতে যে চিন্তাধারা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ছিল, সেগুলি তিনি সংগ্রহ করলেন। তিনি ধর্মের মধ্যে পেলেন শাশ্বত ঐক্য। বিভিন্ন ধর্মের মূল উৎসের সন্ধানও তিনি পেলেন। সমাজস্রোতের কর্দমাক্ত অবস্থাও তিনি বেদনাভরা প্রাণে লক্ষ্য করলেন। ঐ রুদ্ধ স্রোতকে গতিশীল ও নির্মল করার পন্থাও তাঁর প্রাণে রূপায়িত হ'ল। সর্বোপরি দেশবাসীর দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা তাঁর প্রাণকে অস্থির ক'রে তুলল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলতেন 'খালি

পেটে ধর্ম হয় না', সে-কথাটির সত্যতা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করলেন। এ সবের প্রতিকার-চিন্তা তাঁর প্রাণে আগুন জ্বালিয়ে দিল। দিনে রাত্রে কোন সময়েই তিনি ঐ-সকল চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। এমন কি নিদ্রার সময়ও চিন্তাগুলি তাঁর প্রাণে জাগরূক থাকত।

এর পরে আমরা স্বামীজীকে দেখতে পা'ব একা রাজপুতানার পথে। ফেব্রুয়ারীর শেষে তিনি আলোয়ারে পৌঁছলেন। উদ্যান-পরিবেষ্ঠিত রাজপথ দিয়ে চলতে চলতে পৌঁছলেন সরকারী চিকিৎসালয়ের সামনে। একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাশয়, এখানে সাধুসন্ন্যাসীর থাকার মতো স্থান কোথাও আছে?" যা'কে জিজ্ঞাসা করলেন—তিনিই ছিলেন সরকারী চিকিৎসালয়ের বাঙ্গালী ডাক্তার। তিনি সাগ্রহে স্বামীজীকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ীতে। অল্পক্ষণ আলাপের পরেই বুঝলেন ইনি তো সাধারণ সাধু নন। তিনি পরিচিত-দের ডেকে আনলেন স্বামীজীর কাছে! যে আলাপ ক'রে সেই মুগ্ধ হয়। কয়েক দিনের মধ্যে চারিদিকে সাড়া প'ড়ে গেল। দলে দলে লোক আসতে লাগল। তার মধ্যে ছিল শিক্ষিত অশিক্ষিত, ইতর ভদ্র যুবা বৃদ্ধ হিন্দু মুসলমান —সকলেই ধর্মোপদেশ শুনে তৃপ্ত হ'ত। কখনো তিনি প্রাণের উচ্ছ্বাসে মধুর কণ্ঠে বাংলা হিন্দী উর্দু গান ও সাধকদের পদাবলী গাইতেন, গীতা উপনিষদ্ পুরাণ কোরাণ বাইবেল ব্যাখ্যা করতেন। পুরাকালের আর্যঋষিদের চরিত্র-কীর্তন, বুদ্ধ শঙ্কর কবীর তুলসীদাস, নানক দাদু চৈতন্য রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাজন-দের জীবনের নানা ঘটনা শাস্ত্রালোকে উদ্ভাসিত ক'রে অতি সহজভাবে বুঝিয়ে দিতেন। সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের লোকসমাগম হ'য়ে ডাক্তার বাবুর বাড়ী তীর্থস্থানে পরিণত হ'ল। অনেকেই তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আলোচনাসভার আয়োজন করতেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই সর্বশাস্ত্রবেত্তা ঐ আশ্চর্য সন্ন্যাসীর সংবাদ দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজীর কানে পৌঁছিল। তিনি সাদরে স্বামীজীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। যত আলাপ করেন ততই বিস্মিত হ'ন। এমন পাণ্ডিত্য ভূয়োদর্শন ও তেজস্বিতা! সর্বত্যাগী, সবই অদ্ভুত। এ সন্ন্যাসীকে দিয়ে যদি মহারাজার জীবনের পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়—ভাবলেন দেওয়ানজী।

মহারাজা মঙ্গল সিং পুরোদস্তুর সাহেব—শিকার নিয়েই মত্ত। রাজকার্য কিছুই দেখাশুনা করেন না। মহারাজার কাছে সংবাদ গেল, এক বিখ্যাত সাধু এসেছেন। চমৎকার ইংরেজী বলেন। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান অসাধারণ। পাশ্চাত্য দর্শন তাঁর কণ্ঠস্থ। মহাত্যাগী।

কৌতূহলী হ'য়ে সাধুকে দেখতে এলেন মহারাজা—সঙ্গে কয়েকজন উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারী। দু'চার কথার পরেই মহারাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "শুন্‌ছি আপনি বড় বিদ্বান্। ইচ্ছা করলেই তো বেশ প্রচুর রোজকার করতে পারেন। তা না ক'রে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছেন কেন?"

স্বামীজী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "আপনি তো দেশের রাজা। রাজকার্য অবহেলা ক'রে সাহেবদের সঙ্গে শুধু শিকার খেলে বেড়ান কেন?"

রাজকর্মচারীরা প্রমাদ গণলেন। মহারাজাও স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন। খানিকপরে মাথা না তু'লেই বললেন, "কেন করি? তা ঠিক বলতে পারিনে। তবে হ্যাঁ, ভাল লাগে তাই করি।"

স্বামীজীও ঈষৎ হাস্য ক'রে বললেন, "আপনি যেমন ভাল লাগে ব'লে করেন, আমিও তেমনি ভাল লাগে ব'লে সন্ন্যাসী হয়েছি।" শুনে চুপ হ'য়ে গেলেন মহারাজা। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে সকলে মূর্তি-পূজা করে, ওতে কিন্তু আমার মোটেই বিশ্বাস নেই। তা হ'লে আমার কি দশা হ'বে?" একটু বিদ্রূপের হাসিও হাসলেন। স্বামীজী বললেন, 'মহারাজ বোধহয় রহস্য করছেন!"

মহারাজা, "না স্বামীজী, মোটেই নয়। দেখুন, বাস্তবিকই আমি কাঠ মাটি পাথর বা ধাতুনির্মিত মূর্তি পূজা ক'রতে পারিনে। এতে কি আমার পরজন্মে অধোগতি হবে?"

স্বামীজী স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন। সামনের দেয়ালে মহারাজার ছবি টানানো ছিল। সেখানি নামাবার আদেশ দিলেন। পরে সেটি নিজের হাতে নিয়ে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কার ছবি?" দেওয়ানজী উত্তরে জানালেন যে মহারাজার ছবি। অকস্মাৎ স্বামীজী গম্ভীর স্বরে বললেন, "দেওয়ানজী, এই চিত্রের উপর থুথু ফেলুন।" সকলেই স্তম্ভিত। সন্ন্যাসী কি উন্মাদ?

স্বামীজী কিন্তু আরো দৃঢ়স্বরে বললেন, "আপনারা যে-কেউ এ ছবির উপর থুথু ফেলুন।" সকলেই স্তব্ধ। গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল। একটা আকস্মিক দুর্যোগ যেন ঘনিয়ে এসেছে। ভয়ে জড়সড় সকলে। এমন সময় স্বামীজী বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন, "একি? এ-তো একখানা কাগজ মাত্র! এতে থুথু ফেলতে আপনাদের এত সঙ্কোচ কেন?"

দেওয়ানজী ভয়ে ভয়ে বললেন "স্বামীজী আপনি এ কি আদেশ করছেন? এ যে আমাদের মহারাজার ছবি।"

তখন স্বামীজী মহারাজকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "দেখুন মহারাজা! যদিও এ চিত্রটি আপনি নন, কিন্তু এর দিকে দৃষ্টি পড়লেই আপনার স্মৃতি মনে জেগে ওঠে। তাই তো মহারাজার মতো এই ছবিকে সম্মান দেখানো হয়। তেমনি ভগবদ্ভক্ত প্রস্তরাদি-নির্মিত মূর্তিকে ভগবানের প্রতীকজ্ঞানে পূজা করেন। ঐ পূজা ভগবানেরই পূজা; মূর্তির পূজা নয়। এই হ'ল প্রতীকোপাসনার সার তত্ত্ব। মূর্তিপূজক কখনো বলে না, হে প্রস্তর, আমি তোমার উপাসনা করি।...ব্রহ্ম চিন্ময় ও বিভু। তিনি মূর্তিতেও বিদ্যমান। মূর্তি সেই চিন্ময়

ভগবানকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই ভক্ত মূর্তিকে অবলম্বন ক'রে শ্রীভগবানকেই পূজা করে এবং সে পূজা ভগবান গ্রহণ করেন।"

মহারাজা তন্ময় হ'য়ে শুনছিলেন স্বামীজীর কথা। তাঁর কথা শেষ হ'তেই তিনি করজোড়ে বললেন, "স্বামীজী, আপনি যা বল্লেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমি এতদিন অজ্ঞান-অন্ধকারে ডুবেছিলাম। কিছুই বুঝিনি। আজ আপনি আমার চোখ খুলে দিলেন। আপনি আমায় কৃপা করুন।'

"রাজন্! ভগবান্ ব্যতীত আর কেউ কৃপা করতে পারে না। তিনি অপার কৃপাসিন্ধু। আমি তাঁরই শরণাগত। আপনিও তাঁর শরণ গ্রহণ করুন। আপনার কল্যাণ হ'বে।"—ব'লেই স্বামীজী গাত্রোত্থান করলেন।

স্বামীজী চ'লে যাবার পরে মহারাজা দেওয়ানজীকে বললেন, "দেওয়ানজী, এমন মহাত্মা আমি আর কখনো দেখিনি। যে ক'রেই হোক এঁকে কিছুদিন এখানে রাখুন।" মহারাজার অভিপ্রায় জানিয়ে, দেওয়ানজী তাঁর বাড়ীতে কিছুদিন থাকার অনুরোধ জানাতেই স্বামীজী বললেন, "দেখুন দেওয়ানজী, আমার কাছে সব রকমের লোক আসে। আপনারা বড় লোক; যদি ধনী নির্ধন পণ্ডিত মুর্খ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলের জন্য দ্বার অবারিত ক'রে দেন তো আমার থাকতে কোন আপত্তি নেই।"

দেওয়ানজী সানন্দে রাজী হ'লেন। স্বামীজীও কিছুদিন তথায় বাস ক'রে সকলকে ধর্মোপদেশ দিতে লাগলেন। রাজ্যের মধ্যে সংস্কৃত পাঠের*

---

* স্বামীজী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা এবং তার বহুল প্রচারের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতেই ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল সত্যগুলি নিহিত। তিনি ১৮৯৭ খৃঃ, মাদ্রাজে প্রদত্ত শেষ বক্তৃতায় বলেছিলেন, "...সংস্কৃত ভাষা কঠিন। সেজন্য সংস্কৃত শাস্ত্র ও তাতে লিপিবদ্ধ তত্ত্বসমূহ আমাদিগকে অবশ্যই জনসাধারণকে চলিত ভাষায় শিক্ষা দিতে হ'বে। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা চলবে। যেহেতু সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই (ভারতীয়) জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগবে।...হে নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ, আমি তোমাদিগকে বলছি—তোমাদের অবস্থার উন্নতি করবার একমাত্র উপায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা।...এবং উচ্চ বর্ণের শিক্ষাকে স্বায়ত্তীকরণ।"

ও শাস্ত্রাদি প্রচারের ব্যবস্থা হ'ল। কত দীন দরিদ্রের অভাব মোচন হ'ল। অর্থাভাবে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বালকের উপনয়ন হচ্ছে না জানতে পেরে স্বামীজী তার উপনয়নের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন।...

স্থানীয় লোকদের বিশেষ আগ্রহ সত্বেও মার্চ মাসের শেষভাগে তিনি চললেন জয়পুরের দিকে। অনন্তর ক্ষেতড়ি আজমীর মাউণ্ট আবু আমেদাবাদ জুনাগড় গির্ণার পোরবন্দর (এখানে ৮।৯ মাস), দ্বারকা (কাম্বে উপসাগরের তীরবর্তী মন্দিরবহুল সহর), পালিতানা, বরোদা খাণ্ডোয়া, বোম্বাই পুণা বেলগাঁও (১৮৯২, অক্টোবর) ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর কোচিন ত্রিবেন্দ্রম, মাদুরা প্রভৃতি স্থান দর্শন ক'রে দক্ষিণ ভারতের বারাণসী—শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর ও দেবীতীর্থ কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হ'লেন—(১৮৯২ শেষ ভাগে)। অনন্তর পণ্ডিচেরী রামনাদ মাদ্রাজ হায়দ্রাবাদ ও ক্ষেতড়ি হ'য়ে ১৮৯৩ খৃঃ, ৩১শে মে বোম্বাই হ'তে জাহাজে আমেরিকা যাত্রার দিন পর্যন্ত তিনি ভ্রমণই ক'রেছিলেন।

প্রায় ২॥০ বৎসরের এই ভ্রমণের প্রতিটি দিনই বহু ঘটনা-পূর্ণ। রাজপ্রসাদ বা দরিদ্রের কুটীরে তিনি যে শিক্ষা দেবার ও যে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য পর্যটনে বে'র হয়েছিলেন, সর্বত্রই ভাল ভাবে তা সম্পন্ন ক'রেছিলেন।

তিনি অন্যত্র বলেছেন, "স্ত্রীলোক ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেও সংস্কৃত শিক্ষা-বিস্তার সর্বাগ্রে আবশ্যক। প্রাচীন ঋষিদের প্রবর্তিত শিক্ষা দ্বারা তারা কার্যক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে অধিগত ক'রতে পারলে, নিজেরাই বুঝতে পারবে সমাজের কোন স্তরে তাদের স্থান নির্দিষ্ট হওয়া উচিত, কোন কোন কাজে তাদের হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত এবং কোনটি রক্ষণ বা বর্জন করা প্রয়োজন।"...

ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ। "আমাদের এই পুণ্যভূমিতে একমাত্র ধর্মই জাতীয় জীবনের বনিয়াদ। ভারতবাসীর জীবন-সঙ্গীতে ধর্মই মূল স্বর।... ধর্ম, কেবল ধর্মই ভারতের প্রাণ"—স্বামীজীর বাণী। সংস্কৃত ভাষাতেই আমাদের মূল ধর্ম-গ্রন্থগুলি রচিত। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ক'রে ধর্মের মূল তত্ত্বগুলির সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'বে। সেজন্য স্বামীজী সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচার সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে অনেক কথা বলেছেন।..ভারতে জাতীয় জীবনে ঐক্যস্থাপনও একমাত্র সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব।

তিনি যুবকদের বেদবেদান্ত পুরাণাদি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ-পাঠে উৎসাহিত করতেন। তা'র চাইতেও বড়, মানুষ মাত্রকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করবার উপদেশ দিতেন। জনসাধারণের উন্নয়ন এবং দরিদ্র প্রজাদের দারিদ্র্যমোচন ও শিক্ষার* ব্যবস্থা করতে রাজা-মহারাজাদের নিয়োজিত করতেন। দরিদ্রদের শোনাতেন সাহস ও আশার বাণী, ভ্রষ্টাচারীদের প্রতিষ্ঠিত করতেন মর্যাদার জীবনে, পাপীতাপীদের হতাশ প্রাণে ঢেলে দিতেন অমৃতরস।

প্রায় তিনবৎসরব্যাপী স্বামীজীর ভারতভ্রমণের দিনগুলি ঘটনাবহুল এবং প্রত্যেকটি ঘটনারই বিশেষ তাৎপর্য আছে। স্থানাভাবে কয়েকটি মাত্র ঘটনা পরিবেশন ক'রেই আমাদের তৃপ্ত থাকতে হ'বে।...

* শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল—যা তাঁর বাণী ও রচনাবলীর মধ্যে অনুস্যূত দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর মতে শিক্ষার ভিত্তি হ'বে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি। সংস্কৃত ভাষার মধ্যে সত্য সমূহ নিহিত রয়েছে। সেজন্য ঐ ভাষার মাধ্যমে আমাদের আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়া হ'লে তার ফল শুভ হবে।

বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির দোষ গুণ বিচার ক'রে তিনি বলেছেন যে, এদেশে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে অনেক ভাল জিনিষ আছে বটে, কিন্তু তার চাইতে সাঙ্ঘাতিক কতকগুলি দোষ আছে, অনেক বেশী।...ঐ শিক্ষায় মানুষ তৈরী হয় না; কারণ তা সম্পূর্ণ নেতিমূলক শিক্ষা, যার বিষময় ফল মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়াবহ। তিনি আরো বলেছেন যে বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি শুধু কেরাণী সৃষ্টির একটি নিখুঁত যন্ত্র বিশেষ। শুধু তা-ই-নয়—এই শিক্ষাপদ্ধতির কুফল সুদূরপ্রসারী। এর প্রভাবে মানুষের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস লোপ পাচ্ছে। শিক্ষাসম্বন্ধে তিনি অন্যত্র বলেছেন, "শিক্ষা কি পুঁথিগত বিদ্যা? না। নানা বিষয়ের জ্ঞান? না, তাও নয়।...যথার্থ শিক্ষা ব'লতে কতকগুলি শব্দসংগ্রহ বুঝায় না, বুঝায় মেধা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলির পরিস্ফুরণ।...মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা স্বতঃ বর্তমান তারই বিকাশের নাম শিক্ষা।...যার মাধ্যমে জীবন গ'ড়ে উঠে, মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, চরিত্রের উন্নতি ঘটে, এমন সব ভাব আমাদের অবশ্যই গ্রহণ ক'রতে হ'বে। বাস্তবিক যদি কেউ একটি গ্রন্থাগারের সব পুস্তক কণ্ঠস্থ ক'রে থাকে, তার অপেক্ষাও তুমি বেশী শিক্ষিত হ'তে পার যদি মাত্র পাঁচটি ভাব হৃদয়ঙ্গম ক'রে তদনুযায়ী নিজ জীবন ও চরিত্র গ'ড়ে তুলতে পার।...শিক্ষা বলতে আমি বুঝি যথার্থ কার্যকরী জ্ঞানার্জন।...শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় চলবে না। আমাদের প্রয়োজন সে শিক্ষার যদ্দারা চরিত্রগঠন হয়, মনের বল বৃদ্ধি হয়, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় এবং মানুষ স্বাবলম্বী হ'তে পারে। চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের সমন্বয়—ব্রহ্মচর্য শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস হ'বে যার মূল মন্ত্র।"...

আলোয়ার হ'তে জয়পুর। পথে পাণ্ডুপোলে হনুমানজীর বিখ্যাত মন্দির ও টাহলায় নীলকণ্ঠ মহাদেবের প্রাচীন মন্দিরাদি দর্শন ক'রে তিনি জয়পুরে এলেন। সর্বত্রই বহুলোক তাঁর উপদেশ-প্রার্থী হ'ত। নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দিরটি ও স্থান তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। সমুদ্রমন্থনের হলাহল পান ক'রে মহাদেবের নাম হ'ল নীলকণ্ঠ। ঐ পৌরাণিক ঘটনার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনি তথায় বলেছিলেন, "সমুদ্র হচ্ছে মায়া-সমুদ্র। রূপরস-গন্ধাদিময় এই বিচিত্র জগৎ মায়ার রচনা। এখানে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বিবিধ ভোগ্যবস্তু আছে। ভোগের পরিণামে তা থে'কে হলাহল উদ্‌গীর্ণ হ'বেই। সে হলাহল আত্মজ্ঞানের পরিপন্থী।...ভূমানন্দে মগ্ন দেবাদিদেব শঙ্কর সংসার-সমুদ্রোত্থিত হলাহল নিজে পান ক'রে প্রজাদের দান করেছিলেন অমৃত।..."

বার

আলোয়ারের পর জয়পুরে দু'সপ্তাহ অবস্থানকালে তিনি এক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণের নিকট অষ্টাধ্যায়ী পাণিনী পাঠ আরম্ভ করেছিলেন। তিন দিন ব্যাখ্যা ক'রেও পণ্ডিতজী প্রথম সূত্রভাষ্য স্বামীজীর বোধগম্য ক'রতে পারলেন না। তখন হতাশ হ'য়ে বললেন, "স্বামীজী মনে হচ্ছে আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হ'বে না।"

বিশেষ লজ্জিত হ'য়ে স্বামীজী নিজের চেষ্টাতেই ভাষ্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পড়তে বসলেন, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভাষ্যের মর্মার্থ বু'ঝে নিলেন। পরে তিনি পণ্ডিতজীর কাছে উপস্থিত হ'য়ে ভাষ্য ব্যাখ্যা

করলেন। তাঁর সরল ও সুচিন্তিত ব্যাখ্যা শুনে পণ্ডিতজী নির্বাক। শুধু ব্যাখ্যা নয়, নূতন আলোক সম্পাত ক'রে তিনি পণ্ডিতজীকে মুগ্ধ করেন। তারপর তিনি সূত্রের পর সূত্র, অধ্যায়ের পর অধ্যায় অতি সহজে প'ড়ে যে'তে লাগলেন। স্বামীজী ব'লেছিলেন, "সংকল্পই সব। প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হ'লে কোন কাজই আটকায় না। চাই দৃঢ়সংকল্প।"...

জয়পুরে বিভিন্নস্থানে অবস্থানকালে বহু লোক তাঁর সংস্পর্শে এ'সে ধন্য হ'য়েছিল। প্রধান সেনাপতি সর্দার হরিসিং স্বামীজীকে দেখেই বিশেষ আকৃষ্ট হন; এবং নিজ-আলয়ে তাঁর ধর্মালোচনার ব্যবস্থা করেন। তিনি মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। অনেক তর্ক করলেন স্বামীজীর সঙ্গে। একদিন দু'জনে ভ্রমণে বেরিয়েছেন। রাজপথে ভক্তগণ কীর্তন করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ নিয়ে মস্ত শোভাযাত্রা ক'রে চলেছে। দু'জনে দাঁড়ালেন। এমন সময় স্বামীজী হঠাৎ হরিসিংকে স্পর্শ ক'রে বললেন, "দেখুন শ্রীভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ।"

স্বামীজীর স্পর্শে হরিসিং-এর ভাবান্তর হ'ল। অশ্রুসিক্ত নয়নে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়িয়ে বিগ্রহ দর্শন করতে লাগলেন। পরে বিগলিত কণ্ঠে বললেন, "স্বামীজী এতকাল তর্কযুক্তির সাহায্যে যা বুঝতে পারিনি, আজ আপনার কৃপায় তা সম্ভব হ'ল। বিগ্রহের মধ্যে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ ক'রে আমি ধন্য হলাম।"

জয়পুরে এবং সর্বত্র জনসাধারণের দারিদ্র্য ও অসহায় অবস্থা দেখে স্বামীজীর প্রাণ বেদনায় ভ'রে গেল। এরাই হ'ল জাতির মেরুদণ্ড, জাতির প্রাণ, ভবিষ্যৎ ভারত। দুর্গতদের শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য তিনি রাজা ও রাজকর্মচারীদের উত্তেজিত করতে লাগলেন। তিনি ছিলেন গণ-জাগরণের ঋষি, আর্তবন্ধু। শুধু ভারতের নয়, সকল দেশের সকল জাতির

গরীবদের জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাঁর বিশাল হৃদয়ের মধ্যে ভৌগোলিক গণ্ডিরেখা ছিল না। তিনি বলেছেন, "...ভগবানকে কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছ? দরিদ্র আর্ত দুর্বল ঘৃণিত অস্পৃশ্য এরাই কি দেবতা নন? আগে এদেরই পূজা কর না কেন?...বেদান্তের জন্মভূমি ভারতবর্ষে জনসাধারণ যুগ যুগ ধ'রে অবহেলিত। অশুচি তাদের স্পর্শ, অপবিত্র তাদের সঙ্গ। নিরাশার অন্ধকারে তাদের জন্ম; তার-ই মধ্যে তাদের নিরবচ্ছিন্ন স্থিতি।... মনে রেখো, দরিদ্রের কুটীরেই ভারতীয় জাতির বসতি। কিন্তু হায়, তাদের জন্য কেউ এখনো কিছু করেনি।...ভারতের উপেক্ষিত কৃষক তাঁতি মুচি ঝাড়ুদার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বিজেতার নিপীড়নে ও স্বদেশবাসীর অবজ্ঞা সত্ত্বেও স্মরণাতীত কাল হ'তে নীরবে কাজ ক'রে আসছে। এবং তার জন্য কোন দিনই তারা উপযুক্ত পারিশ্রমিকও পায় নি।"

ভারতের জনসাধারণের দুর্গতি দেখে তাঁর বিশাল প্রাণ অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হ'য়েছিল।* তাই তিনি গণসম্বিৎ জাগ্রত করার জন্য যুবকদের উৎসাহিত করেছেন। দুর্গত ও সর্বহারাদের অসহায় অবস্থার প্রতি রাজা-মহারাজাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। আচণ্ডাল সর্বশ্রেণীর উন্নয়নকল্পে তিনি হৃদয়ের শোণিত দান করতে লাগলেন। কিন্তু ঠিক কি উপায়ে গণজাগরণ আসবে, তা যেন তখনও তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি। কর্তব্য কি তা জানিয়ে দেবার জন্য তিনি কাতরপ্রাণে শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। আমরা

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে স্বামীজী সকলদেশের নিপীড়িত মানবের জন্য তাঁর গভীর বেদনানুভূতি নানাস্থানে প্রকাশ করেছেন। সে সব বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। একস্থানে তিনি লিখছেন, "আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভার, তাহারা কোথায়? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে, সর্বকালে "জঘন্য প্রভবো হি সঃ" বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে "জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি" ভয়াল দণ্ড সকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই "চলমান শ্মশান," ভারতেতর দেশের "ভারবাহী পশু" সে শূদ্রজাতির কি গতি?"

জানি তাঁর প্রার্থনা নিষ্ফল হয়নি। আজ সকল দেশেই জনজাগরণ এসেছে—বিবিধ গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে—সোশ্যালিজম্ এনার্কিজম্ নাইহিলিজম্ বা কমিউনিজম্ রূপে। তিনি বলেছিলেন, "এবার শূদ্রশক্তির জাগরণ।" তাঁর ভবিষ্যৎবাণী আক্ষরিকভাবে সফল হ'তে চলেছে। সকল দেশের শ্রমিক ও তথাকথিত নীচ জাতির মধ্যে সংগঠন ও জাগরণের সূচনা দেখা যাচ্ছে দিকে দিকে।

নিপীড়িত মানবের দুঃখদারিদ্র্যের সংস্পর্শে তিনি যত আসতে লাগলেন, ততই তাঁর অন্তরে জনসেবাব্রত রূপ নিতে লাগল। মানবের দুঃখ বেদনাকে কেন্দ্র করেই তাঁর সমস্ত শক্তি, সকল প্রচেষ্টা একীভূত হয়েছিল মানুষ-রূপী 'নারায়ণের' সেবায়। তিনি বলেছিলেন, "আমি এমন একটি ধর্ম চাই, যা আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগাবার এবং দরিদ্র-জনসাধারণকে অন্ন ও শিক্ষা দিবার, আমাদের চারি পাশের সকল দুঃখ বেদনাকে দূর করবার শক্তি এ'নে দেবে।...যদি ভগবান লাভ করতে চাও, তা হ'লে মানুষের সেবা কর।"

জনসেবা-ব্রতে তিনি হৃদয়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। সমগ্র বিশ্বের দরিদ্রের বুকফাটা আর্তনাদের প্রতিধ্বনি তিনি শুনতে পেলেন তাঁর অন্তরে। তাই তিনি দিকে দিকে শোনাতে লাগলেন 'নররূপী-নারায়ণ-সেবার' মন্ত্র। ভারতের এক প্রান্ত থে'কে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকলকে অনুপ্রাণিত ক'রতে লাগলেন নরনারায়ণ-সেবাব্রতে। রবীন্দ্রনাথের প্রাণে স্বামীজীর ঐ বাণী কিভাবে সাড়া দিয়েছিল? তিনি লিখেছেন, "বিবেকানন্দ বলেছিলেন—প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, বলেছিলেন—দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। একে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালে। এতো

কোন বিশেষ আচারের উপদেশ নয়। ব্যাবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন নয়। ছুঁত মার্গের বিরুদ্ধতা এর মধ্যে আপনিই এ'সে পড়েছে। তার দ্বারা রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হ'তে পারে ব'লে নয়। তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হ'বে ব'লে। সেই অপমান যে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা।

বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন ব'লেই কর্মের মধ্য দিয়ে, মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।" (রামকৃষ্ণমিশন শিক্ষণ মন্দির বেলুড়মঠ, ১৯৬১, প্রকাশিত 'সন্দীপন' ২য় সংখ্যা—৩২ পৃষ্ঠা)

স্বামীজী নিজেই অন্যত্র বলেছেন যে ভ্রান্তিবশতঃ যাদের লোকে 'মানুষ' ব'লে অভিহিত করে, আমরা সেই নারায়ণেরই সেবক।...কি সামাজিক কি রাজনীতিক কি আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ মঙ্গলসাধনের একটি মাত্র সূত্র বিদ্যমান—সে সূত্র হচ্ছে এইটুকু জান যে, মানব মাত্রই নারায়ণ, 'আমি ও আমার ভাই এক'। সর্বদেশে ও সর্বজাতির পক্ষে এ সত্য সমভাবে প্রযোজ্য। স্বামীজীর এই বাণীর ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সামগ্রিক ঐক্য ও বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ বিশ্বভ্রাতৃত্বের বীজটি। ঐ মন্ত্রের ভিতর দিয়ে তিনি আহ্বান করেছিলেন ভবিষ্যৎ ভারতকে।

* * *

জয়পুর হ'তে স্বামীজী এলেন আজমীরে। তথায় মোগল সম্রাটদের প্রাসাদ, প্রসিদ্ধ দরগা ও ফকির চিস্তি সাহেবের সমাধিস্থানের ভাস্কর্য দেখে তিনি খুশী হ'লেন। অনন্তর এলেন আবুপাহাড়ে। পর্বতের রমণীয় শোভা ছাড়া কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ জৈনমন্দিরের অনুপম ভাস্কর্য তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল। এক গুহায় আশ্রয় নিয়ে তিনি কয়েক দিন ধ'রে 'দিলওয়াড়া মন্দিরের' অতুলনীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য তন্ন তন্ন ক'রে দেখলেন। স্বামীজী স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

এক গুহাতে অবস্থানকালে কয়েকদিনের মধ্যেই বহুলোক তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হ'ল। স্থানীয় রাজার উকিল জনৈক মুসলমান মৌলবী স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে এত প্রভাবান্বিত হ'লেন যে, তিনি শ্রদ্ধা সহকারে স্বামীজীকে নিজের বাংলায় নিয়ে গিয়ে আহারাদির পৃথক ব্যবস্থা ক'রে তাঁকে কিছুদিন রেখেছিলেন। ঐ সময়ে মৌলবী সাহেব বহু পদস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে আসতেন স্বামীজীর কাছে। এত বেশী লোক আসতে লাগল যে, তাঁর আহার ও বিশ্রামাদির সময় ছিল না। ঐ ভাবে মৌলবী একদিন খেতড়ির রাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহন লালকে নিয়ে এলেন স্বামীজীর কাছে। ঐ সেক্রেটারী সমগ্র রাজপুতনার মধ্যে বিশেষ সম্মানিত 'তাজিমী সরদার' বংশোদ্ভব। তাঁদের এত মর্যাদা যে রাজদরবারে এ'লে স্বয়ং রাজা সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতেন। কৌপীন-পরিহিত স্বামীজী ঠিক সে সময়ে একটু বিশ্রাম করছিলেন। জগমোহন লাল সমালোচকের মনোভাব নিয়ে এসেছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হ'তেই তিনি প্রশ্ন ক'রলেন, "আপনি হিন্দু সন্ন্যাসী, মুসলমানের বাড়ীতে কেন রয়েছেন?"

স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "মহাশয়, আমি সন্ন্যাসী। সামাজিক আচার নিয়ম আমার জন্য নয়। আমি একজন মেথরের সঙ্গেও আহার করতে পারি। ব্রহ্ম সর্বভূতে সকল প্রাণীতে বিদ্যমান; সকলেই যে ঈশ্বরের প্রতিমা। ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হ'লে জাতিকুল উচ্চ-নীচ-স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের স্থান কোথায়? শাস্ত্রও এর সমর্থন করে—'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধি কো নিষেধঃ' —মুক্তিমার্গে বিচরণশীল ত্রিগুণাতীত পুরুষগণের পক্ষে বিধিই বা কি নিষেধই বা কি? আপনারা শাস্ত্র বা ভগবানের ধার ধারেন না।"

স্বামীজীর এই চোখা জবাবেও জগমোহন লাল নিরস্ত হ'লেন না। তিনি নানা বিষয়ে তুমুল তর্ক জুড়ে দিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নিরস্ত হ'তে হ'ল। তিনি মুগ্ধ হ'লেন—তাঁর বুকের ভিতর ধাক্কা লাগল। এতো শুধু

কথামাত্র নয়! রাজার সঙ্গে এঁর পরিচয় করাতে হ'বে। সেক্রেটারীর মুখে ঐ অদ্ভুত সন্ন্যাসীর কথা শুনে রাজা তাঁর দর্শনের জন্য প্রস্তুত হ'লেন। স্বামীজীকে ঐ বিষয় জানাতেই তিনি তখনই গেলেন রাজার সঙ্গে দেখা করতে।

রাজা বাহাদুর পরম শ্রদ্ধা-ভরে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা ক'রে বসালেন এবং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন: জীবন কি? ধর্ম কি? শিক্ষা কি? নীতির অনুশাসন কি? প্রত্যেকটি প্রশ্নের সদুত্তর শুনে রাজা তো স্বামীজীর গভীর শাস্ত্রজ্ঞান বিশ্লেষণ-শক্তি ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরিচয় পেয়ে একেবারে মুগ্ধ হ'লেন। প্রথম পরিচয় ক্রমে গভীর অন্তরঙ্গতায় পরিণত হ'ল। দিনে দিনে তিনি স্বামীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সম্পন্ন হ'য়ে উঠলেন। নানাবিধ আলোচনা হ'ত। ধর্ম সংস্কৃতি সভ্যতা রাষ্ট্র মানবজীবনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি বহু প্রশ্ন তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল।...

এবার রাজার খেতড়িতে ফিরে যাবার সময়। ধর্মপ্রাণ রাজা অজিত সিং একদিন খুব বিনীতভাবে বললেন, "স্বামীজী আপনি আমার রাজ্যে চলুন। আমি পরম যত্নে আপনার সেবা ক'রব।" রাজার বিশেষ আগ্রহে অগত্যা স্বামীজী সম্মত হ'লেন। কয়েকদিন পরে রাজা স্বামীজী ও অমাত্যদের সঙ্গে খেতড়ি যাত্রা করলেন। ট্রেনে জয়পুর পর্যন্ত। তার পরে ৯০ মাইল রাজকীয় শকটে যেতে হ'ল।

স্বামীজী খেতড়িতে কয়েক সপ্তাহ ছিলেন। রাজপ্রাসাদেও তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন। খেতড়ির দিনগুলি সাধনা স্বাধ্যায় ও শিক্ষাদানে পরিপূর্ণ ছিল। অনেক সময়ই তিনি ধ্যানে অতিবাহিত করতেন। নানা বিষয়ে উপদেশদানও তাঁর দৈনন্দিন কাজের অঙ্গ ছিল। শুধু রাজা নয়, পাত্র মিত্র বহু বিশিষ্ট লোক আসতেন তাঁর কাছে উপদেশপ্রার্থী হ'য়ে।

খেতড়ির রাজা উন্নতমনা ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর সভাতে সংস্কৃত এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে অভিজ্ঞ অনেক পণ্ডিত ছিলেন। রাজার সভাপণ্ডিত নারায়ণ দাস সমগ্র রাজপুতানার মধ্যে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ। স্বামীজী ঐ পণ্ডিতের কাছে পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করতে লাগলেন। দু'একদিনের মধ্যে স্বামীজীর অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে পণ্ডিতজী বললেন, "স্বামীজী, আপনার মতো বিদ্যার্থী পাওয়া দুর্লভ।" যোগ্য ছাত্র পেয়ে পণ্ডিত-জী মহা উৎসাহে পড়াতে লাগলেন। কিন্তু স্বামীজী এমন সব কূট প্রশ্নের অবতারণা করতেন, সে গুলির সমাধান তিনি খুঁজে পেতেন না।

রাজা স্বামীজীর জীবন দেখে তাঁর প্রতি এতটা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়েছিলেন যে, তাঁকে গুরুপদে বরণ করলেন। স্বামীজীও রাজার ভক্তি দেখে তাঁকে শিষ্য-রূপে গ্রহণ করেন।

খেতড়িরাজ অপুত্রক ছিলেন। একদিন তিনি স্বামীজীর কাছে অতি কাতরভাবে মনের দুঃখ জানিয়ে বললেন, "আমি অপুত্রক। আপনি আশীর্বাদ করুন, যেন আমার একটি পুত্রসন্তান লাভ হয়। আপনার আশীর্বাদ নিষ্ফল হবে না।"

রাজার ভক্তি ও কাতরতায় স্বামীজীর প্রাণে করুণার সঞ্চার হ'ল। তিনি আশীর্বাদ করলেন রাজাকে। স্বামীজীর আশীর্বাদ নিষ্ফল হয়নি। দু'বৎসরের মধ্যেই রাজা একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন।

রাজা গুরুর প্রতি এত আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, একমুহূর্ত তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। এমন কি গভীর রাত্রেও এসে স্বামীজীর পদসেবা করতেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি বয়স্যদের সঙ্গে প্রমোদ-কাননে উপস্থিত হয়েছেন। গায়িকারা বীণাযোগে মধুর সঙ্গীতের তান তুলেছে। ঐ সময়ে রাজার মনে হ'ল—আহা এ সঙ্গীত-শ্রবণে স্বামীজী খুবই আনন্দিত হ'বেন। তখনই

তিনি সেক্রেটারীকে পাঠালেন স্বামীজীকে আহ্বান করার জন্য। স্বামীজী এলেন। রাজার আদেশে জনৈক নর্তকী গান ধ'রল। কিন্তু বামাকণ্ঠের সঙ্গীত শ্রবণমাত্র স্বামীজীকে গাত্রোত্থান ক'রতে দেখে রাজা যুক্তকরে বললেন, "স্বামীজী একটি গান শুনে যান।"

রাজার অনুরোধে স্বামীজীকে পুনরায় আসন গ্রহণ করতে হ'ল। নর্তকী বৈষ্ণব কবি সুরদাসের ভজন গাইলেন প্রাণের সবটুকু আবেগ দিয়ে—

"প্রভু মেরো অওগুণ, চিত ন ধরো,
সমদরশী হ্যায় নাম তিহারো, চাহে তো পার করো।
ইক লোহা পূজা মেঁ রহত হ্যায়, ইক রহত ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নহি হ্যায়, দুহুঁ এক কাঞ্চন করো॥

* * *

ইক মায়া ইক ব্রহ্ম, কহাওত, সুরদাস ঝগেরো।
অজ্ঞান সে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥"

গানের ব্যঞ্জনা স্বামীজীর অন্তর স্পর্শ করল! স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন তিনি। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—শুধু কি কথার কথা! সন্ন্যাসী তো সমদর্শী। অনুশোচনার তীক্ষ্ণশরে বিদ্ধ হ'লেন তিনি। পতিতার গানে তাঁর অন্তর আলোকিত। তিনি তখনই করজোড়ে বললেন: "মা, আমায় ক্ষমা করুন।...আপনাকে ঘৃণা ক'রে উঠে যাচ্ছিলাম। আপনার গানে আমার চৈতন্য হ'ল।"...তিনি মস্ত-বড় শিক্ষা পেলেন সেদিন। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তিনি আরো সমদর্শী হয়েছিলেন।

স্বামীজী কেবলমাত্র রাজপ্রাসাদবাসী ছিলেন না। তিনি প্রজাদের সুখ-দুঃখেরও ভাগী হ'তেন। রাজপুতানা ভ্রমণকালেই গরীবদের শোচনীয় অবস্থার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হ'ন এবং তার প্রতিকারের চেষ্টা

করেন। তিনি রাজা মহারাজাদের প্রাণে জনসেবার ভাব জাগ্রত করেছিলেন। স্বামীজীর উপদেশে অনুপ্রাণিত হ'য়ে খেতড়িরাজ তাঁর রাজ্যে গণ-উন্নয়নের নানা ব্যবস্থা করেন। রাজাদের হাতে শক্তি ছিল, অর্থ ছিল। তাই তিনি তাঁদের সঙ্গে মিশেছিলেন তাঁদের মনের পরিবর্তন আনবার জন্য। তাতে অনেকাংশে সফলও হ'য়েছিলেন। যেখানেই তিনি গিয়েছেন, ধনীদের নিকট দরিদ্রের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি এও বুঝেছিলেন যে, দু'চার জন রাজা মহারাজার বদান্যতা ও সদিচ্ছায় ভারতের ব্যাপক দুঃখ-দারিদ্র্যের অতি সামান্যই লাঘব হ'তে পারে। স্বামীজীর পাশ্চাত্য দেশে গমনের পরিকল্পনার পশ্চাতেও কতকটা ছিল ভারতের দুঃখমোচন। তিনি বলেছিলেন, "আমি সমস্ত ভারত ভ্রমণ করেছি।...সর্বত্রই জনসাধারণের ভয়াবহ দুঃখ-দারিদ্র্য স্বচক্ষে দেখেছি। দেখে আকুল হয়েছি। চোখের জল বাধা মানে নি।... এই কারণেই জনসাধারণের মুক্তির অন্যতম উপায় খুঁজতেই আমি এখন আমেরিকায় চলেছি।"

স্বামীজী যে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তাঁর দারিদ্র্যপীড়িত স্বদেশবাসীদের জন্য ধন ও সাহায্যপ্রার্থী হ'য়ে ধনকুবেরের দেশে গিয়েছিলেন, সে ঝুলি তখনই পূর্ণ না হলেও, তাঁর প্রার্থনা ব্যর্থ হয়নি। তিনি মানবাত্মার একটি কোমল-তন্ত্রীতে আঘাত করেছিলেন। জানিয়েছিলেন মানবজাতির মধ্যে ঐক্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আবেদন। মানুষের কাছে দীন-আর্ত-মানবের জন্য সহানুভূতি প্রার্থনার সুরে বে'র হয়েছিল তাঁর মুখ থেকে। বর্তমানে প্রাচ্যের অনুন্নত জাতিদের জন্য পাশ্চাত্যের কাছ থেকে যে অপরিমিত সাহায্য আসছে, তা প্রকাশ ক'রে স্বামীজীর আবেদনেরই ফল। তাতে দাতাদের মনে—রাজনীতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে (পুরোপুরি নিঃস্বার্থ সাহায্য একটা কল্পনামাত্র), কিন্তু প্রাচ্যের অগণিত নরনারী যে তাতে উপকৃত হচ্ছে তা অস্বীকার করবার জো

নেই। তিনি মানবজাতির অন্তরে যে বিশ্বমানবতার বীজ বপন ক'রেছিলেন, তা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসলিলে সিক্ত ছিল। তাই ঐ বীজ কখনো নষ্ট হ'তে পারে না।

স্বামীজীর জীবনব্রত কি ছিল তার আভাষ পাই তাঁর একখানি চিঠি থেকে : "...একদিকে ভারতের ও বিশ্বের ভাবী ধর্মসম্বন্ধীয় আমার পরিকল্পনা এবং যে উপেক্ষিত লক্ষ লক্ষ নরনারী দিন দিন দুঃখের তমোগর্তে ধীরে ধীরে ডুবছে, যাদের সাহায্য করবার, কিংবা যাদের বিষয় চিন্তা করবার কেউ নেই... যারা দীন হীন ও উৎপীড়িত, তাদের দ্বারে দ্বারে সুখ সাচ্ছন্দ্য নীতি ধর্ম শিক্ষা বহন ক'রে নিয়ে যেতে হবে। এ-ই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত। এটি আমি উদ্‌যাপিত করব, কিংবা মৃত্যু বরণ করব।" বিশ্বকল্যাণের বেদীমূলে তাঁর জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত!

খেতড়ির রাজপ্রাসাদেও স্বামীজীর অন্তরে ঐ চিন্তা সজাগ ছিল। তাঁর অনুপ্রেরণায় পরে রাজব্যয়ে ও ধনীদের অর্থে কত অনাথাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, অবৈতনিক বিদ্যাভবন, আর্তত্রাণ-কারী ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।...

খেতড়ি-রাজার বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও স্বামীজী বেরিয়ে পড়লেন। খেতড়ি হ'তে পুনরায় আজমীর হ'য়ে আমেদাবাদে। এককালে ঐ স্থানের সমৃদ্ধি ও আভিজাত্য এত অধিক ছিল যে, লণ্ডনের সঙ্গে এর তুলনা হ'ত বহু মনোরম জৈন মন্দির, মুসলমানদের প্রসিদ্ধ মসজিদ ও সমাধিমন্দির ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভরূপে বিদ্যমান।...স্বামীজী ঐ সুযোগে স্থানীয় জৈন পণ্ডিতদের কাছে জৈনধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করলেন।

অতঃপর তাঁকে আমরা দেখতে পাই কপর্দকহীন পরিব্রাজকরূপে ওয়াদওয়ানের পথে। ভিক্ষান্নে শরীর-ধারণ। দিনে পথ-ভ্রমণ, রাত্রে

বৃক্ষতলে বা দেবমন্দিরাদিতে আশ্রয়। তিনি কখনও বিবিদিষানন্দ বা সচ্চিদানন্দ নামে পরিচিত। ভারতের অগণিত সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনিও একজন। কম্বল ও একখানি বহির্বাস দণ্ডকমণ্ডলু, গীতা ও **Imitation of Christ** (ঈশানুসরণ) তাঁর সম্বল। সর্বত্রই গরীবদের সঙ্গে বেশী মিশতেন। তাদের সরলতা ও ধর্মবিশ্বাস তাঁকে বিশেষ আকর্ষণ করত।

* * *

লিমডীতে স্বামীজীর জীবন বিপন্ন হয়। এক ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে তিনি পড়েছিলেন। কয়েকদিন সহরে পরিব্রাজকরূপে অতিবাহিত ক'রে—তিনি শহরের এক সাধুদের আখড়ায় আশ্রয় নিলেন। সাধুরা সাদরে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে একটি নির্জন গৃহে বাসের ব্যবস্থা ক'রে দিল। অনুকূল স্থান মনে ক'রে স্বামীজী ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন যে, তিনি ভাল জায়গায় আশ্রয় নেন নি। দেখতে পেতেন নানারকমের স্ত্রীলোক আসছে,—ধর্মের নামে যত কুৎসিত অনুষ্ঠান! ঐ সাধুরা বীজমার্গী সম্প্রদায়-ভুক্ত। ব্রহ্মার উপাসক। মন্ত্রোচ্চারণের ঘটা আছে—আসলে করে প্রজাবৃদ্ধি। স্বামীজীর মাথা ঘুরে গে'ল। কয়েকদিন পরে তিনি পলায়নের চেষ্টায় যেই দরজা খুলতে গিয়েছেন, দেখলেন যে, দরজা বা'র থেকে তালাবদ্ধ। তাঁর গতিবিধির উপরও সতর্ক দৃষ্টি। বুঝলেন, তিনি বন্দী হয়েছেন।

আখড়ার অধ্যক্ষ এসে তাঁকে বলল, "তুমি ব্রহ্মচর্যবান্ ব্রহ্মচারী, একজন সাধু। আমরা একব্রত উদ্‌যাপন করছি, তোমার তপস্তার ফল আমাদের দান কর। তোমার ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করতে হবে।" স্বামীজী চুপ ক'রে থেকে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ভগবানের কাছে কাতর প্রাণে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

একটি বালক স্বামীজীর কাছে প্রায়ই আসত এবং তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। পরদিন বালকটি আসতেই স্বামীজী তাঁর বিপদের কথা লিখে বালকের হাতে দিয়ে বললেন 'তুমি যে ভাবেই হো'ক এই লেখাটুকু ঠাকুর-সাহেবের হাতে দেবে।" লিমডির রাজার কাছে সকলেরই অবারিত দ্বার। বালক ঐ লেখাটুকু রাজার হাতে দিতেই, রাজা তাঁর উদ্ধারের জন্য কয়েকজন দেহ-রক্ষীকে পাঠালেন। স্বামীজী রাজপ্রাসাদে এসে বর্ণনা করলেন সমস্ত ঘটনা।

রাজার বিশেষ অনুরোধে তাঁকে কিছুদিন থাকতে হ'ল লিমডিতে। বীজমার্গী সম্প্রদায়ের কথা স্বামীজী পূর্বে শুনেছিলেন। কিন্তু তারা যে এমন বীভৎস কর্ম করে, তা তাঁর জানা ছিল না। ভারতে ধর্মের নামে এ-প্রকার কত ভ্রষ্টাচারী সম্প্রদায়ের যে সৃষ্টি হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। তারা ধর্মকে কলঙ্কিত ও সমাজকে কলুষিত করেছে। ধর্মের নামে দারুণ অধর্মাচরণ ক'রে তারা সরল প্রাণ অশিক্ষিত জনসাধারণকে কুপথগামী করেছে।...

স্বামীজীর শুভাগমনে ঠাকুরসাহেব বিশেষ আনন্দিত হ'লেন। রাজ্যের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের সভা আহুত হ'ল। স্বামীজী বেদান্ত-ধর্ম ব্যাখ্যা করলেন। তার বক্তৃতা শুনে সকলেই একবাক্যে তাঁকে সনাতন বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ব'লে ঘোষণা করলেন। অতঃপর লিমডী হ'তে স্বামীজী যাত্রা করলেন জুনাগড় অভিমুখে। তাঁর জীবনকথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্রই বহুলোক তাঁকে অভ্যর্থনা করত। জুনাগড়ের পথে তিনি ভাবনগর ও সিহোর প্রভৃতি স্থানেও গিয়েছিলেন এবং প্রায় সর্বত্রই রাজ-অতিথিরূপে সম্মানিত হ'য়েছিলেন।

তের

জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বামীজীকে নিয়ে গেলেন নিজ আলয়ে। স্বামীজীর সঙ্গে আলাপে দেওয়ান বাহাদুর তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি এতটা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও আকৃষ্ট হ'লেন যে, প্রতিদিন রাজকর্মচারী সভাপণ্ডিত ও অন্যান্য বিশিট লোকদের নিজ বাড়িতে আহ্বান ক'রে স্বামীজীর ধর্মালোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর মুখে বৈদিকধর্মের মৌলিক ব্যাখ্যা শুনে সকলেই মুগ্ধ হন। স্বামীজীও ঐ সুযোগে জনসাধারণের উন্নতির উপরই যে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে, সে সম্বন্ধে সকলের অন্তরে গভীর ছাপ দিতেন।...

তারপর স্বামীজী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ও জৈনদের মহাপবিত্র তীর্থ গির্ণার পাহাড়ে গমন করেন। প্রাচীন স্থাপত্য এবং ধর্মভাব ছাড়াও, স্থানের প্রাকৃতিক শোভা ও গাম্ভীর্য তাঁর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি ঋষি দত্তাত্রয়ের পদচিহ্ন দর্শন ক'রতে সর্বোচ্চ শিখরে (৩৩০০ ফুট) আরোহণ করেন। আনন্দ ও শান্তিতে তাঁর অন্তর ভ'রে গেল। ভারতের অতীত গৌরবের কথাও তাঁর প্রাণে কম আলোড়নের সৃষ্টি করেনি। * তিনি একটি নির্জন গুহাতে কিছু দিন ধ্যানমগ্ন রইলেন। কিন্তু ঐ গুহাতেও ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্য-মোচনের চিন্তা তাঁর অন্তরকে মথিত করেছে। তিনি ধ্যানমগ্ন হ'য়ে থাকতে পারলেন না।...ফিরে এলেন জুনাগড়ে। এবং বিভিন্নস্থানে প্রচার ক'রতে ক'রতে পোরবন্দরে উপস্থিত হলেন।

* তাঁর অন্তরে ভবিষ্যৎ ভারতসম্বন্ধে যে স্বপ্ন ছিল সে সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন,..."কিন্তু আসছে যে ভারত তা প্রাচীন ভারতের চেয়ে উন্নত হবে। যে-দিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন সেদিন থে'কেই বর্তমান ভারতে সত্যযুগের আবির্ভাব। আর তোমরা সেই সত্যযুগের উদ্বোধন করবে,—এই বিশ্বাসে কাযে অবতীর্ণ হও।"

পোরবন্দর বা সুদামা পুরীতেও তিনি রাজার অতিথি হলেন। তার প্রধান মন্ত্রী পূর্বেই স্বামীজীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে শুনেছিলেন।

পোরবন্দরে স্বামীজী কয়েক মাস অবস্থান করেন।* তথাকার দেওয়ান শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি তখন বেদের অনুবাদ করছিলেন। স্বামীজী তাঁকে অনুবাদকার্যে সাহায্য করতেন এবং তাঁর কাছে পতঞ্জলির মহাভাষ্য-পাঠ সমাপ্ত করেন। পণ্ডিতজী মহা উৎসাহের সঙ্গে তাঁকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ঐ ভাষায় তাঁর যথেষ্ট অধিকার লাভ হয়েছে দেখে পণ্ডিতজী বিশেষ প্রসন্ন হ'য়ে বললেন, "স্বামীজী, দেখবেন ভবিষ্যতে এ ভাষাজ্ঞান আপনার খুব কাজে লাগবে।"

বেদের অনুবাদকালে তাঁর অদ্ভুত ধীশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে পণ্ডিতজী বলেছিলেন, "স্বামীজী, আপনার প্রতিভা ও শক্তির মর্যাদা দেবার মতো লোক এ দেশে বিরল।...আমার মনে হয় বর্তমানে ভারত আপনার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। আপনি পাশ্চাত্য দেশে যান এবং সে দেশে আগুণ জ্বালিয়ে আসুন, তখন দেখবেন এ দেশের লোক আপনার প্রতি কথায় উঠবে বসবে। আপনি ঝঞ্ঝার মতো পাশ্চাত্য দেশ অক্রমণ করুন এবং ঐ দেশ জয় ক'রে ফিরে আসুন।"

স্বামীজী কিয়ৎকাল মৌন থেকে বললেন, "পণ্ডিতজী, একদিন প্রভাসে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে দুর চক্রবালে দৃষ্টি রেখে তরঙ্গমালার অনুপম খেলা দেখছিলাম, সহসা আমার মনে হ'ল, এই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা অতিক্রম ক'রে

---

* পরিব্রাজক জীবনেও মুখ্যতঃ "বাণী প্রচারই" ছিল স্বামীজীর কাজ। তাঁর এক চিঠিতে দেখতে পাই—"...আমার (জগৎকে) কিছু বলবার আছে। তা আমি নিজের ভাবে বলব। আমি আমার বক্তব্যগুলি হিন্দুর ছাঁচেও ঢালব না, খৃষ্টানী ছাঁচেও ঢালব না, বা অন্য কোন ছাঁচেও ঢালব না। আমি শুধু নিজের ছাঁচে ঢালব—এই মাত্র। মুক্তিই আমার ধর্ম।..."শ্রীরামকৃষ্ণজীবন ও বাণীই ছিল তাঁর বাণী।

আমাকে যেতে হ'বে কোন সুদূর দেশে। কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব হ'বে, বুঝতে পারছিনে।" পণ্ডিতজীর কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। ..

ঐ সময়ে ভারতের উন্নতিকল্পে তাঁর মন কতটা অস্থির হয়েছিল, তা রাজপুরুষ বা অন্য যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে অল্পক্ষণ আলাপেই বুঝতে পারতেন। তাঁর হৃদয়ের তন্ত্রীতে সর্বক্ষণ যেন একটি সুরই ঝঙ্কৃত হ'ত "ভারতের কল্যাণ"।

আর্য-সভ্যতার পুনরুত্থানের গভীর চিন্তা তাঁর অন্তরকে বিক্ষুব্ধ ক'রত। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহপঙ্ক থেকে ভারতের উদ্ধার-সাধনের চিন্তা তাঁকে এত ব্যথিত ক'রেছিল যে, হৃদয়াবেগে তিনি সময়ে সময়ে কেঁদে ফেলতেন। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব ক'রেছিলেন "ভারত জগতের ধর্ম-জননী—আধ্যাত্মিকতার মূল উৎস ও মানব-সভ্যতার আদি জন্মভূমি।" ভারতকে জগৎসভার শ্রেষ্ঠ আসনে বসবার জন্য তাঁর প্রাণ অস্থির। পাশ্চাত্য দেশে গমনের পরে ভারতের মাহাত্ম্য যেন তিনি আরো নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। নিউইয়র্ক থেকে (২৪শে জানুআরী '৯৫) তিনি এক চিঠিতে লিখছেন, "... শত অপূর্ণতা সত্ত্বেও সেই ভারতভূমিই একমাত্র স্থান, যেখানে আত্মা মুক্তির সন্ধান—ভগবানের সন্ধান পায়। পাশ্চাত্যের আড়ম্বর সর্বথা অন্তঃসারবিহীন ও আত্মার বন্ধনস্বরূপ।"...পাশ্চাত্য দেশের ঐশ্বর্যের মধ্যে তাঁর নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। তিনি লিখছেন, "সেই ছিন্নবস্ত্র (কৌপীন) মুণ্ডিত মস্তক তরুতলে শয়ন ও ভিক্ষান্নভোজন। হায়! এসবই এখন আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়।"...

* * *

ভারতের মহিমা স্বামীজীর অন্তরকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। তাই ভারত-ভূমির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন স্থানে অনেক কথাই বলেছিলেন, "আমাদের

পবিত্র মাতৃভূমি ধর্ম ও দর্শনের দেশ, ধর্মবীরগণের জন্মস্থান, ত্যাগের ক্ষেত্র। শুধু এই দেশেই সুদূর অতীত হ'তে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানবজীবনের মহত্তম আদর্শ-গুলি বিদ্যমান। তত্ত্বদৃষ্টি ভগবৎপরায়ণতা এবং নীতি-বিজ্ঞানের প্রসূতি এই ভারত, মাধুর্য কোমলতা ও মানব-প্রীতির আকর। এ সবই এখনো বর্ত্তমান, এবং সমগ্র জগতের অভিজ্ঞতার বলে আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, এ সকল বিষয়ে ভারত এখনো জগতের জাতিপুঞ্জের অগ্রণী। এমনই দেশের সন্তান আমরা। যখন গ্রীসের জন্ম হয় নি, রোমের কথা কেহ ভাবে নি, বর্তমান ইউরোপীয়দের পূর্বপুরুষগণ বিচিত্র অঙ্গরাগে রঞ্জিত অসভ্য অরণ্যবাসী মাত্র ছিল, সেই সুদূর যুগেও ভারত তার সংস্কৃতির সাধনায় কর্মমুখর। তারও পূর্বে, যে দূর অতীতের খবর ইতিহাসে পাওয়া যায় না, যার কুয়াসা ভেদ করতে কিংবদন্তীও সংকুচিত, সে সময় হ'তে বর্তমানকাল পর্যন্ত কত উচ্চ উচ্চ ভাব, শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী ভারত হ'তে জগতে ছড়িয়ে পড়েছে।

জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা কর—যেখানেই কোন সুমহান আদর্শের সন্ধান মিলবে, দেখতে পাবে উহার জন্ম ভারতবর্ষে।...সত্যই আমাদের মাতৃ-ভূমির কাছে জগতের ঋণ অপরিসীম।...বহু সহস্র বৎসরের বিপদ-আপদ, ঝড়-ঝাপটা সত্ত্বেও হিন্দু জাতি মরেনি কেন?...এও ধারণা করতে হ'বে যে, বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারে ভারতের কিছু দেবার আছে বলেই এদেশ এখনো বেঁচে আছে।

মানুষকে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করা—পশুস্তরের মানুষকে দেবমানবে পরিণত করা—এই মহান্ জীবনব্রত উদ্‌যাপন করতে আমাদের দেশমাতৃকা সম্রাজ্ঞীর মতই ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছেন। স্বর্গে বা মর্তে এমন কোন শক্তি নেই যা তাঁর গতি রোধ করতে পারে।...মানব জাতিকে আধ্যাত্মিক ভাবে প্রবুদ্ধ

করাই ভারতের মূল জীবনব্রত, তাঁর অস্তিত্বের পরম প্রতিষ্ঠা, চরম সার্থকতা।...বাস্তবিক যতদিন ভারতের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত থাকবে, যতদিন ভারতের জনগণ তাদের প্রাণস্বরূপ ধর্মকে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন ভারতীয় জাতির বিনাশ নেই।"...

ঐ সময় তিনি প্রাণে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরক শক্তি অনুভব করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভবিষ্য বাণী তাঁর মনে পড়ত *।

পোরবন্দর থেকে দ্বারকা। শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থল দ্বারকা আজ সমুদ্রগর্ভে। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত সারদামঠের এক নির্জন কক্ষে আশ্রয় নিয়ে স্বামীজী অধিকাংশ সময় ধ্যানস্থ থাকতেন। একদিন সমুদ্রের তীরে বসে ধ্যানকালে ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জ্বল ছবি তাঁর মনাসপটে উদিত হ'ল। আশা ও আনন্দে ভরে গেল তাঁর প্রাণ।...

অতঃপর মাণ্ডবী। তিনি নারায়ণ সরোবর, আশাপুরী ও কোটীঘর প্রভৃতি তীর্থদর্শন করলেন। পরে পালিতানায় বহু জৈন মন্দির দর্শনে ধর্মভূমি ভারতের মহিমায় তিনি বিভোর হ'য়ে উঠলেন। পালিতানার শত্রুঞ্জয় পর্বতশিখরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে বিহ্বল করে। পরে বরোদা হ'য়ে তিনি এলেন খাণ্ডোয়াতে। ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে যেন ঈশ্বর-ইচ্ছায় উপস্থিত হ'লেন স্থানীয় উকিল শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর সামনে। হরিদাসবাবু আদালত হ'তে ফিরেই দেখেন দরজার বাইরে একজন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে। সামান্য আলাপেই তিনি বুঝলেন ইনি সাধারণ সন্ন্যাসী নন ; আকৃষ্ট হ'য়ে তাঁর বাড়ীতে থাকার অনুরোধ জানালেন।

* পোরবন্দরে তাঁর গুরুভ্রাতা পরম অন্তরঙ্গ স্বামী ত্রিগুণাতীতের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'তে তিনি বলেছিলেন, "ভাই সারদা! ঠাকুর আমার সম্বন্ধে যে সব কথা বলতেন—এক্ষণে সেগুলির সত্যতা উপলব্ধি করছি।...মনে হয়, আমার ভিতর যে শক্তি আছে তাতে জগৎটাকে ওলট-পালট ক'রে দিতে পারি।"

খাণ্ডোয়াতে প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলেন স্বামীজী। সারা সহরের বিশিষ্ট লোকদের সমাবেশ হ'ত হরিদাসবাবুর বাড়ীতে। তাঁর মুখে উদ্দীপনাময় ধর্মপ্রসঙ্গ, শাস্ত্রের সরল ব্যাখ্যা ও মধুর ভজন-সঙ্গীত শুনে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হ'লেন। শিকাগো ধর্মমহাসভার বিষয় শুনে খাণ্ডোয়াতেই তাঁর মনে প্রথম ঐ সম্মেলনে যোগদানের ইচ্ছা হয়। হরিদাসবাবুর প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন, "যদি কেউ যাতায়াতের খরচ দেয়, তাহ'লে যেতে আমার আপত্তি নেই।"

খাণ্ডোয়াবাসীদের যত্ন আতিথ্য ও সহৃদয়তা উপেক্ষা ক'রে তিনি বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি এগিয়ে চলেছেন ৺রামেশ্বরের পথে। হরিদাস বাবু তাঁর ভ্রাতার নামে পরিচয়-পত্র দিয়ে বোম্বাই-এর একখানি টিকেট কিনে দিলেন।

* * *

১৮৯২ খৃঃ জুলাই মাসের শেষ দিকে স্বামীজী বোম্বাই পৌঁছে, হরিদাসবাবুর ভ্রাতার সাহায্যে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ছবিলদাসের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন বোম্বাইতে গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। নানা প্রসঙ্গের পরে স্বামীজী বললেন, "দেখ্ কালী, আমার ভিতর এত শক্তি জমেছে যে ভয় পাছে ফেটে যাই।"

অভেদানন্দ বিস্মিত হ'লেন, স্বামীজীর প্রাণের উৎকণ্ঠা তাঁকেও স্পর্শ ক'রেছিল। তিনি পরে ব'লেছিলেন, "ঐ সময়ে স্বামীজীর অন্তরে যেন আগুন জ্বলছিল। ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চিন্তা তাঁর সমগ্র হৃদয় অধিকার করেছিল। তাঁকে দেখলেই মনে হ'ত যেন একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত।"

ছবিলদাসের বাড়ীতে স্বামীজী খুবই বেদান্তচর্চা ক'রতেন। বহু গণ্যমান্য ও শিক্ষিতলোক তাঁর মুখে বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হন।* তিনি কয়েক সপ্তাহ মাত্র বোম্বাইয়ে ছিলেন। ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। অতঃপর স্বামীজী পুণায় গমন করেন। সে সময় তাঁর শরীর তত ভাল ছিল না। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাচ্ছিলেন। সেই কামরায় আরো তিন জন মারাঠী ভদ্রলোক ছিলেন। ভবঘুরে একজন সন্ন্যাসীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ ক'রতে দেখে তাঁরা অত্যন্ত বিরক্ত হ'লেন এবং নিজেদের মধ্যে ইংরেজীতে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের তীব্র সমালোচনা ক'রতে লাগলেন। ঐ তিনজন সহযাত্রীর মধ্যে একজন ছিলেন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। যাত্রীদের ধারণা ছিল যে সন্ন্যাসী ইংরেজী জানেন না। তাই তাঁরা সন্ন্যাসীদের আলোচনা ক'রে তৃপ্তিলাভ ক'রছিলেন। আত্মসুখলিপ্সু এই নিষ্কর্মা সন্ন্যাসীর

*স্বামীজী প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে যে বেদান্ত প্রচার করেছিলেন তার সংক্ষেপ পরিচয়—তাঁর একখানি চিঠিতে পাই। ৬ই মে ১৮৯৫—আলাসিঙ্গাকে লিখছেন : "...সমগ্র ধর্মটাই বেদান্তের মধ্যে আছে,—অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিনটি স্তর বা ভূমিকার ভেতর আছে। একটি আর একটির পরে এসে থাকে। এই তিনটি মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভূমিকা। এর প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে। ইহাই ধর্মের কথা। ভারতের বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার ও ধর্মমতের মধ্যে প্রয়োগের ফলে বেদান্ত যে রূপ নিয়েছে, সেটিই হচ্ছে হিন্দুধর্ম (স্বামীজী হিন্দুধর্মের পরিবর্তে 'বেদান্তধর্ম' এ শব্দটি ব্যবহার ক'রতে বলতেন)। বেদান্তধর্মেরই প্রথম স্তর—অর্থাৎ দ্বৈতবাদ ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাবের ভিতর দিয়ে দাঁড়িয়েছে খৃষ্টধর্ম, আর সেমিটিক জাতিগুলির ভাবের ভিতর দিয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান ধর্ম। অদ্বৈতবাদ উহার যোগানুভূতির আকারে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন ধর্ম বলতে বোঝায় বেদান্ত। বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন প্রয়োজনে পারিপার্শ্বিক এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে তার প্রয়োগ বিভিন্নরূপ অবশ্যই হবে। তোমরা দেখতে পাবে যে, মূল দার্শনিক তত্ত্ব যদিও এক, তথাপি শাক্ত শৈব প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষ ধর্মমত ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতির ভিতর তাকে রূপায়িত ক'রে নিয়েছে।..." এ পর্যন্ত জগতে যত ধর্মের অভ্যুদয় হ'য়েছে সবই বেদান্ত-ধর্মমূলক বা বেদান্তধর্মের বিভিন্ন শাখা বিশেষ। শাখা-ধর্মগুলির সমষ্টিস্বরূপ—বেদান্তধর্ম। ভবিষ্যতেও যত ধর্মের অভ্যুদয় হো'ক না কেন—সবই বেদান্তমূলক হ'বে। দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই তিনটি মতবাদকে অতিক্রম ক'রে কোন ধর্মমতেরই উদ্ভব হ'তে পারে না। ঐ বেদান্তমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ—সর্বভাবময় ও সর্বধর্মস্বরূপ।

দলই যে ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ এবং এদের দেশ থেকে বিদায় না ক'রলে দেশের মুক্তি নেই; এ বিষয়ে শুধু তিলক অন্যমত প্রকাশ ক'রলেন।

স্বামীজী চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন সমালোচনা চূড়ান্তে পৌঁছেছে, তখন তিনি আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। আলোচনায় যোগ দিলেন। তিনি বললেন যে, যুগে যুগে সন্ন্যাসীরাই তো জগতের আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে সতেজ ও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বুদ্ধ কি ছিলেন, শঙ্কর কি ছিলেন? তাঁদের আধ্যাত্মিক অবদান ভারত অস্বীকার করতে পারে না! অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর মুখে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্মের ক্রমবিকাশ ও দেশ-বিদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা কথা শুনে সকলেই স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। স্বামীজীর বিশুদ্ধ ইংরেজী ও অদ্ভুত প্রতিভার কাছে সহযাত্রীরা মাথা নীচু ক'রতে বাধ্য হ'লেন। লোকমান্য তিলক স্বামীজীর অগাধ পাণ্ডিত্যে বিশেষ-ভাবে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। পুণা ষ্টেশনে নামবার সময় তিনি স্বামীজীকে তাঁর বাড়ীতে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। এইভাবে স্বামীজী তিলকের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ পুণাতে অবস্থান করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য গভীর ধীশক্তি, স্বদেশ-প্রেম গরীবদুঃখীর প্রতি সমবেদনা তিলকের প্রাণে গভীর রেখাপাত করে। দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনের নূতন মন্ত্র তিনি শুনলেন স্বামীজীর মুখে।

ঐ সময়ে লিমডির রাজা মহাবালেশ্বরে রয়েছেন জানতে পেরে, স্বামীজী গেলেন রাজার সঙ্গে দেখা করতে। অপ্রত্যাশিত ভাবে গুরুদেবকে পেয়ে রাজা বিশেষ আনন্দিত হ'লেন, এবং তাঁকে নিজ রাজ্যে নিয়ে যাবার সংকল্প জানাতেই স্বামীজী বললেন, "একটা মহাশক্তি আমায় চালিত ক'রছে।... আমার গুরুদেব আমার উপর যে মহাকার্যভার অর্পণ ক'রেছেন তার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত আমার বিশ্রাম নেই।... জীবনে যদি কখনো

বিশ্রামের অবকাশ পাই তখন আপনার সঙ্গে বাস ক'রব।" স্বামীজী সে বিশ্রাম কখনো পান নি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁকে অক্লান্ত কর্ম ক'রতে হ'য়েছিল।...

* * *

স্বামীজী ক্রমে কোলাপুর মারমাগোয়া ও বেলগাঁও হ'য়ে মহীশূরের অন্তর্গত ব্যাঙ্গালোরে উপনীত হ'লেন। ছদ্মনামে তিনি রইলেন কয়েকদিন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলেন। মহীশূরের দেওয়ান স্যার কে, শেষাদ্রি আয়ার স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ ক'রে আশ্চর্যান্বিত হ'লেন। কে এ সৌম্য! সমস্ত শাস্ত্র এঁর নখদর্পণে, প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল, জ্যোতির্ময় বিশাল লোচন—যেন দেবলোকবাসী এসেছেন নরলোকে! তিনি সমাদরে কয়েকদিন স্বামীজীকে রাখলেন নিজের বাড়ীতে। ঐ সময়ের মধ্যে মহীশূরের বহু শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ঐ তরুণ যতির ঐশী শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হ'লেন। ক্রমে তাঁর কথা মহারাজা শ্রীচামরাজেন্দ্র ওয়াডীয়ারের কর্ণগোচর হ'ল। তিনি স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হ'বার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শেষাদ্রি আয়ার তাঁকে নিয়ে রাজদরবারে উপস্থিত হ'লেন। স্বামীজীকে দেখেই মহারাজা বিমোহিত হলেন। পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হ'তেই তিনি স্বামীজীকে রাজ অতিথিরূপে প্রাসাদে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং তাঁর বাসের জন্য একটি মহল ছেড়ে দিলেন। স্বামীজী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এতগুলি ঘর দিয়ে কি হবে? ভূমিশয্যা রচনা করার মতো একটু স্থান হ'লেই [illegible]"

ক'দিনের মধ্যেই অন্তরঙ্গতা বেড়ে গেল। মহারাজা এমন ত্যাগ পবিত্রতা প্রেম ও জ্ঞানের অপূর্ব সমাবেশ আর কোথাও দেখেন নি।

এক দিন প্রাসাদে পণ্ডিত মণ্ডলীর এক প্রকাণ্ড সভা আহুত হ'ল। প্রধান মন্ত্রী সভাপতি। পণ্ডিতগণ একে একে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন! স্বামীজীও অনুরুদ্ধ হ'য়ে কিছু বলবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর তেজঃপুঞ্জ চেহারা দেখে সকলেই স্তম্ভিত। তিনি বেদান্তের জটিলতার দিকে না গিয়ে অন্যান্য দার্শনিক মতের সঙ্গে বেদান্তের সামঞ্জস্য এবং ব্যক্তিগত জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ ও উপযোগিতা অতি প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিলেন সকলকে। তাঁর চিন্তার মৌলিকতা দৃষ্টির প্রসারতা ও প্রকাশন-শক্তি সকলের কাছে উচ্চ প্রশংসা পেল।...

স্বামীজীর অদ্ভুত অপরিগ্রহ সকলের অন্তর জয় ক'রে। একদিন দেওয়ান তাঁর সেক্রেটারীকে বললেন, "স্বামীজীকে নিয়ে বাজারে যাও এবং তিনি যা পছন্দ করেন তা যত দামই হোক তাঁকে কিনে দিও।" স্বামীজী বাজারে গেলেন, বালকের মতো আনন্দে সব ঘুরে ঘুরে দেখলেন, কোন জিনিষই নিলেন না। সেক্রেটারী কিছু নেবার জন্য বিশেষ জেদ ক'রতে তিনি বললেন, "আচ্ছা যদি নেহাৎ ছাড়বে না তো একটি চুরুট কিনে দাও।"

মহারাজা দিনের পর দিন খুবই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'লেন স্বামীজীর প্রতি। একদিন তিনি দেওয়ানজীর সঙ্গে স্বামীজীকে তাঁর কক্ষে ডেকে সমাদরে বসিয়ে বললেন, "যতিবর, আমি আপনার সেবা ক'রতে চাই। সে অধিকার দিয়ে আমায় ধন্য করুন।"

স্বামীজী তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত ক'রে বললেন, "দেশের কাজই আমার কাজ। দরিদ্রদের সেবাই আমার সেবা। আপনি দেশের সেবা করুন, দেশকে বড় ক'রে, সমৃদ্ধ ক'রে তুলুন! তা হ'লেই আমি খুশী হ'ব। আপনি রাজা। জনসাধারণের উন্নতি করার শক্তি সামর্থ্য আপনার আছে। গরীবদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর করুন। সম্পদে ও শিক্ষাদীক্ষায় দেশবাসীকে উন্নত

করুন।...” পরে বললেন, “আমার মনে হয় আমাদের আধ্যাত্মিকতা—বেদান্তধর্ম—পাশ্চাত্যকে শিক্ষা দিতে হবে, এবং তার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞান ও ঐহিক উন্নতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব শিক্ষা করতে হ'বে। এইভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংমিলনে নূতন সভ্যতা গ'ড়ে উঠবে। তাতেই জগতের সমূহ কল্যাণ। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মিলন-ভূমি তৈরী করতে আমি জীবন উৎসর্গ করেছি।”

স্বামীজী প্রাণের আবেগে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতা ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য পাশ্চাত্যে বেদান্তের বাণী বহন ক'রে নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রতে * মহারাজা সানন্দে সমুদয় ব্যয়ভার বহন করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু স্বামীজী বললেন, ' না এখনো সময় আসে নি। শ্রীভগবানের আদেশের জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হ'বে।”

মহীশূর ছাড়বার দিন ঘনিয়ে এল। স্বামীজী রামেশ্বর দর্শনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাজা প্রাণে বেদনা অনুভব ক'রে বললেন, “না স্বামীজী আপনাকে এখন কিছুতেই যেতে দেব না। আরো কিছুদিন থাকুন।”

কিন্তু তাঁকে সংকল্প দৃঢ় দেখে রাজা বিনীত প্রর্থনা জানালেন “আপনার একটা-কিছু স্মৃতিচিহ্ন রাখতে চাই। অনুমতি করেন তো আপনার কণ্ঠস্বর রেকর্ড ক'রে রাখব। যাতে আপনার প্রাণোন্মাদী স্বর আমাদের কানে বাজতে থাকে।”

* ১৮৯২, ২০শে সেপ্টেম্বরে লিখিত একখানি পত্রে স্বামীজীর তৎকালীন চিন্তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। “...সুতরাং আপনি বুঝতে পারছেন আমাদিগকে বিদেশে যেতেই হ'বে। আমাদের দেখতে হ'বে অন্যান্য দেশের সমাজযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হচ্ছে। আর যদি আমাদিগকে পুনরায় এক জাতিরূপে পরিণত হ'তে হয়, তা হ'লে অপর জাতির চিন্তার সঙ্গে আমাদের অবাধ সংস্রব রাখতে হ'বে।...সর্বোপরি আমাদের দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে হ'বে।...হে প্রভু, কবে মানুষ অপর মানুষকে ভাইয়ের মত দেখবে ?”

রাজী হলেন স্বামীজী, রেকর্ড তোলা হ'ল। ঐ রেকর্ডটি মহীশূর রাজ-প্রাসাদে দীর্ঘকাল রক্ষিত ছিল।

রাজা স্বামীজীকে গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন। একদিন বললেন, "স্বামীজী আপনার পাদপূজা করব।" কিন্তু স্বামীজী কিছুতেই রাজী হলেন না।... অনেক মূল্যবান উপঢৌকন দিতে চাহিলেন। তারও কিছুই তিনি গ্রহণ করলেন না। বললেন, "রাজন্। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি পরিব্রাজক অবস্থায় অর্থ স্পর্শ করব না, কিছু সঞ্চয় করব না। আমি সামান্য সন্ন্যাসী। উপঢৌকন নিয়ে কি করব, কোথায় রাখব?"

কিন্তু রাজা কিছুতেই ছাড়লেন না। তখন স্বামীজী রাজার তৃপ্তির জন্য বললেন, "আচ্ছা, ধাতু-সম্পর্কহীন একটি সাধারণ হুঁকো দিন।" মহারাজা রোজউড-নির্মিত একটি হুঁকা তাঁকে উপহার দিলেন।

যাত্রার প্রাক্কালে প্রধান আমাত্য স্বামীজীর হাতে একতাড়া নোট গুঁজে দিলেন। তিনি কিছুতেই নেবেন না। শেষটায় বললেন, "কোচিনের একখানি টিকেট কিনে দিন। ২।৪ দিন কোচিনে থাকতে পারি।"

একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট ও কোচিনের তৎকালীন দেওয়ান শ্রীশঙ্করাইয়ার নামে পরিচয়-পত্র দিলেন প্রধান অমাত্য।

চৌদ্দ

১৮৯২, ডিসেম্বর মাসে কোচিন হ'য়ে স্বামীজী ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবেন্দ্রামে এলেন। স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল। এখানেও মহারাজা ও দেওয়ান প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর

প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় সমস্যাই তাঁর প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি-বর্গের উপর তাঁর চিন্তার প্রভাব পড়েছিল বিশেষ ক'রে।

ঐ প্রসঙ্গে ত্রিবাঙ্কুরের এস, কে, নায়ার লিখেছেন, "...স্বামীজীর সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, তাঁরা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় আকৃষ্ট না হ'য়ে থাকতে পারেন নি। একসঙ্গে বহুব্যক্তির বহুপ্রশ্নের উত্তরপ্রদানের তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। স্পেন্‌সার সেক্সপীয়ার কালিদাস, ডারউইনের বিবর্তনবাদ, ইহুদী জাতির ইতিহাস, আর্য-সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বা বেদবেদান্ত মুসলমান বা খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্র—কোন বিষয়েই তাঁকে পশ্চাৎপদ দেখা যে'ত না। যে কোন প্রশ্ন হো'ক তার ঠিক জবাবটি তাঁর মুখে লেগেই আছে। তাঁর মুখাবয়বে সরলতা ও মহত্ত্ব স্পষ্ট লেখা ছিল। নির্মল হৃদয় তপস্যাপূত জীবন, উদার বুদ্ধি উন্মুক্তচিত্ত, অসংকীর্ণ দৃষ্টি ও সর্ব-প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।"

স্বামীজী নয় দিন মাত্র ছিলেন ত্রিবাঙ্কুরে। পরে তিনি যাত্রা ক'রলেন রামেশ্বর-অভিমুখে। পথে মাদুরায় রামনাদরাজ ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে দেখা হয়। অল্প দিনেই ঐ উচ্চশিক্ষিত রাজা স্বামীজীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'য়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্বামীজী কিন্তু রাজসম্মান লাভ করার জন্য যান নি। তিনি বর্তমান ভারতের সমস্যাগুলি ও তাদের সমাধানের দিকে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলেন। জনসাধারণের উন্নয়নের ভার চাপালেন রাজার স্কন্ধে। রামনাদরাজ স্বামীজীর শক্তি সম্বন্ধে এত বিশ্বাসী হ'লেন যে, তিনি তাঁকে শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যোগদানের অনুরোধ জানিয়ে অর্থ-সাহায্য ক'রতে প্রতিশ্রুত হ'লেন।

সে সব ভবিষ্যতের গর্ভে সঞ্চিত রইল। তিনি ৺রামেশ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছেন। রামায়ণে বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতিজড়িত রামেশ্বর তীর্থ

দর্শন ক'রে তিনি বিশেষ আনন্দিত হন। বিরাট মন্দির, যাত্রি-কোলাহল, দেবতার পূজা অর্চনা সবই দেখলেন, কিন্তু তাঁর দুশ্চিন্তার লাঘব হ'ল না। ভারতের উন্নতি, ভারতবাসীদের সেবা তাঁর জীবনব্রত। অশান্তির ভার বহন ক'রে তিনি চললেন ভারতের শেষ প্রান্তে কন্যাকুমারীর মন্দিরের দিকে। কপর্দকহীন পরিব্রাজকরূপে তিনি উপনীত কন্যাকুমারীতে। দেবীদর্শনে তাঁর অন্তর পুলকিত হ'ল। মা যেন প্রসন্না হয়েছেন। তিনি ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে দেবীর চরণে প্রণাম করলেন। এক অনির্বচনীয় আনন্দে তাঁর মনপ্রাণ ভ'রে গেল। মা যেন তাঁর অন্তরের সব ভার লঘু ক'রে দিলেন।...

তুষারকিরীটী হিমালয় থেকে তিনি নেমে এসেছেন সর্বদক্ষিণ প্রান্তে ভারতের মৃত্তিকা স্পর্শ করতে করতে। অখণ্ড ভারতে সনাতন বৈদিক ধর্মের যে চিন্তাধারা চারিদিকে লুপ্ত প্রায় হ'য়ে প'ড়েছিল, তিনি তা আয়ত্ত করেছেন। কত দেবদেবী ও মন্দিরাদি দর্শন করেছেন, কত সাধুমহাত্মার সঙ্গলাভ হয়েছে। রাজপ্রাসাদ ও পর্ণকুটীরে কত স্তুতি বা তিরস্কার তিনি ভোগ ক'রেছেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জর্জর হ'য়ে কত বৃক্ষতলে নিয়েছেন আশ্রয়। সব কিছুর সঙ্গে তিনি নিজেকে এক ক'রে নিয়েছিলেন। সর্বত্রই তিনি অনুভব ক'রেছেন অখণ্ড ভারতের প্রাণস্পন্দন; সর্বত্র শুনেছেন—আর্য ঋষিদের শাশ্বতবাণী। সর্বোপরি তিনি অনুভব ক'রেছিলেন, কোটি কোটি দরিদ্র পদদলিত—জাতির মেরুদণ্ড-স্থানীয় সাধারণ লোকের দারুণ অসহায় অবস্থার কথা। কোন ঋষি যেন বলছেন—"সমাজ-জীবনে সকলের সমানাধিকার। গুণগত বর্ণ-বিভাগের স্থান অধিকার ক'রেছে কৃত্রিম জাতিভেদ—যা জাতির অধঃপতনের কারণ হ'বে। তাকে দূর ক'রতে হ'বে ধর্মের উচ্চতত্ত্বের সহায়তায়।"

অন্তরে শত চিন্তা নিয়ে দেবীমন্দিরের চত্বরে এক শিলাখণ্ডের উপর ব'সে

তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন হ'লেন।* তাঁর ধ্যানাবগাহী চিত্তে অতীত ভারতের উত্থানপতনের এবং ভবিষ্য ভারতের সাত আটশ' বৎসরের উজ্জ্বল চিত্র উদ্ভাসিত হ'ল। তিনি নূতন আলোক পেলেন। পেলেন পথের সন্ধান। অন্তরে শুনতে পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধিরূপে তিনি পাশ্চাত্যদেশে গমনের সংকল্প ক'রলেন। সেখানে বিশ্বমানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার ক'রবেন, সুপ্ত মানবাত্মাকে সম্বুদ্ধ ক'রবেন।

ভারতমাতার সেবকরূপে শান্তিস্নাত স্বামীজী ধ্যান হ'তে উঠলেন। "আমার ভারতবর্ষ—আমার প্রিয় ভারতবাসী"—ব'লতে ব'লতে তাঁর নয়নদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হ'ল। এক অব্যক্ত আনন্দে নেচে উঠল তাঁর অন্তর। দেববলে বলীয়ান হ'লেন তিনি।

* * *

কন্যাকুমারী পরিত্যাগ ক'রে রামানাদের ভিতর দিয়ে স্বামীজী উপনীত হ'লেন ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীতে। অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েকটি শিক্ষিত যুবক তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হ'ল। সে সুযোগে তিনি তথায় কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেন। পাণ্ডিচেরীতে একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে

* মতান্তরে—দেবীদর্শনের পরে তিনি মন্দির হ'তে বের হ'য়ে অনতিদূরে সমুদ্র-মধ্যে এক শিলা দেখতে পেয়ে সাঁতার দিয়ে ভারতের শেষ প্রস্তরখণ্ডের উপর ব'সে তথায় ধ্যানমগ্ন হ'য়েছিলেন। পরবর্তিকালে পাশ্চাত্যদেশ হ'তে তিনি গুরুভ্রাতাদের লিখেছিলেন, "কুমারিকা অন্তরীপে মা কুমারীর মন্দিরে ভারতবর্ষের শেষ প্রস্তরখণ্ডের উপর ব'সে ভাবতে লাগলাম—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে দর্শন (metaphysics) শিক্ষা দিচ্চি—এ সব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম হয় না—গুরুদেব বলতেন না? এই যে গরিবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা।..." ইত্যাদি

ভারতের দুর্গতদের উদ্ধারের শতচিন্তা তাঁর অন্তরে উদিত হ'ল। অনাহারে শীর্ণ—"ছিন্নবসন যুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিত নরনারী বালকবালিকাগণের" পাংশুল মুখগুলি স্বামীজীর মানসপটে জীবন্তরূপে আনাগোনা করতে লাগল। অশ্রুসিক্ত বিবেকানন্দ দেশমাতৃকার চরণে প্রণাম ক'রে সংকল্প করেছিলেন, "জননি! আমি মুক্তি চাইনে। তোমার সেবাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।"

সমুদ্রযাত্রা ও সারা বিশ্বে বৈদিকধর্ম প্রচার সম্বন্ধে বেশ কৌতুকপ্রদ আলোচনা হ'য়েছিল। তিনি যখন বললেন যে, সমুদ্রযাত্রায় শাস্ত্রের তো কোন নিষেধ নেই, তখন ব্রাহ্মণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হ'য়ে বললেন, "কদাপি ন, কদাপি ন" কখনই হ'তে পারে না। ম্লেচ্ছরা* ধর্মের কি বুঝবে? তাদের সংস্পর্শে জাতি-নাশ হবে মাত্র!"

ব্রাহ্মণের সংকীর্ণতা স্বামীজী খুব উপভোগ করেছিলেন। তিনি সঙ্গী যুবকদের লক্ষ্য ক'রে বললেন, "তোমরা দেখলে তো, হিন্দুধর্ম কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে! সনাতন বৈদিক ধর্মকে এখন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের সংকীর্ণ অঙ্গন থেকে মুক্ত ক'রে স্থাপিত ক'রতে হ'বে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের উপর এই গুরু-দায়িত্ব অর্পিত।"...

পণ্ডিচেরী হ'তে মাদ্রাজের পথে স্বামীজীর সঙ্গে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের ডেপুটি একাউটেণ্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের দেখা হ'ল। পূর্ব হ'তেই পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। মন্মথবাবুর বিশেষ অনুরোধে স্বামীজী তাঁর অতিথিরূপে তাঁরই সঙ্গে এলেন মাদ্রাজে। কয়েকদিনের মধ্যেই সহরে একটা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ আসতে লাগল দলে দলে। সকলেই তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে চমৎকৃত। বেদবেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি যে বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে প্রমাণিত হ'তে পারে তা সকলে প্রথম অনুভব করল। চতুর্বেদ হ'তে আরম্ভ ক'রে বেদান্ত-দর্শনের উচ্চতম দার্শনিক চিন্তা এবং আধুনিক কাণ্ট হেগেল, শিল্পকলা কাব্য সঙ্গীতবিদ্যা নীতিশাস্ত্র যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার, রাজনীতি সমাজনীতি সব কিছুতেই তিনি করতেন নূতন আলোকসম্পাত।

* স্বামীজী ব'লেছেন—"যেদিন 'ম্লেচ্ছ'শব্দ আবিষ্কৃত ও বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সংযোগ বন্ধ হয়েছে, সেদিন থেকেই ভারতের ভাগ্যবিপর্যয় আরম্ভ হ'য়েছে।"

মাদ্রাজবাসীদের উপর স্বামীজীর বিপুল প্রভাব সম্বন্ধে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন, "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট মুণ্ডিতমস্তক মনোহর রূপসম্পন্ন গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসী, ইংরেজী ও সংস্কৃত অনর্গল বলতে অভ্যস্ত, প্রত্যেক প্রশ্নের চোখা চোখা জবাব দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা, সঙ্গীত বিদ্যায় এরূপ অভ্যস্ত যে, কণ্ঠ হ'তে অতি সহজভাবে পুরু মধুর সুর নির্গত হ'য়ে যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরাত্মার সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এদিকে সর্বত্যাগী নিঃসম্বল পরিব্রাজক মাত্র। বলিষ্ঠ সাহসী, উচ্চাঙ্গের পরিহাস-কুশল পুরুষ, তথাকথিত মহাত্মাগণের পদানুসরণে প্রতিষ্ঠিত অলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠায়ী সম্প্রদায়সমূহের উপর বিজাতীয় ঘৃণাসম্পন্ন—ঐ সন্ন্যাসী বহু ব্যক্তির হৃদয়ে অবিনাশী-বিশ্বাসের অনল জ্বালিয়ে ছিলেন।"...

মন্মথবাবুর বাড়িতে রোজ সভা বসে। আসে কত বালক-যুবা-বৃদ্ধ, পণ্ডিত মুর্খ ধনী নির্ধন, পদস্থ ব্যক্তি, আবার হিন্দু খ্রীষ্টান নাস্তিক। তাঁর মুখে বেদান্তের নূতন বাণী শুনে সকলে স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। একদিন স্বামীজী আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁর পাশ্চাত্য দেশে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রলেন—"এখন বৈদিক ধর্মকে সমুদয় জগদ্বাসীর নিকট প্রচার করবার সময় এসেছে। ঋষিদের এই ধর্মকে আর সংকীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে বেঁধে রাখলে চলবে না। তাকে পুনঃ সংস্কার ক'রে জগতের সামনে বের করতে হ'বে এবং পূর্ণ উদ্যমে এ ধর্মের মহিমা চারিদিকে প্রচার করতে হ'বে।" স্বামীজী তা-ই করেছিলেন। বেদান্ত ধর্মের রত্ন-পেটিকাকে উন্মুক্ত ক'রে বিতরণ করেছিলেন অকাতরে। পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্তে বেদান্তের মহিমা বিঘোষিত করেছিলেন।

মাদ্রাজের ভক্তগণ স্বামীজীর পাশ্চাত্য দেশে গমনের ইচ্ছা জানতে পেরে টাকা সংগ্রহে লেগে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে সংগৃহীত হ'ল পাঁচশত টাকা। স্বামীজী ঐ টাকা দেখে উৎফুল্ল হলেন না। তিনি বললেন, "বৎসগণ! আমি

অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার পূর্বে ভগবানের ইচ্ছা জানতে চাই। যদি আমার পাশ্চাত্য-গমন তাঁর অভিপ্রেত হয়, তাহ'লে অর্থ আপনিই আসবে। তোমরা এ অর্থ দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ কর।"

তাঁর আদেশ পালন করতে হ'ল। ঐ টাকা বিতরিত হ'ল গরিবদের মধ্যে। তিনি জগজ্জননীর চরণে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। লোকশিক্ষা ও প্রচারের বিরাম নেই। মাদ্রাজ সহর ভেঙ্গে দলে দলে লোক আসছে তাঁর কাছে। তাঁর যশোরাশি ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের অধিবাসিবৃন্দ স্বামীজীর অভ্যর্থনার জন্য একটি কমিটি গঠন ক'রে তাঁকে হায়দ্রাবাদে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি সম্মত হ'লেন এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৮৯৩) কমণ্ডলু হাতে হায়দ্রাবাদ ষ্টেশনে নামলেন। পাঁচ শতের অধিক লোক তাঁর অভ্যর্থনার জন্য সেখানে সমবেত। মহাসম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহ, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, রাজ-পরিষদ উকিল প্রফেসার শিক্ষক, ধনী বনিকরা, সকলেই এসেছেন। রাজ-সম্মানে পরিব্রাজকাচার্যকে স্বাগত জানালেন।

স্বামীজীর বাসস্থান লোকে লোকারণ্য! শত শত লোক তাঁর দর্শন ও উপদেশ-প্রার্থী হ'য়ে সর্বক্ষণ ভিড় ক'রে থাকে। ১১ই প্রাতঃকালে সহরের একশত বিশিষ্ট নাগরিক দুধ ফল মূল মিষ্টান্নাদি নিয়ে তাঁকে বরণ ক'রে একটি বক্তৃতা দেবার অনুরোধ জানালেন। সকলের আগ্রহে তাঁকে রাজী হ'তে হ'ল। ১৩ই মহবুব কলেজে সহস্রাধিক বিশিষ্ট লোক সমবেত। বহু শ্বেতাঙ্গও উপস্থিত। পণ্ডিত রতনলাল সভাপতি। স্বামীজীকে দেখেই সকলে শ্রদ্ধান্বিত হ'লেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"My Mission in the West"—আমার পাশ্চাত্য দেশে গমনের উদ্দেশ্য। তাঁর বিশুদ্ধ ইংরেজী গভীর পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা সকলের বিস্ময়ের বস্তু হ'ল। তিনি হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে বললেন। হিন্দুসভ্যতার উৎকর্ষের দিনে ভারতের শিক্ষা ও সাধনা কতটা উন্নত ছিল তা

দেখালেন। বৈদিক ও পরবর্তী যুগের উত্থানের ইতিহাস বর্ণনা করে বর্তমান অধঃপতনের* চিত্র উপস্থাপিত করলেন। সর্বশেষে তিনি পাশ্চাত্য দেশে গমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রে বললেন যে, সনাতন বৈদিক ধর্মের লুপ্তগৌরব-উদ্ধারের সংকল্প নিয়ে তিনি ধর্ম-প্রচারকরূপে পাশ্চাত্য দেশে যেতে চান।

* ভারতের জাতীয় জীবনে বর্তমান অধঃপতনের কারণ সম্বন্ধে স্বামীজীর বহু উক্তি পাওয়া যায়। সমাজের নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রপরিচালকদের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হ'লে জাতীয় জীবন ব্যাধিমুক্ত হ'য়ে সুস্থ ও সবল হ'তে পারে। এ অধঃপতনের জন্য আমরাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। আমরা আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে উপেক্ষা করেছি। স্বামীজী বলছেন, "আজকাল অনেকেই মনে করেন যে, অতীতের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি ব্যক্তিরা মারাত্মক ভুল কচ্ছেন।...আমার কিন্তু মনে হয়, ইহার ঠিক বিপরীত ধারণাটি সত্য। হিন্দুজাতি যতদিন স্বীয় অতীত কীর্তি বিস্মৃত হয়েছিল, ততদিন তার যেন ছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা। আর বর্তমানে যেই তাদের দৃষ্টি পুরাকালের দিকে প্রসারিত হ'তে আরম্ভ করেছে, অমনি দিকে দিকে একটা নব জীবনের সাড়া পড়ে গিয়েছে।...ভারতের এই অবনতির অন্যতম কারণ আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও কর্মক্ষেত্রের সংকোচন।. আমার দৃঢ় বিশ্বাস. কোন ব্যক্তি বা জাতি অপরের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জন ক'রে টিকে থাকতে পারে না। সমাজের চতুর্দিকে লোকাচারের যে অলঙ্ঘ্য প্রাচীরটি গড়া হয়েছিল, তা-ই ভারতের বর্তমান অবনতির অন্যতম মূল কারণ ব'লে আমি মনে করি। পুরাকালে চারিপাশের বৌদ্ধ জাতির সংস্পর্শ হ'তে হিন্দুসমাজকে বাঁচাবার জন্য ওরূপ করতে হয়েছিল।" তাঁর মতে—'গণদেবতার অনাদর এবং নারী জাতির অমর্যাদা ও অধঃপতনের অন্যতম কারণ। তিনি বলেছেন, "...যতদিন না ভারতের অনভিজাত জনসমাজ সমাদৃত হচ্ছে, যতদিন না তাদের জন্য উপযুক্ত খাদ্য, শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা হচ্ছে, ততদিন আমাদের যাবতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ নিষ্ফল হবে, এদেশের উন্নতি সম্ভব হ'বে না।...প্রাচীন স্মৃতিকার মনু বলেছেন, "নারীর সম্মানে দেবতারা তৃপ্ত হন।" অথচ আমাদের চিন্তাধারা এতই কলুষিত যে, আমরা স্ত্রীজাতিকে বলি—"ঘৃণ্য কীট", "নরকের দ্বার" ইত্যাদি।...বেদান্ত ঘোষণা করে—সকল জীবে একই চেতন আত্মা বিরাজমান! অথচ এই দেশে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এত পার্থক্য করা হয় কেন, বুঝা কঠিন। স্ত্রীজাতির সমালোচনা করা তোমাদের মজ্জাগত অভ্যাস, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাদের উন্নয়নের জন্য তোমরা কী করেছ?...কিন্তু জগজ্জননী আদ্যাশক্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি নারীগণের অবস্থার উন্নতিসাধন না ক'রলে ভেবো না যে, তোমাদের অগ্রগতির অন্য কোন উপায় আছে।. দৈহিক দুর্বলতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, তামসিকতা, কর্মবিমুখতা, এবং স্বাবলম্বন আজ্ঞানুবর্তিতা, মানব-প্রীতি ও সংগঠন-শক্তির একান্ত অভাবের দিকেও স্বামীজী দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি খুব দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, "...বস্তুতঃ আমরা অলস, কর্মবিমুখ, সংহতি সাধনে অক্ষম, ভ্রাতৃপ্রেমবর্জিত স্বার্থান্ধ মানুষ। পরস্পরকে ঘৃণা বা হিংসা না ক'রে আমরা এমন কি, তিনটি ব্যক্তিও একজোট হ'তে পারিনে।...সংগঠন ক্ষমতা আমাদের ধাতে একেবারে নেই। কিন্তু তা আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রবিষ্ট করাতেই হ'বে।..."

সভান্তে অনেকেই টাকা দিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। ভগবানের আদেশের জন্য তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। বক্তৃতার পরেও তিনি চার দিন নবাব আমীর ওমরাহ ও সর্বশ্রেণীর জনগণের মধ্যে ধর্মের শাশ্বতবাণী প্রচার করেন। সর্বত্রই বিশেষ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হ'ল। তিনি ছিলেন সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক, অমৃতের অধিকারী। তাঁর জীবন প্রদীপ থেকে শত শত প্রাণে তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন ধর্মের আলোক-শিখা। তাঁর ধর্মানুরাগ ত্যাগ ও জ্বালাময়ী বাগ্মিতা হায়দ্রাবাদবাসীদের অন্তরে গভীর রেখাপাত ক'রেছিল।...

১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করেন।* তাঁর জ্বলন্ত ভারত-প্রেম মাদ্রাজবাসীদের অন্তরে আকুল প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলল। তিনি বিপুলভাবে সংবর্ধিত হ'লেন। স্বামীজীকে কেন্দ্র ক'রে মাদ্রাজবাসীদের একটি বড় দল গ'ড়ে উঠেছিল, যাঁরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ অনুরক্ত ছিলেন।

খুব উৎসাহের সঙ্গে মাদ্রাজের ভক্তগণ চাঁদা তুলতে লাগলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমার যাওয়া যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয় তো আমি জনসাধারণের ও দীনদুঃখীদের পক্ষ হ'তেই যাব। তোমরা বড়লোকের কাছ থেকে টাকা নিও না।"

মার্চ মাস এভাবে কেটে গেল। প্রতিদিন নূতন নূতন লোক আসে তাঁর বাণী শুনবার জন্য। এদিকে তাঁর অন্তর শ্রীভগবানের আদেশের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হ'য়েছে। তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে চিঠি লিখে তাঁর আশীর্বাদ

---

* উদ্বোধন আফিস হ'তে প্রকাশিত স্বামীজীর পত্রাবলী—১ম ভাগ ৬০নং পত্রে দেখা যায়—তিনি ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৮৯৩) তারিখে হায়দ্রাবাদ থেকে সচ্চিদানন্দ নামে তাঁর মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গাকে লিখছেন: "কয়েক দিনের মধ্যেই দু-এক দিনের জন্য মাদ্রাজে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে ব্যাঙ্গালোরে যাব।" এতে বোঝা যায়, তিনি ২১শে ফেব্রুয়ারীর পরে মাদ্রাজে গিয়েছিলেন।

ভিক্ষা করার সংকল্প ক'রলেন। এমন সময় এক অচিন্তনীয় উপায়ে তিনি জানতে পারলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ। একরাত্রে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন, শ্রীঠাকুর জ্যোতির্ময় দেহে সমুদ্রতীর হ'তে বারিরাশি অতিক্রম ক'রে চলেছেন এবং স্বামীজীকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করছেন। ঐ দর্শনের পর এক অনির্বচনীয় আনন্দে তাঁর প্রাণ ভ'রে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী শুনলেন, "যাও"। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা জানতে পেরে তিনি পাশ্চত্যদেশে গমনের সংকল্পে দৃঢ় হ'লেন।

পরিব্রাজকরূপে বের হ'বার সময় তিনি শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা ক'রেছিলেন। সমুদ্রযাত্রার পূর্বেও তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাদ প্রার্থনা ক'রে একখানি চিঠি লিখলেন। ঐ চিঠিতে তিনি শ্রীঠাকুরের আদেশের কথা জানাননি এবং তাঁর পাশ্চাত্যদেশে গমনের কথা গোপন রাখতেই মা'কে অনুরোধ ক'রেছিলেন।

দীর্ঘদিন পরে প্রাণপ্রতিম নরেনের চিঠি পেয়ে শ্রীমা বিশেষ আনন্দিত হ'লেন। কিন্তু সন্তানের বিরহ-ব্যথা তাঁর অন্তরকে বিক্ষুব্ধ ক'রল। এক রাত্রে শ্রীমা'ও অনুরূপ স্বপ্ন দেখলেন—ঠাকুর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন, আর নরেনকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত ক'রছেন। শ্রীঠাকুরের ইচ্ছা জানতে পেরে শ্রীমা প্রাণভরা আশীর্বাদ জানিয়ে চিঠি লিখলেন, "যাও বাবা, তোমার মুখে সরস্বতী বসুক—তুমি সর্বত্র বিজয়ী হ'য়ে ফিরে এসো।"

শ্রীমা'র চিঠি পেয়ে স্বামীজী আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে শিষ্যদের ডেকে ব'ললেন, "আঃ, এতক্ষণে সব ঠিক হ'ল। শ্রীশ্রীমা'র আদেশ পেয়েছি।" তড়িৎবেগে সে সংবাদ ছড়িয়ে প'ড়ল সমগ্র মাদ্রাজে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই সমুদ্রযাত্রার বন্দোবস্ত সব ঠিক হ'য়ে গেল। যাত্রার দিন স্থির হ'ল ৩১শে মে, বোম্বাই থেকে।

দু' বৎসর পূর্বে খেতড়ির রাজাকে স্বামীজী পুত্রলাভের আশীর্বাদ ক'রেছিলেন। রাজার একটি পুত্রসন্তান হ'য়েছে। সমগ্র খেতড়ি উৎসব-মুখরিত। রাজপুত্রকে আশীর্বাদ করবার জন্য স্বামীজীকে আনাতে রাজা ব্যস্ত হ'লেন এবং তাঁর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী জগমোহনলালকে পাঠালেন মাদ্রাজে। জগমোহনলালের প্রস্তাব শুনে স্বামীজী বললেন, "দেখ জগমোহন, ৩১ মে আমেরিকা যাত্রার স্থির হয়েছে। এখন কি ক'রে যাই, বল ?" স্বামীজীর কোন আপত্তি না শুনে সেক্রেটারী বললেন, "অন্ততঃ একটি দিনের জন্যও চলুন। আপনি না গেলে রাজাজীর প্রাণে খুব কষ্ট হ'বে। হয় তো বা তিনি নিজেই হাজির হ'বেন। আমেরিকা যাত্রার সব ব্যবস্থা আমরাই ক'রে দেব।" স্বামীজীকে অগত্যা যেতে হ'ল।...

মাদ্রাজের শিষ্যদের আশীর্বাদ ক'রে এবং তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বামীজী খেতড়ি যাত্রা ক'রলেন। পথে বোম্বাই ও জয়পুরে নেমেছিলেন। আবুরোড ষ্টেশনে অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার সংকল্প জানিয়ে কথাপ্রসঙ্গে তুরীয়ানন্দকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "হরিভাই! আমার হৃদয়টা বেজায় বেড়ে গিয়েছে। আমি অন্তরে লোকের দুঃখকষ্ট অত্যন্ত অনুভব করছি।"—বলতে বলতে কম্পিত হাত দু'টি বুকের উপর রেখে তিনি অশ্রু-বিসর্জন ক'রতে লাগলেন।

গুরুভ্রাতৃদ্বয় তাঁর বিশাল হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে অভিভূত হ'লেন। স্বামীজীর অশ্রু-বিসর্জন ব্যর্থ হ'বার নয়। জগতের গরিবদের জন্য তিনি যে চোখের জল ফেলেছেন তার প্রত্যেকটি অশ্রুবিন্দু সার্থক হ'বে। অসংখ্য হৃদয়কে উদ্দীপ্ত ক'রবে, শত শত প্রাণ করবে করুণাদ্রব। তাদের দারিদ্র্যের প্রতিকার হ'বে।...

তিনি খেতড়িতে এলেন। রাজার প্রাণ আনন্দে উথলে উঠল। রাজ্যমধ্যে আনন্দের সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। স্বামীজী নবজাতককে আশীর্বাদ ক'রলেন, আর সকলকেও আশীর্বাদ করলেন। খেতড়িতে কয়েকদিন অবস্থান ক'রে সকলকে আনন্দ দিয়ে তিনি যাত্রা করলেন বোম্বাই অভিমুখে।* রাজার সেক্রেটারী জগমোহনলাল সঙ্গে এসেছেন। তিনি বোম্বাই এসে স্বামীজীকে মূল্যবান গৈরিক পরিচ্ছদে ভূষিত করলেন এবং যাত্রার সব বন্দোবস্ত ক'রে সঙ্গে কিছু অর্থও দিলেন। তাঁর কোন আপত্তিই টিকল না।

মাদ্রাজ থেকে তাঁর প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলও এসেছেন। পি, এণ্ড ও কোম্পানীর পেনিন্‌সুলার নামক জাহাজের প্রথম শ্রেণীর টিকেট কেনা হ'য়েছে। ১৮৯৩ সালের ৩১শে মে, জাহাজ ছাড়ল।† জগমোহনলাল ও আলাসিঙ্গা তাঁকে তুলে দিতে এসেছেন। দু'জনেই কাঁদতে লাগলেন। স্বামীজীর চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। মাতৃভূমির আকর্ষণ তাঁর প্রাণকে ব্যাকুল ক'রেছে। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে দু' হাত বুকের উপর রেখে তিনি হৃদয়াবেগ চাপবার চেষ্টা ক'রলেন—"হায়! আমার ভারতবর্ষ।"

পনর

ডেকে দাঁড়িয়ে অনিমেষ নয়নে তিনি ভারতের তটভূমির দিকে তাকিয়ে

* স্বামীজীর পত্রাবলীতে পাওয়া যায়—২৭শে এপ্রিল, ১৮৯৩, তিনি খেতড়ি থেকে নগেন্দ্র রায়কে চিঠি লিখছেন। তাতে বোঝা যায় তিনি ঐ তারিখের মধ্যে খেতড়িতে পৌঁছেছেন। আবার ১৮৯৩, ২২শে মে বোম্বাই থেকে দেওয়ানজী সাহেবকে চিঠি লিখেছেন। অর্থাৎ তার পূর্বেই বোম্বাই পৌঁছে গিয়েছেন। ৩১শে মে তিনি জাহাজ ধরেন।

† স্বামী বিবেকানন্দের সমুদ্র-যাত্রা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঐ সম্বন্ধে ১৯০৯ খ্রীঃ "কর্মযোগিন" পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন, ''বিবেকানন্দের বিদেশ-যাত্রা দ্বারা এই সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট সূচিত হয় যে, ভারত শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জাগে নাই; পরন্তু আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জগৎ জয় করিবার জন্যও ভারতকে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।''

রইলেন। তার মহিমময় ভারতবর্ষ! হায়, পরাধীন পরপদদলিত ভারতবর্ষ! ভারতের শত চিন্তা তাঁর অন্তর অধিকার ক'রল। তিনি অধীর হ'য়ে পড়লেন। বরাহনগর মঠ ও গুরুভাইদের চিন্তাও তাঁর প্রাণকে কম আকুল করেনি।

জাহাজ বোম্বাই হ'তে সিংহল পিনাং সিংগাপুর ও হংকং-এর পথে এগিয়ে চলেছে। তারপর ক্যান্টন নাগাসাকি ওসাকা কিওটো ও টৌকিও দেখে তিনি স্থলপথে ইয়োকোহামায় এলেন। সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলির উপর প্রাচীন আর্যসভ্যতার প্রভাব কতটা পড়েছিল, তা তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য ক'রে আসছিলেন এবং এশিয়ার আধ্যাত্মিক ঐক্য সম্বন্ধেও তিনি স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লেন। জাপানের বর্তমান যুগোপযোগী সর্বতোমুখী উন্নতি তাঁর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে স্বাধীন জাপান পাশ্চাত্য জাতিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কী আশ্চর্য উন্নতি করেছে! তখন মুষ্টিমেয় জাপানী, ৪০ কোটি চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে যে জয়ী হয়েছিল, তাতে তাদের আত্মবিশ্বাস ও সংহতি-শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায় এবং সংহতির জয়ই হয় ঘোষিত *। চীনে তখন একতার একান্ত অভাব—অন্তর্বিপ্লব।...

সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমির ব্যাধিগুলির বিষয় চিন্তা ক'রে তাঁর প্রাণ বিশেষ ভারাক্রান্ত হয়েছিল। ইয়োকোহামা হ'তে মাদ্রাজী শিষ্যদের তিনি লিখছেন, "জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথার যে উদয় হচ্ছে তা একটি সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ ক'রে বলতে পারিনে। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাক।

* স্বামীজী কিন্তু বলেছিলেন যে, সাময়িক ভাবে জাপানের কাছে চীন পরাজিত হ'লেও, চীন-ই এক বিরাট বিশ্বশক্তি হ'য়ে উঠবে। রুশরাও প্রচণ্ড শক্তিশালী হ'বে। চীন ও রুশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে স্বামীজীর ভবিষ্যদ্‌-বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হ'তে চলেছে। আর পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক সভ্যতা যে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে তাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার। জাপানীদের কাছে ভারত এখন সর্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্য স্বরূপ। কিন্তু তোমরা কি করছ? না, সারা জীবন কেবল বাজে বকছো। এসো এদের দেখে যাও, তারপর লজ্জায় মুখ লুকাও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হ'য়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়—এমন আহাম্মক জাত।...

এস, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখ—সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? দেশকে ভালবাস? তা'হলে এস, ভাল হবার জন্য, উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর।...

ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই প্রাণস্পন্দনহীন সভ্যতাকে ভাঙবার জন্যই ইংরাজ রাজ-শক্তিকে এদেশে প্রেরণ করেছেন। আর মাদ্রাজের লোকই সর্বপ্রথম ইংরাজদের এদেশে আশ্রয় প্রদান করেছিল। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন করবে, মাদ্রাজ এমন কতগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রস্তুত!—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্নদান করবে। সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষদের অত্যাচারে যারা পশুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে?..."

এই চিঠিতে স্বামী বিবেকানন্দের * চিন্তার পরিচয় পাই। ভারতের

* বিবেকানন্দ নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে। কাশীপুর উদ্যানে সম্ভবতঃ ১৮৮৬, ফেব্রুয়ারী মাসের কোন সময়ে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ এগার জন যুবক শিষ্যকে গৈরিক বস্ত্র

কল্যাণই একমাত্র চিন্তার বিষয়। ভারতের অগণিত দরিদ্র নরনারীর চিন্তা তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিল। তারাই হয়েছিল তাঁর ধ্যানের বস্তু।

ইয়োকোহামা হ'তে স্বামীজী জাহাজে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম ক'রে চলেছেন। প্রাচ্য-ভূখণ্ড পেছনে রেখে তিনি চলেছেন প্রতীচ্যের দিকে। কিন্তু তিনি প্রাচ্যের চিন্তাগুলি ত্যাগ করতে পারেন নি। এদিকে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রমকালে জাহাজে শীতে কাতর হ'য়ে পড়লেন। জগমোহনলাল তাঁর সঙ্গে প্রচুর কাপড়চোপড় দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু একখানিও শীতবস্ত্র ছিল না। ব্যবস্থাপকরা শীতের কথা ভাবতে পারেন নি।...

জাহাজ কানাডার অন্তর্গত ভাংকুভারে পৌঁছল। তথা হ'তে ট্রেনযোগে কানাডার মধ্য দিয়ে জুলাই মাসের মাঝামাঝি স্বামীজী নামলেন শিকাগোতে। পরিচিত লোক বা পরিচয়পত্র তাঁর ছিল না। তাই অগত্যা এক হোটেলে আশ্রয় নিয়ে তিনি বার দিন ধরে বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে ঘুরে ঘুরে শিকাগোর বিশ্বপ্রদর্শনী দেখলেন। সে এক বিরাট কাণ্ড! কত লোকজন, কী ব্যস্ততা ও চাঞ্চল্য! সব কিছুই নূতন লাগল। পাশ্চাত্য জগতের ধন দৌলতের প্রাচুর্য ও উদ্ভাবনী শক্তি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অল্পই ছিল। বিজ্ঞানের কত অভিনব আবিষ্কার, কত বিবিধ যন্ত্র পণ্যসম্ভার, ধনকুবেরের দেশে শিল্পকলার কত উন্নতি! পাশ্চাত্যের অপূর্ব গরিমা দেখে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হ'লেন। সঙ্গে সঙ্গে

ও জপমালা দিয়ে, তাঁদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার ক'রে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি শিষ্যদের কোন আশ্রমিক নাম দেন নি।

শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পরে বরাহনগর মঠে, ১৮৮৭ সালের গোড়ার দিকে, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন শিষ্য বিরজা-হোম ক'রে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসীর নাম গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে রামকৃষ্ণানন্দ নামটি গ্রহণ করার নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁর অন্তরতম গুরুভ্রাতা শশীর একনিষ্ঠ আদর্শ-গুরুসেবার কথা স্মরণ ক'রে তিনি শশীকেই ঐ নাম দিয়েছিলেন। ফলে শশী 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ' নামে পরিচিত হলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন কোন নাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারো মতে তিনি তখন বিবিদিষানন্দ নাম গ্রহণ করেন।

ভারতের দৈন্যের কথা মনে হ'তেই তাঁর অন্তর দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত হ'ল।

পোষাকের জন্য স্বামীজীকে অনেক বিড়ম্বনা সহ্য ক'রতে হ'য়েছিল। ছোঁড়ার দল তাঁর পিছু নিয়ে নানা ভাবে তাঁকে উত্যক্ত করত। কেউ পোষাক ধরে টানে, কেউ হাততালি দেয়। তিনি নিরুপায়—সব সয়ে গেলেন। শিকাগোতে পৌঁছবার কয়েকদিন পরে প্রদর্শনীর অনুসন্ধান-দফতরে গিয়ে একেবারে দমে গেল তাঁর মন। সব প্রচেষ্টা পণ্ড! তিনি জানতে পারলেন যে, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পূর্বে ধর্মসম্মেলন শুরু হ'বে না এবং ভাল পরিচয়পত্রাদি না থাকলে কেউ সভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হ'তে পারে না। তা ছাড়া প্রতিনিধি-নির্বাচনের শেষ তারিখ অতীত হয়েছে।...

ভারতবর্ষে এ সম্মেলন-সম্বন্ধে কেউ বিশেষ কোন খোঁজ খবর জানত না। তাঁর কোন বিশেষ পরিচয়পত্র ছিল না। তিনি কোন অনুমোদিত ধর্মের প্রতিনিধিরূপেও আসেননি। এদিকে সম্মেলন পর্যন্ত থাকার মতো টাকাও তাঁর হাতে নেই।...সবই নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক। আমরা স্বামীজীর তখনকার মনের অবস্থা বুঝতে পারি। তিনি অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে তিনি মাদ্রাজী শিষ্যদের কাছে সাহায্যের জন্য 'কেবল' পাঠালেন, এবং সমুদায় অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখলেন। চারিদিকে অন্ধকার। কোথাও একটু আলো দেখা গেল না। তবু তিনি আশা ছাড়লেন না। স্থির করলেন, যে

পরিব্রাজক জীবনে পরিচয় গোপনের জন্য তিনি বিবিদিষানন্দ, সচ্চিদানন্দ প্রভৃতি নামে নিজ পরিচয় দিতেন। তাঁর ঐ সময়ের নিজের হাতে লেখা চিঠিতে এই দু'নামের সই পাওয়া যায়। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে যখন তিনি পরিচয়পত্রের জন্য থিয়সফিকেল সোসাইটির সভাপতি কর্ণেল অলকটের কাছে গিয়েছিলেন, তখন সচ্চিদানন্দ নামেই পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৯৩, ২৭শে এপ্রিল খেতড়ি থেকে ডাঃ নঞ্জুণ্ড রাওকে লিখত চিঠিতেও "ইহাই সচ্চিদানন্দের নিরন্তর প্রার্থনা" লেখা আছে। আমেরিকা-যাত্রার প্রাক্কালে বোম্বাই পৌঁছে ২৪শে মে (১৮৯৩) তিনি শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতেও "সচ্চিদানন্দ"—নাম সই করেছেন।

ভাবেই হো'ক শেষ পর্যন্ত চেষ্টা ক'রে দেখবেন। তিনি শ্রীভগবানের আদেশ পেয়েছেন। শত নৈরাশ্যের মধ্যেও ঐ বিশ্বাস তাঁকে সাহস ও অনুপ্রেরণা দিচ্ছিল।...

শিকাগো হোটেলে বেজায় খরচ। তিনি খবর পেলেন যে বষ্টনে খরচ অপেক্ষাকৃত কম। তিনি বষ্টন যাত্রা ক'রলেন। উদ্যমীকে শ্রীভগবান চিরকাল সাহায্য করেন। বিবেকানন্দ যেথানেই যেতেন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। বষ্টনের পথে ট্রেনে তাঁর চেহারা ও কথাবার্তা একজন সহযাত্রীকে মুগ্ধ করে। সহযাত্রী ব্রিজি মেডোজের একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। তিনি স্বামীজীকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেলেন। এতে তাঁর অনেক বিষয়ে সুবিধা হ'য়ে গেল। ব্রিজি মেডোজ থেকে (২০শে আগাষ্ট, ১৮৯৩ খৃঃ) আলাসিঙ্গাকে তিনি লিখছেন, "...এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হয়েছে যে, আমার প্রত্যহ এক পাউণ্ড করে যা খরচ হচ্ছিল, তা বেঁচে যাচ্ছে; আর তাঁর (ঐ মহিলার) লাভ এই যে, তিনি তাঁর বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ ক'রে ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাচ্ছেন !!! এ সব যন্ত্রণা সহ্য করতেই হ'বে। আমাকে এখন অনাহার শীত, আমার অদ্ভুত পোশাকের দরুণ রাস্তার লোকের বিদ্রূপ, এ সবের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে চলতে হচ্ছে। প্রিয় বৎস! জানবে, কোন

যদিও খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেই 'পাসপোর্ট' প্রবর্তিত হয়েছিল, তথাপি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে যাবার জন্য প্যাসপোর্ট ও ভিসার কোন বাধ্যতা ছিলনা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হ'তে পাসপোর্ট ও ভিসা বাধ্যতামূলকভাবে চালু হয়; তাতে মনে হয় স্বামীজীও পাসপোর্ট নেন নি এবং তাঁর ভিসারও প্রয়োজন হয় নি। আমেরিকাতে নেমে স্বামীজী কি নাম ব্যবহার করেছেন তাও জানবার উপায় নেই; কিন্তু শিকাগো ধর্ম মহাসভায় বক্তারূপে স্বামী বিবেকানন্দ নাম প্রথম পাওয়া যায়। তিনি ভারতবর্ষ হ'তে কোন ধর্মের নিমন্ত্রিত প্রতিনিধিরূপে শিকাগোতে যান নি। অধ্যাপক রাইট শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের প্রতিনিধি-নির্বাচন-সভার সভাপতিকে যখন স্বামীজীকে প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করার অনুরোধ-পত্র দিয়েছিলেন, তখন কোন নামে তাঁকে পরিচিত করার নিশ্চয়ই প্রয়োজন হয়েছিল এবং তখনই তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ লেখা হয়।

বড় কাজই গুরুতর পরিশ্রম বা কষ্টস্বীকার ছাড়া হয় নি।...একটি জিনিস দেখতে পাচ্ছি, এঁরা আমার হিন্দুধর্মসম্বন্ধীয় উদার মত ও নাজারাথের অবতারের প্রতি ভালবাসা দেখে আকৃষ্ট হচ্ছেন।..."

ঐ ভদ্রমহিলার পরামর্শে স্বামীজী ওদেশের পাদ্রীদের মতো একটি পোষাক করালেন।...এক বৃহৎ মহিলা-সভায় বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেলেন।... ধীরে ধীরে অনেক বিশিষ্ট লোকের সঙ্গেও পরিচয় হল। *

এখন প্রশ্ন—ঐ নাম তিনি নিজেই নিয়েছিলেন অথবা কেউ তাঁকে দিয়েছিল। অনেকের মতে খেতড়ির মহারাজা ভারতবর্ষ ত্যাগের পূর্বে তাঁকে ঐ নাম দিয়েছিলেন। খেতড়িতে বোধ হয় তিনি সচ্চিদানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু খেতড়ির রাজা তাঁর গুরুর নূতন নামকরণ কেন করতে গেলেন, তার কোন সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। শিষ্যের পক্ষে শ্রদ্ধেয় গুরুর নাম-পরিবর্তন—অনেকাংশে অস্বাভাবিক এবং তার কোন প্রয়োজন ছিল ব'লেও জানা নেই। সচ্চিদানন্দ নামটিও তো বেশ ভাল নাম; স্বামীজী নিজেই পছন্দ ক'রে নিয়েছিলেন।

স্বামীজী বিভিন্ন সময়ে নাম বদলাতেন। এইটিই খুব স্বাভাবিক মনে হয় যে স্বামীজী নিজেই বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেছিলেন, তা আমেরিকায় নেমেই হোক বা তার পূর্বেই হোক।

* ঐ প্রকার অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে বিপন্ন হ'য়েও কিন্তু স্বামীজী তাঁর স্বদেশের কথা ভোলেননি। এবং গরিবদের চিন্তা তাঁর মনকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। আলাসিঙ্গাকে লিখিত পূর্বের চিঠিতেই—এক স্থানে আছে, "...দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর—সাহায্য আসবেই আসবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার বহন করে ও মাথায় এই চিন্তা নিয়ে বেড়িয়েছি।...হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করতে করতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম ক'রে বিদেশে সাহায্য-প্রার্থী হয়ে উপস্থিত হ'য়েছি।...কিন্তু ভগবান অনন্ত শক্তিমান; আমি জানি তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। আমি এদেশে অনাহারে বা শীতে মরতে পারি; কিন্তু হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থ-সারথির মন্দিরে—যিনি গোকুলের দীন দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহকচণ্ডালকে আলিঙ্গন করতে সঙ্কুচিত হননি, যিনি তাঁর বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য ক'রে এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে তাকে উদ্ধার করেছিলেন; যাও, তাঁর নিকট গিয়ে সাষ্টাঙ্গে পতিত হও, এবং তাঁর নিকট এক মহাবলি প্রদান কর। বলি— জীবনবলি তাদের জন্য—যাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকেন, যাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যারা দিনে দিনে ডুবছে।

ঐ ভদ্র মহিলা তাঁকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক্‌ভাষার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জে, এইচ, রাইটের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেন। প্রথম দিনের চারঘণ্টা আলাপেই অধ্যাপক রাইট, ভারতীয় তরুণ সন্ন্যাসীর প্রতিভায় এত মুগ্ধ হ'লেন যে, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়েই স্বামীজীকে সকল বিষয়ে সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, এবং ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে যোগদানের অনুরোধ তাঁকে জানালেন। কিন্তু স্বামীজী যখন বললেন যে, তাঁর তো কোন পরিচয়-পত্র নেই! তখন মিঃ রাইট হেসে ব'লেছিলেন, "আপনার কাছে যোগ্যতার নিদর্শন চাওয়া, আর সূর্যকে কিরণ দেবার অধিকার আছে কি না জিজ্ঞাসা করা একই কথা।"

তিনি প্রতিনিধি-নির্বাচন-সভার প্রেসিডেণ্টকে লিখলেন, "ইনি এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে, আমাদের সকল অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্য এক করলেও এঁর সমকক্ষ হয় না।" শুধু তা-ই নয়, তিনি শিকাগো পর্যন্ত স্বামীজীকে একখানি টিকেট কিনে দিয়ে ধর্মসম্মেলনের প্রতিনিধি-ব্যবস্থাপক-কমিটির নামেও একখানি পত্র দিলেন।...এসব যেন পূর্ব হ'তে ঈশ্বর-নির্ধারিত ব্যবস্থার মতো মনে হ'ল।...

নূতন আশা নিয়ে স্বামীজী শিকাগো যাত্রা করলেন। ট্রেন পৌঁছল রাত্রে। কোথায় যান, কি করেন! - কমিটির অফিসের ঠিকানাও হারিয়ে ফেলেছেন! তিনি শ্বেতাঙ্গ নন। কা'রো কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সাহায্য পেলেন না। অনেক শ্বেতাঙ্গের দৃষ্টিতে 'কালা আদমি' পারিয়াদের চেয়েও ঘৃণাস্পদ।...অগত্যা ষ্টেশনের এককোণে একটি বড় খালি বাক্সের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে দুর্জয় শীতের হাত থেকে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করলেন। রাত্রি প্রভাত হ'তেই তিনি

এ এক দিনের কাজ নয়। পথ ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু পার্থ-সারথি আমাদের সারথি হ'তেও প্রস্তুত, আমরা তা জানি। তাঁর নামে, তাঁর প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রেখে ভারতের শত-শত যুগ-সঞ্চিত পর্বত প্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নি-সংযোগ ক'রে দাও, তা ভস্মসাৎ হ'বেই হ'বে।..."

বের হ'লেন পথের সন্ধানে। সর্বত্রই পেলেন অবমাননা ও লাঞ্ছনা। কুলীরা তাঁকে প্রতারিত ক'রল। কয়েকটি স্থানে তিনি রূঢ়ভাবে বিতাড়িত হ'লেন। অনেক বাড়িতে চাকর দিয়ে তাঁকে অপমানিত করা হ'ল। কোথাও বা সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল তাঁর মুখের উপর; কাফ্রী মনে ক'রে বহু অপমান করল।*

এইভাবে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পরে তিনি ক্লান্ত দেহে পথের একধারে ব'সে পড়লেন। ঠিক ঐ সময়ে স্বর্গীয় দূতের মতো রাস্তার ওপারের বাড়ি থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসে সুমিষ্ট স্বরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাশয়, আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি?" স্বামীজী,—"হ্যাঁ, তাই বটে, কিন্তু আমি ঠিকানা হারিয়ে ফেলে মহা দুর্দশায় পড়েছি।"

তাঁকে সযত্নে ভিতরে ডাকা হ'ল। সেবা আন্তরিকতার অন্ত ছিল না। এইভাবে নিয়তি তাঁকে এমন একজনের সঙ্গে পরিচিত করলেন, যিনি তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভক্তদের মধ্যে অন্যতম। ঐ ভক্ত-পরিবার স্বামীজীকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। ঐ 'হেল' পরিবারের গৃহই ছিল যেন আমেরিকায় তাঁর নিজের বাড়ী। স্বামীজী ঐ মহিলাকে 'মা' ব'লে ডাকতেন।

আহার ও বিশ্রামের পরে ঐ মহিলা স্বামীজীকে মহাসভার কার্যালয়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হ'লেন এবং প্রাচ্য-প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর বাসের ব্যবস্থা হ'ল।...

* বিবেকানন্দের দুঃসাহসিক পাশ্চাত্য অভিযান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুবই বিপদসঙ্কুল ছিল। তাঁকে প্রতি পদে প্রায় দীর্ঘ চারটি বৎসর প্রতিদিন বহু বাধাবিঘ্ন ও বিরোধিতা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হ'তে হ'য়েছিল। আজ প্রায় সত্তর বৎসর পরে সর্বত্র স্বামীজীর বিজয়গানই শুনতে পাই। কিন্তু ঐ বিজয়ের মূলাস্বরূপ তাঁকে সহ্য ক'রতে হ'য়েছিল বহু আঘাত নির্যাতন উৎপীড়ন। তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন, ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে ক্ষোভে মৃতপ্রায় হ'য়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অশ্রু পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে উর্বর করেছে। তিনি যুদ্ধে আহত হ'য়েছিলেন, কিন্তু মরেন নি, শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন। দেবতার বিশেষ আশীর্বাদ যে তাঁর উপর ছিল!

ষোল

১৮৯৩ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর, সোমবার জগতের ধর্ম-ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের দিন। সমগ্র জগতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সূত্রপাতের দিন। স্বামী বিবেকানন্দকে যন্ত্র ক'রে বিশ্বের ধর্মমহাসম্মেলনে প্রাচীন ভারতের বেদান্তধর্ম সর্বোচ্চ আসনে হ'ল প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বে স্থাপিত হ'ল শান্তি ও মৈত্র্যের পথ।

পূর্বাহ্নে যথারীতি স্বস্তিবাচন ও সঙ্গীতাদি দ্বারা ধর্মসম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়।* মঞ্চের মধ্যস্থলে সভাপতি কার্ডিন্যাল গিবন্‌স। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে দক্ষিণে ও বামে বসেছেন প্রাচ্য প্রতিনিধিগণ। ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে বোম্বাই-এর নাগরকার ও বীরচাঁদ গান্ধী। এনি বেসান্ত ও জ্ঞান চক্রবর্তী থিয়সফিষ্টদের প্রতিনিধি। সিংহল হ'তে বৌদ্ধদের প্রতিনিধিরূপে এসেছিলেন ধর্মপাল। স্বামী বিবেকানন্দ কোন সম্প্রদায়-বিশেষের নন—তিনি ছিলেন সমগ্র ভারতের সনাতন বৈদিক ধর্মের প্রতিনিধি।...

প্রতিনিধিরা সকলেই নিজ নিজ ধর্মের পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে বক্তৃতা দিলেন। স্বামীজী দাঁড়িয়ে "আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ" ব'লে সভাকে সম্বোধন ক'রলেন। এই কথাটির মধ্যে বিপুল শক্তি ছিল, যা সকলের অন্তর

---

* স্বামী বিবেকানন্দ জনৈক মাদ্রাজী শিষ্যকে লিখেছিলেন, "মহাসভা খুলবার দিন প্রাতে আমরা সকলে 'শিল্পপ্রাসাদ' ভবনে সমবেত হ'লাম।...এখানে সর্বজাতির লোক সমবেত।...কল্পনা ক'রে দেখ—নীচে একটি হল, তারপর প্রকাণ্ড গ্যালারী, তাতে আমেরিকার বাছা বাছা ৬।৭ হাজার সুশিক্ষিত নরনারী, আর প্লাটফর্মের উপর পৃথিবীর সর্বজাতির পণ্ডিতদের সমাবেশ।...সভা আরম্ভ হ'ল। তখন এক একজন প্রতিনিধিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ'ল সভার সমক্ষে। তাঁরাও অগ্রসর হ'য়ে কিছু কিছু বললেন।...সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত ক'রে এনেছিলেন। আমি নির্বোধ, কিছুই প্রস্তুত করে আনিনি। আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম ক'রে অগ্রসর হ'লাম। ব্যারোজ মহোদয় আমার পরিচয় দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত কিছু আকৃষ্ট হ'য়েছিল।..."

স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে শত শত শ্রোতা আসন ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল। চতুর্দিক হ'তে কয়েক মিনিট ধরে তুমুল করতালি ধ্বনি! সে উদ্দীপনা ও করতালি আর থামে না!

সকলেই প্রচলিত প্রথানুসারে শ্রোতাদের সম্বোধন করেছেন। একমাত্র বিবেকানন্দ মানবজাতিকে সম্বোধন করেছিলেন "ভগ্নী ও ভ্রাতা" বলে। বক্তার অন্তরের ভ্রাতৃভাবের স্পন্দন সকল হৃদয়ে হ'ল ঝঙ্কৃত। ক্ষণিকের জন্য সমগ্র মানবজাতির একত্ব অনুভূত হ'ল * সহস্র সহস্র নরনারীর হৃদয়ে।

স্বামীজী প্রথম কয়েক মিনিট বারংবার চেষ্টা করেও শ্রোতৃবৃন্দের উৎসাহ ও আনন্দ মন্দীভূত করতে পারলেন না, অভিভূতের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সভা যখন স্তব্ধ হ'ল, তিনি একটি ক্ষুদ্র ভাষণ দিলেন। সংক্ষিপ্ত হ'লেও তাঁর বক্তৃতা উদার বিশ্বজনীন ভাবপূর্ণ। তিনি পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নামে, সকল ধর্মের প্রসূতি-স্বরূপ যে সনাতন বৈদিকধর্ম, তার প্রতিনিধিরূপে এবং পৃথিবীর যাবতীয় হিন্দুজাতির ও সকল হিন্দুসম্প্রদায়ের কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর মুখস্বরূপ হয়ে, এবং আর্যঋষিদের নামে সভাকে অভিনন্দন জানালেন। তিনি সনাতন হিন্দুধর্মকে জগতের সকল ধর্মের জননীরূপে উপস্থাপিত করলেন। এবং আরো বললেন, "যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল সমদর্শন ও সর্ববিধ মতগ্রহণের বিষয় শিক্ষা দিয়ে আসছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত ব'লে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা যে কেবল অন্য ধর্মাবলম্বীকে

*স্বামীজী ঐ সম্বোধনটির মধ্যে নিহিত ছিল বিশ্বভ্রাতৃত্বের বীজ, বিশ্বমানবতার ঝঙ্কার, বৈদিক ঋষির বাণী ও ছিল সৌভ্রাত্রের স্পর্শ। দু' হাজার বৎসর পূর্বে যীশুও বলেছিলেন—"ভগবান যদি মানবজাতির পিতা হ'ন, তা হ'লে আমরা সকলেই তাঁর সন্তান।" খ্রীষ্টানের দেশে—খ্রীষ্টানদের কাছে স্বামীজীর কণ্ঠে সেই ভ্রাতৃত্বের ও মানবকল্যাণের বাণীই হ'য়েছিল ধ্বনিত। সকলেই সেই পরমপিতার সন্তান—মানুষ মানুষের ভাই। এক অখণ্ড মানবজাতি! রোমাঁ রোলাঁ ব'লেছিলেন, "এটিই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের নিঃশ্বাস—সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে তাঁর মহান্ শিষ্যের মুখ দিয়ে নির্গত হ'ল।"

সমদৃষ্টিতে দেখি তা নয়, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য ব'লে বিশ্বাস করি।...যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্ম ও জাতির যাবতীয় ত্রস্ত উপদ্রুত ও আশ্রয়-লিপ্সু জনগণকে চিরকাল অকাতরে আশ্রয় দিয়ে আসছেন, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত ব'লে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। যে বৎসর রোমকদিগের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে য়াহুদীজাতির পবিত্র দেবালয় চূর্ণীকৃত হয়, সে বৎসর তাদের কিয়দংশ দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয়লাভার্থ এলে, আমার জাতিই তাদের সাদরে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন ; আমি সেজন্যও নিজেকে গৌরাবান্বিত মনে করি। জোরোয়াস্তরের অনুগামী সুবৃহৎ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে ধর্ম আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং আজ পর্যন্ত যে ধর্ম তাঁদের প্রতিপালন করছেন, আমি সেই ধর্মভুক্ত।"

অনন্তর স্বামীজী বিভিন্ন ধর্মের গন্তব্যস্থান যে এক তা দেখালেন—গীতার প্রসিদ্ধ শ্লোকটি উদ্ধৃত করে—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥" অর্থাৎ যে কোন ধর্মমত আশ্রয় ক'রে কেউ আসুক না কেন, আমি সে ভাবেই তাকে অনুগ্রহ ক'রে থাকি। হে অর্জুন ! মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার নির্দিষ্ট পথই অনুসরণ ক'রে থাকে। এবং পরে শিবমহিম্নঃ স্তোত্রের একাংশ উদ্ধৃত করলেন, "রুচীনাং বৈচিত্র্যা-দৃজুকুটিলনানাপথজুষাং। নৃনামেকোগম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব।" অর্থাৎ—হে প্রভু, নানাপথগামী নদীগুলির কাছে সাগরের মতো, বিভিন্ন রুচি-হেতু সরল ও কুটিল নানা পথচারী লোকদের তুমিই একমাত্র গম্য-স্থান।

শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে ব'সে স্বামীজী 'যত মত তত পথ'-রূপ যে সমন্বয়বাণী শুনেছিলেন, তা-ই উদাত্তকণ্ঠে আমেরিকায় ক'রেছিলেন ঘোষণা। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের বিষময় ফলের চিত্র উপস্থাপিত ক'রে তিনি ব'লেছিলেন, "সাম্প্রদায়িকতা সংকীর্ণতা ও এসবের ফলস্বরূপ

ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধ'রে আয়ত্তাধীন ক'রে রেখেছে। এই ধর্মোন্মত্ততা জগতে মহা উপদ্রবরাশি উৎপাদন করেছে, কতবার একে নর-শোণিতে ক'রেছে পঙ্কিল, সভ্যতার নিধনসাধন ক'রেছে ও যাবতীয় জাতিকে সময়ে সময়ে ভাসিয়ে দিয়েছে হতাশার সাগরে। এই ভীষণ পিশাচ যদি না থাকত, তা হ'লে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা কত বেশী উন্নত হ'ত! কিন্তু এর মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'য়েছে; এবং আমি সর্বতোভাবে এই আশা করি যে, এই ধর্মসমিতির সম্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি করা হ'ল, সেই ঘণ্টানিনাদই ধর্মোন্মত্ততা এবং তরবারি অথবা কুতর্কাদি দ্বারা উৎপন্ন বহুবিধ দৌরাত্ম্য এবং একই চরম লক্ষ্যে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সমূলে নিধন সমাচার ঘোষণা করুক।"*

পঞ্চম দিনের অধিবেশনে স্বামীজী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মতদ্বৈধ ও মনান্তরের কারণ বোঝাবার জন্য কূপবাসী ও সমুদ্রবাসী দু'টি ভেকের গল্পের অবতারণা ক'রে বলেছিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ, এরূপ সংকীর্ণ ভাবই আমাদের মতভেদের কারণ। আমি একজন হিন্দু, আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র কূপে ব'সে আছি এবং একেই সমগ্র জগৎ ব'লে মনে করছি। খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী তাঁর নিজের ক্ষুদ্র কূপে উপবিষ্ট আছেন ও তা'কেই সমগ্র জগৎ মনে ক'রছেন। মুসলমানও আপনার ক্ষুদ্র কূপে উপবিষ্ট আছেন ও তাকেই সমগ্র জগৎ মনে করেছেন। হে আমেরিকাবাসিগণ, আপনারা যে আমাদের এই ক্ষুদ্র জগৎগুলির অবরোধ ভাঙবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হয়েছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ দেই। আশা করি, ঈশ্বর ভবিষ্যতে আপনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য-সম্পাদনে সাহায্য ক'রবেন।"

*স্বামীজী ধর্মসম্মেলনে বিভিন্ন দিনে যে সকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সে সব মূল্যবান বক্তৃতার একটিও স্থানাভাবে পুরাপুরি এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হ'ল না। ঐ বক্তৃতাগুলি উদ্বোধন কার্যালয় হ'তে "স্বামী বিবেকানন্দের "শিকাগো বক্তৃতা" নামে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রত্যেক বক্তা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভগবানের মহিমার কথাই বলেছিলেন। একমাত্র বিবেকানন্দই সকল ধর্মের ভগবানের কথা—সেই বিরাট পুরুষের কথা বলেন। সেই বিরাট পুরুষকে আশ্রয় ক'রে যে সার্বভৌম বিশ্বধর্ম গ'ড়ে উঠবে সে সম্বন্ধে তিনি ব'লেছিলেন, "সেই ধর্ম, যে অনন্ত ভগবানের বিষয় উপদেশ করবে, সেরূপ অনন্ত হ'বে। সেই ধর্মসূর্য কৃষ্ণভক্ত বা খ্রীষ্টভক্ত, সাধু বা অসাধু—সকলেরই উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার ক'রবে। সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম বা খ্রীষ্টিয়ানধর্ম বা মুসলমানধর্ম হ'বে না, পরন্তু সকলেরই সমষ্টিস্বরূপ হ'বে ; অথচ তাতে উন্নতির অনন্তপথ মুক্ত থাকবে। সে ধর্ম এতদূর সার্বভৌম হ'বে যে, তা অসংখ্য-প্রসারিত-হস্তে পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করবে,...এবং তার সমুদয় শক্তি সমস্ত মনুষ্যজাতিকে স্ব স্ব দেবস্বভাবোপলব্ধি করতে সহায়তা করবার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকবে।...'প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর আছেন'—সমস্ত জগতে এ সত্য ঘোষণা করার ভার আমেরিকার জন্যই ছিল।"

তিনি কোন ধর্মের নিন্দা বা সমালোচনা করেননি, কোন ধর্মকেই ছোট বলেননি। তিনি ব'লেছেন, "খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হ'তে হ'বে না, অথবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হ'তে হ'বে না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মকেই নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে অপরের ভাব হৃদয়ঙ্গম ক'রতে হ'বে, ক্রমশঃ উন্নত হ'তে হ'বে। উন্নতি বা বিকাশের ইহাই একমাত্র নিয়ম।"

ধর্মমহাসম্মেলন তরুণ সন্ন্যাসীকে অভিনন্দিত ক'রল। একদিনেই তাঁর যশ ছড়িয়ে প'ড়ল সারা আমেরিকায়। মার্কিন-সংবাদ-পত্রগুলি বিবেকানন্দকে ধর্মসম্মেলনে সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ব'লে ঘোষণা ক'রল। আরো ব'লল, "তাঁর বক্তৃতা শুনার পর ভারতের ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধ দেশে

ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করা যে কিরূপ নির্বুদ্ধিতার কাজ, আমরা বিশেষভাবে অনুভব ক'রলাম।*

দি প্রেস্ অব্ আমেরিকা লিখলেন—"হিন্দু দর্শন ও বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত প্রিয়দর্শন ও তরুণ বয়স্ক আচার্য বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায় যে বক্তৃতা প্রদান ক'রেছেন, তাতে সমগ্র সভ্যমণ্ডলী স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হ'য়েছেন। তথায় বহু বিশপ ও প্রায় প্রত্যেক খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের ধর্মোপদেষ্টাগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই বিবেকানন্দের প্রভাবে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়েছেন। এই মহাপুরুষের বাগ্মিতা তাঁর জ্ঞানদীপ্ত সৌম্য মুখমণ্ডল এবং তাঁর চিরসম্মানিত ধর্মের মাধুর্যবর্ণনের জন্য তিনি যে সুন্দর ইংরাজী ব'লেন—সমস্ত মিলিত হ'য়ে শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরে এক গভীর দিব্যভাব সঞ্চার ক'রেছে।"

দি ইন্টিরিয়র শিকাগো লিখেছিলেন—"ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর প্রশংসা-ধ্বনিতে মহাসভায় সর্বাপেক্ষা অধিক কোলাহল উত্থিত হ'য়েছিল এবং শ্রোতৃ-বৃন্দের আগ্রহাতিশয়ে যাঁকে পুনঃ পুনঃ সভামধ্যে ফিরে আসতে হ'য়েছিল।"

দি নিউইয়র্ক ক্রিটিকের উদ্ধৃতি—"সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার অনেকগুলিই বিশেষ বাগ্মিতাপূর্ণ হ'য়েছিল সত্য; কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসী ধর্মমহাসভার মূল নীতি ও উহার সীমাবদ্ধতা যেরূপ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা ক'রেছিলেন অন্য কেহই তা ক'রতে পারেনি। তাঁর বক্তৃতার সবটুকু আমি উদ্ধৃত করছি এবং শ্রোতৃবৃন্দের উপর তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, দৈবশক্তিসম্পন্ন বক্তা তিনি। তাঁর অপকট উক্তিসমূহ যে মাধুর্যময় ভাসায় তিনি প্রকাশ করেন তা তাঁর গৈরিকবসন এবং বুদ্ধিদীপ্ত দৃঢ় মুখমণ্ডল অপেক্ষা কম আকর্ষণীয় ছিল না।...

*যদিও ধর্মপ্রচারক-প্রেরণ বন্ধ হয়নি, তথাপি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব যা স্বামীজী বিশ্বের দরবারে প্রতিপন্ন ক'রেছিলেন তা ম্লান হ'বার নয়।

তাঁর শিক্ষা, বাগ্মিতা এবং অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব আমাদের সম্মুখে হিন্দুসভ্যতার এক নূতন ধারা উন্মুক্ত ক'রেছে। তাঁর প্রতিভাদীপ্ত বদনমণ্ডল, গম্ভীর ও সুললিত কণ্ঠস্বর স্বতঃই মানুষকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট ক'রে এবং ঐ বিধিদত্ত সম্পদসহায়ে এদেশের বহু ক্লাব ও গির্জায় প্রচার করার ফলে আজ আমরা তাঁর মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হ'য়েছি। কোনপ্রকার নোট লিখে তৎসাহায্যে তিনি বক্তৃতা করেন না। কিন্তু নিজ বক্তব্য বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ ক'রে অপূর্ব কৌশল ও ঐকান্তিকতায় তিনি মীমাংসায় উপনীত হ'ন এবং অন্তরের গভীর প্রেরণা তাঁর বাগ্মিতাকে অপূর্ব ভাবে সম্পদশালী ক'রে তোলে।" (এই উদ্ধৃতিটি স্বামীজী ১৫ই নভেম্বর ১৮৯৪, শিকাগো থেকে শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকে নেওয়া হ'ল।)

ঐ ধর্ম্মসম্মেলনে স্বামীজী বিভিন্ন দিনে বারটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার জন্য তাঁকে অন্যান্য বক্তাদের চেয়ে বেশী সময় দেওয়া হ'ত। তিনি এত লোকপ্রিয় বক্তা ছিলেন যে, যদি একবার মঞ্চের একদিক থেকে অন্য দিকে চলে যেতেন, তাতেই শ্রোতৃবৃন্দ করতালি-ধ্বনিতে তাঁকে অভিনন্দিত করত। নীরস বক্তৃতা বা প্রবন্ধশ্রবণে শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি হ'লে সভাপতি দাঁড়িয়ে ব'লতেন, "সভা শেষ হবার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেবেন।" স্বামীজীর মুখে দু'টি কথা শুনবার জন্য শ্রোতারা আবার শান্তভাবে দু ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রত।

এইভাবে সতের দিনের অধিবেশনে—যেখানে সহস্রাধিক প্রবন্ধপাঠ ও বহু বক্তৃতা হয়—বিবেকানন্দকে বহু ভাষণ দিতে হয়েছিল। ঐ সকল বক্তৃতার সারাংশ মাত্র জানা যায়। তিনি মানবাত্মার মহিমা ঘোষণা ক'রে ব'লেছিলেন—সকলেই "অমৃতের পুত্র" "জ্যোতির তনয়।"

তিনি নবম দিবসের অধিবেশনে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে বলেন,…'অমৃতের অধিকারী' এই নামটি কেমন মধুর ও কি আনন্দবর্ধক! হে ভ্রাতৃগণ! এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুরা তোমাদের পাপী ব'লতে অস্বীকার করেন। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান। অমৃতের অধিকারী, পবিত্র ও পূর্ণ। তোমরাই এই মর্ত্য-ভূমির দেবতা। তোমরা পাপী?—তা অসম্ভব। মানবকে পাপী বলাই এক মহাপাপ।…"

দশম দিবসের অধিবেশনে তিনি "ধর্ম ভারতের প্রকৃত অভাব নয়"—শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা-প্রসঙ্গে অল্প কথায় বলেছিলেন যে, ভারতে ধর্মের অভাব আদৌ নেই, প্রকৃত অভাব অন্ন-বস্ত্রের। তিনি বলেন, "…দরিদ্র পৌত্তলিকদের উদ্ধার-কল্পে তোমরা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে মিশনরী প্রেরণ কচ্ছ, তাদের দেহ-রক্ষাকল্পে দু'মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করতে পার কি?…ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র সহস্র বিধর্মী ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু হে খ্রীষ্টিয়ানগণ! তোমরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। তোমরা সমগ্র ভারতবর্ষে খ্রীষ্টের ধর্মমন্দির নির্মাণের জন্য ব্যস্ত; কিন্তু ভারতবাসীদেরধর্ম প্রচুর আছে, তারা শুষ্ককণ্ঠে কেবলমাত্র অন্নের জন্য প্রার্থী হয়ে আছে। তারা অন্ন চাচ্ছে—পাচ্ছে প্রস্তরখণ্ড।… আমি আমার গ্রাসাচ্ছাদনহীন স্বদেশীয়গণের জন্য তোমাদের নিকট ভিক্ষা চাইতে এসেছি। কিন্তু খ্রীষ্টানদের নিকট পৌত্তলিকদের জন্য সাহায্যলাভ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার, তা বিশেষরূপে উপলব্ধি করছি।"…

তিনি একদিন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে শক্তিলাভের জন্য সকল ধর্মের ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, "যিনি হিন্দুর ব্রহ্ম, যিনি জরথুস্ত্র-পন্থীদের অহুর মজদা, যিনি বৌদ্ধদের বুদ্ধ, মুসলমানদের আল্লা,

ইহুদীদের জিহোবা, যিনি খ্রীষ্টানদের স্বর্গস্থপিতা—তিনি আপনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করবার শক্তি দিন্।"

ধর্মমহাসভার শেষ দিনে ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি যেন সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ ক'রে সভাকে শোনালেন, "...ধর্ম মহাসভা যদি জগৎকে কিছু দেখিয়ে থাকে, তাহা এই—পবিত্রতা চিত্তশুদ্ধি দয়াদাক্ষিণ্য মহানুভাবতা—কোন ধর্মসম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব নয়। এবং প্রত্যেক ধর্মেই উন্নতচরিত্র নরনারীর আবির্ভাব হ'য়েছে। এ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেউ স্বপ্নেও ভাবেন যে, সকল ধর্ম বিলুপ্ত হ'য়ে শুধু তাঁর ধর্মটিই বেঁচে থাকবে, তাহ'লে আমি তাঁকে করুণার পাত্র মনে করি, তাঁর জন্য আমি বড়ই দুঃখিত এবং এ কথাও বলি যে, শীঘ্রই দেখবেন আপনার বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও সকলধর্মের পতাকাশীর্ষে লিখিত হ'বে—সমর নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, গ্রহণ; দ্বন্দ্ব নয়, মিলন ও শান্তি!"

বিবেকানন্দের এই মহান্ বাক্যগুলির ফল হ'য়েছিল বিপুল। তিনি বেদান্তের সার্বভৌম বাণী প্রচার ক'রেছিলেন। তা শুধু আবেদনের রূপে নয়, উচ্চতর সত্যরূপে, তাই সেটি সকল প্রতিনিধি ও শ্রোতৃবৃন্দের উপর অমোঘ প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। ফলে আর্যধর্ম আর্যজাতি ও আর্যভূমি জগতের চক্ষে পূজাস্পদরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। হিন্দুজাতি পদদলিত হ'লেও ঘৃণাস্পদ নয়, দীনদরিদ্র হ'লেও অমূল্য পারমার্থিক সম্পদের অধিকারী, ধর্মজগতে বিশ্বের গুরুপদে সমাসীন হ'বার যোগ্য। শত শত শতাব্দীর পরে বিবেকানন্দ হিন্দুজাতির আত্মমর্যাদা-বোধ জাগিয়ে দিলেন। ঘৃণা ও অবমাননার পঙ্করাশি হ'তে উদ্ধার ক'রে, তিনি হিন্দুধর্মকে জগৎ সভায় মহোচ্চ আসন করলেন প্রদান। শিকাগো ধর্মসম্মেলনে স্বামীজী যে মহাসত্য প্রচার ক'রেছেন, যে আশার বাণী শুনিয়েছেন, তা ভবিষ্যতেও জগতের অধ্যাত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবলম্বনরূপে গৃহীত হ'বে।

বিবেকানন্দের বিজয়ে সমগ্র ভারত উল্লসিত ও দীপ্ত হ'য়ে উঠল। দৈন্য ও লাঞ্ছনায় অবনত ভারতে নেমে এল আনন্দ-মন্দাকিনী। অতীতের ভস্মস্তূপকে শ্যামল করবার জন্য নেমে এল সুরনদী। স্বামীজীর ঐ বিজয়ের প্রভাব প'ড়েছিল ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি কর্ম ও প্রতি প্রচেষ্টার উপর। শুধু ধর্ম বা আত্মিক ক্ষেত্রে নয়, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিক সামাজিক—জাতির সামগ্রিক জীবনে তা শিশির সম্পাতের মতো কার্যকর হ'য়েছিল।*

বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে ধর্মমহাসভার অঙ্গীভূত বিজ্ঞান সভার সভাপতি মিঃ স্নেল লিখেছিলেন, "...আর কোন ধর্মই ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের ন্যায় প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারেনি এবং এই ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। মহাসভায় এঁর প্রভাব ও আদর যে সর্বাপেক্ষা অধিক হ'য়েছিল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তিনি প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন—খাস মহাসভায় তো বটেই এবং উহার বৈজ্ঞানিক শাখার অধিবেশন-সমূহেও (যার সভাপতি হবার সম্মান আমি লাভ ক'রেছিলাম)। প্রতিবারেই খৃষ্টান অখৃষ্টান সকল বক্তা অপেক্ষা লোকে তাঁকেই বিশেষ সম্ভ্রম সহকারে অভ্যর্থনা ক'রেছিল। তিনি যেদিকে যেতেন, সেদিকেই লোকের ভিড় লেগে যেত এবং তাঁর মুখের কথা শুনবার জন্য লোকে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকত। খ্রীষ্টানদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ গোঁড়া, তাঁরাও বলেন—'বাস্তবিকই ইনি নরকুলের অলঙ্কারস্বরূপ।'
এ দেশে হিন্দুত্বের কার্যকরী শক্তি, স্বামী বিবেকানন্দের পরিশ্রমে বিশেষ প্রেরণা লাভ ক'রেছে। হিন্দুধর্মের এরূপ বিশ্বস্ত কোন প্রতিনিধিই ইতো-

* রোম্যাঁ রোলাঁ ঐ জাগরণ সম্বন্ধে লিখেছেন,..."এই সর্বপ্রথম ভারতের অগ্রগতি আরম্ভ হ'ল। ঐ দিন থেকে অতিকায় কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হ'তে লাগল।...বিবেকানন্দের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে তাঁর বংশধরগণ যদি বাংলার বিদ্রোহ এবং তিলক ও গান্ধীর আন্দোলনের সূচনা প্রত্যক্ষ করেন, ভারত যদি আজ জনসাধারণের সংঘবদ্ধ কর্মের মধ্যে আপনার সুনির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ ক'রে, তা বিবেকানন্দের শক্তিপূর্ণ আহ্বানেরই ফলস্বরূপ।" বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতের গণজাগরণের ঋত্বিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত।

পূর্বে আমেরিকার তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদিগের সম্মুখে উপস্থিত হননি। সাময়িক উত্তেজনায় নয়—বাস্তবিকই আমেরিকাবাসী সত্য সত্যই স্বামীজীর প্রস্থানের পর…তাঁর পুনরাগমনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করবে। প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত 'গোঁড়া', তাঁদের অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই স্বামীজীর সাফল্যে ঈর্ষ্যাপরায়ণ হ'য়ে তাঁর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছেন, কিন্তু এরূপ মন্তব্য অপ্রচলিত ধর্মমতাবলম্বীদের নিকট হ'তেই এসেছে। ভারতভুমির গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসীর সর্বজনীন মহানুভবতা জ্ঞানগৌরব এবং ব্যক্তিগত চরিত্র-মাধুর্যের ফলে এখানকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তিরোহিত হচ্ছে। স্বামীজীকে প্রেরণ করার জন্য আমেরিকা ভারতবর্ষকে ধন্যবাদ দিচ্ছে।"

অখ্যাত অজ্ঞাত স্বামী বিবেকানন্দ হ'লেন—বিশ্ববরেণ্য। তাঁর শত শত পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি শিকাগো সহরের বিভিন্ন স্থানে লম্বিত হ'ল। প্রতিকৃতি-গুলির নিম্নে লেখা ছিল—"ভারতের হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।" পথচারী দর্শকগণ দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধাভরে মাথার টুপি খুলে ঐ পূজ্যের প্রতি সম্মান নিবেদন ক'রত। আমেরিকা ও ইউরোপের সংবাদপত্রসমূহ দিনের পর দিন মুখর হ'য়ে উঠল তাঁর প্রশংসায়। ঐ সময়ের শত শত সংবাদপত্রের উদ্ধৃতিতে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হ'তে পারে।* 'দি বষ্টন ইভিনিং ট্রান্সক্রিপ্ট' লিখলেন—"তাঁর (স্বামী বিবেকানন্দের) প্রচারিত ভাবসমূহের মহত্ত্বের জন্য এবং চেহারার গুণে তিনি ধর্মসভায় বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। যদি তিনি শুধু মঞ্চের উপর দিয়ে চ'লে যান, তা হ'লেই করতালি ধ্বনি হ'তে থাকে। অথচ সহস্র সহস্র

*ধর্মসম্মেলনের পরে স্বামীজী মাদ্রাজী শিষ্যদের লিখেছেন,…"এখানকার ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য ছিল সব ধর্মের অপেক্ষা খ্রীষ্টীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করা। কিন্তু উহার উদ্যোক্তাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তার বিপরীত হ'য়ে গেল।.." আমাদের মনে হয়—শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী তাঁর প্রধান শিষ্যের মুখ দিয়ে সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হ'বে ব'লেই ঐ ধর্মসম্মেলনের আয়োজন হ'য়েছিল, এবং দৈব-প্রেরিত হয়েই ঐ কার্যের জন্য বিবেকানন্দ সমুদ্র উল্লঙ্ঘন ক'রে উপস্থিত হ'য়েছিলেন আমেরিকায়।

ব্যক্তির এই বিশেষ সমাদর ও সম্মান ইনি ঠিক বালকের মত সরলভাবে গ্রহণ করেন, তাঁতে আত্মাভিমানের লেশমাত্র ছিল না।"

মহাসভার জেনারেল কমিটির সভাপতি রেভরেণ্ড ব্যারোজ মহোদয়ও বলেছিলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শ্রোতৃবর্গের উপর আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার ক'রেছিলেন।"

খবরের কাগজের এজাতীয় শত শত উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ বিজয়কে বিবেকানন্দ কি ভাবে গ্রহণ ক'রেছিলেন ?

ঐ বহু সম্মানিত ভারতীয় সন্ন্যাসীকে আমেরিকার এক ধনাঢ্য ব্যক্তি অতি সমাদরে নিয়ে গেলেন নিজগৃহে। সেবাযত্ন ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য বিবেকানন্দের চিত্তকে ব্যথিত ক'রে তুলল। ইন্দ্রপুরীতুল্য অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভশয্যায় শুয়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন। চোখের জলে উপাধান ভিজে গেল। তিনি মনোবেদনায় অধীর হ'য়ে গৃহের মেজেতে প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ ক'রতে লাগলেন,—"হায়, আমার দুঃখিনী মাতৃভূমি! তোমার এত দুর্দশা। আর আমার জন্য এই সুখভোগ! আমি এ ভোগ-ঐশ্বর্য ও নামযশ নিয়ে কি করব ?…" তিনি কেঁদে কেদে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিলেন। বিবেকানন্দ নিজের মানযশের জন্য পাশ্চাত্যে গমন করেন নি!

ধর্মমহাসভা শেষ হ'তেই স্বামীজী বহুস্থানে বক্তৃতা দেবার জন্য আহূত হলেন এবং অনেক বিশিষ্ট লোক তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে বিবিধ আলোচনা-সভার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। ঐ সময়ে একটি বক্তৃতা কোম্পানী "ঐ জনপ্রিয় বক্তাকে" যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্নস্থানে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান ক'রে। আমেরিকার জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিত হ'বার প্রকৃষ্ট সুযোগ মনে ক'রে স্বামীজী রাজী হলেন এবং ঐ কোম্পানীর ব্যবস্থামত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। সর্বত্রই তিনি

বিশেষভাবে অভিনন্দিত ও সম্মানিত হ'লেন, এবং তাঁর বক্তৃতার ফলও হ'ল বিস্ময়কর। তিনি শুধু বেদান্ত বা ধর্মসম্বন্ধেই বক্তৃতা দিতেন না, আর্যসভ্যতা, ভারতীয় সংস্কৃতি সমাজব্যবস্থা মূর্তিপূজা, সামাজিক রীতিনীতি আচার ব্যবহার নারীজাতির আদর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাতে মিশনারীরা ভারতবাসীদের 'উলঙ্গ নরমাংসাহারী অসভ্য বর্বর বিধর্মী ধর্মবিশ্বাসহীন মূর্তিপূজক' প্রভৃতিরূপে যা প্রচার ক'রেছিল, সে সব ধারণা জনসাধারণের মন থেকে মুছে গেল। "যে জাতির মধ্যে বিবেকানন্দের মত লোক জন্ম-গ্রহণ করতে পারে" সে জাতির সম্বন্ধে 'কিম্ভূত-কিমাকার' ধারণার অবকাশ আর রইল না। এইভাবে ঐ বক্তৃতা কোম্পানীর ব্যবস্থামত তিনি শিকাগো আইওয়াসিটি, ডেস্‌ময়েনিস্, সেন্টলুই, ইণ্ডিয়ান পোলিস্, মিনিয়াপোলিস্, ডেট্রয়েট, হার্টফোর্ড, বাকেলো, বষ্টন, কেম্ব্রিজ, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, ব্রুকলীন এবং নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ক'রে বহু বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে নানা কারণে তিনি টাকার বিনিময়ে বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ ক'রে দেন।* কিন্তু এই ব্যাপক ভ্রমণের ফলে আমেরিকাবাসীদের সম্বন্ধে তাঁর অনেক কিছু জানবার সুযোগ হয়েছিল।

২৩শে জুন ১৮৯৪, শিকাগো থেকে স্বামীজী মহীশূরের ভূতপূর্ব মহারাজকে তৎকালীন আমেরিকার লোকদের ধর্মভাবের অভাব সম্বন্ধে লিখছেন, "...মিশনারিগণ ভারতবর্ষে তাঁদের দেশের লোকের ধর্ম-প্রবণতা সম্বন্ধে যতই বাজে গল্প করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ লোকের ভিতর

* স্বামীজী ঐ সময়ে জনৈক মাদ্রাজী শিষ্যকে লিখেছিলেন, "..ডেট্রয়টের বক্তৃতায় আমি ৯০০ ডলার অর্থাৎ ২৭০০৲ টাকা পেয়েছিলাম; অন্যান্য বক্তৃতায় একটাতে এক ঘণ্টায় ২৫০০ ডলার অর্থাৎ ৭৫০০৲ টাকা রোজগার হয়। কিন্তু আমাকে দিয়েছিল ২০০ ডলার মাত্র।...একটা জুয়োচোর বক্তৃতা-কোম্পানী আমায় ঠকিয়েছিল। আমি তাদের সংস্রব ছেড়ে দিয়েছি।" বক্তৃতা দিয়ে স্বামীজী যে টাকা পেয়েছিলেন তা তিনি গোপনে ভারতের নানা জনহিতকর শিক্ষা ও নারী-প্রতিষ্ঠানাদিতে দান করেন। অনেক দুঃস্থ লোকের সাহায্যও তা'তে হ'য়েছিল।

জোর এক কোটি নব্বই লক্ষ লোকে একটু একটু ধর্ম ক'রে থাকে। অবশিষ্ট লোকে কেবল পান-ভোজন ও টাকা-রোজগার ছাড়া আর কিছুতে মাথা ঘামায় না। পাশ্চাত্যেরা আমাদের জাতিভেদ সম্বন্ধে যতই তীব্র সমালোচনা করুক না কেন, তাঁদের আবার আমাদের অপেক্ষা জঘন্য জাতিভেদ আছে—অর্থগত জাতিভেদ। আমেরিকানরা বলে 'সর্বশক্তিমান ডলার' এখানে সব করতে পারে ; এদিকে আবার গরিবদের টাকা নেই। নিগ্রোদের (যাদের অধিকাংশ দক্ষিণ ভাগে বাস করে) উপর তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তব্য এই, উহা পৈশাচিক। সামান্য অপরাধে তাদিগকে বিনা বিচারে জীবিত অবস্থায় গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে মেরে ফেলে। এদেশে যত আইন-কানুন অন্য কোন দেশে তত নেই, আবার এদেশের লোকে আইনের যত কম মর্য্যাদা রেখে চলে, আর কোন দেশে তত নয়।

মোটের উপর আমাদের দারিদ্র হিন্দুরা এই পাশ্চাত্য দেশবাসীদের অপেক্ষা অনেক বেশী নীতিপরায়ণ। এঁদের ধর্ম হয় ভণ্ডামি, না হয় গোঁড়ামি।...এঁরা নূতন আলোকের জন্য ভারতের দিকে তাকিয়ে আছেন। মহারাজ, আপনি না দেখলে বুঝতে পারবেন না, এঁরা পবিত্র বেদের গভীর চিন্তারাশির অতি সামান্য অংশও কত আদরের সঙ্গে গ্রহণ ক'রে থাকেন। কারণ বিজ্ঞান ধর্মের উপর যে পুনঃ পুনঃ তীব্র আক্রমণ করছে, বেদই কেবল তাকে বাধা দিতে পারে এবং ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান ক'রতে পারে। এঁদের শূন্য হ'তে সৃষ্টি এই মতে, আত্মা সৃষ্টপদার্থ এই মতে—স্বর্গনামক স্থানে সিংহাসনে উপবিষ্ট একজন মহাক্রূর ও অত্যাচারী ঈশ্বর আছেন এই মতে, অনন্ত নরক এই মতে—সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই বিরক্ত ; আর সৃষ্টির অনাদিত্ব এবং আত্মা ও আত্মায় অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে বেদের গভীর উপদেশসকল কোন না কোন আকারে এঁরা অতি দ্রুত গ্রহণ করছেন। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে

জগতের সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তিই আমাদের পবিত্র বেদের শিক্ষানুযায়ী আত্মা ও সৃষ্টি উভয়েরই অনাদিত্বে বিশ্বাসবান হ'বেন, আর ঈশ্বরকে আত্মারই সর্বোচ্চ পূর্ণ অবস্থা ব'লে বুঝবেন। এখন হ'তেই এঁদের সকল বিদ্বান পুরোহিতগণই এভাবে বাইবেলের ব্যাখ্যা ক'রতে আরম্ভ করেছেন। ভারতবর্ষে যে সকল মিশনারী দেখতে পান, তারা কোনরূপেই খৃষ্টধর্মের প্রতিনিধি নয়। আমার সিদ্ধান্ত এই, পাশ্চাত্যেগণের আরো ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন, আর আমাদের আরো ঐহিক উন্নতির প্রয়োজন।..."

সতর

সম্মেলনের পরেই আমেরিকাতে ঠিক ঠিক কার্য আরম্ভ করেন স্বামীজী। প্রথম ভূমিকর্ষণ ও পরে বীজবপন।

কিন্তু বিবেকানন্দের এই বিরাট সম্মান ও সাফল্যে তাঁর দেশবাসী প্রতিনিধিবৃন্দ এত বেশী ঈর্ষান্বিত হয়েছিল যে, তারা স্বামীজীর প্রতিষ্ঠাকে খর্ব করবার জন্য কোন প্রচেষ্টাই অযোগ্য মনে করেনি। তারা মিশনারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নানা মিথ্যা প্রচার ক'রতে লাগল! স্বামীজী কিন্তু তা গ্রাহ্য করতেন না। তিনি নিজের পথে এগিয়ে যেতেন। ঐ সময়ে তিনি একজন গুরুভাইকে লিখেছিলেন, "...ভয় কার? কাদের ভয় রে ভাই! এখানে মিশনারী ফিশনারী চেঁচিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছে—অমনি সকল জগৎ হ'বে।" যীশুর রক্ত ধরিত্রীকে উর্বর করেছিল। বাধা ও অত্যাচারকে তিনি 'স্বাগতম' জানিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের যারা বিরোধিতা ক'রেছিল তারা শুধু করুণার পাত্র নয়, ধন্যবাদেরও পাত্র। তাতে করেই জগৎবাসী বুঝেছিল যে, বিবেকানন্দ ভগবৎ

প্রেরিত দূত।' * আর তিনি জানতেন যে "সম্পূর্ণ নীরবতাই হচ্ছে সমুচিত প্রতিবাদ।" "Cyclonic Hindu" (ঝঞ্ঝাবেগশালী হিন্দু) সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে চলল। 'উপেক্ষা উপেক্ষা উপেক্ষা'—এই ছিল তাঁর সাফল্যের মূলমন্ত্র। তিনি আরো বলেছিলেন—"ন হি কল্যাণকৃত কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"—(কল্যাণকারীর কখনো দুর্গতি হয় না—গীতা।) এক চিঠিতে এ শ্লোকটিও উদ্ধৃত করেন—

"নিন্দন্তু নীতিনিপুনাঃ যদি বা স্তুবন্তু, লক্ষ্মীসমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং। অদ্যৈব বা মরণমস্তু শতান্তরে বা, ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ" (ভর্তৃহরি)—নীতিনিপুনগণ নিন্দাই করুন বা স্তুতিই করুণ, লক্ষ্মী আসুন বা যেখানে ইচ্ছা যান, আজই মরণ হো'ক বা শত শত বৎসর পরে, ধীর ব্যক্তিগণ ন্যায়পথ হ'তে কখনো বিচলিত হ'ন না।"...

বিবেকানন্দ বক্তৃতাকোম্পানির সংশ্রব ছেড়ে দিলেন। কিন্তু আমেরিকা-বাসী তাঁকে আরো ঘনিষ্টভাবে পাবার ও জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'ল। বহু প্রতিষ্ঠান সভাসমিতি গির্জা মহিলা-প্রতিষ্ঠান সংশোধনাগার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশিষ্ট লোকের বাড়িতে তিনি আহুত হ'লেন। তিনিও ভারতীয় প্রথা অনুসারে প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখে ধর্মদান ক'রতে লাগলেন। ঐ সময়ে তাঁকে প্রতি সপ্তাহে 'বার চৌদ্দ বা ততোধিক বক্তৃতা' প্রদান করতে হ'ত, যার প্রভাবে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে ধর্মচিন্তার এক যুগান্তর উপস্থিত হ'ল। বেদ বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক চিন্তা ও নবতম ব্যাখ্যার দ্বারা হ'ল সনাতন হিন্দুধর্মের নবরূপায়ন। তিনি সর্বত্রই

* স্বামীজীর এক চিঠিতে দেখতে পাই :..."এটা হচ্ছে চরিত্রের প্রভাব, পবিত্রতার প্রভাব, সত্যের প্রভাব, ব্যক্তিত্বের প্রভাব। যতদিন এগুলি আমার থাকবে ততদিন...কেউ আমার মাথার একগাছা কেশও স্পর্শ করতে পারবে না।...প্রভু আমার সঙ্গে সদা সর্বদা রয়েছেন।...চিরকালের মত জেনে রেখো যে, প্রভু আমার হাত ধরে নিয়ে চলেছেন।"

বহুলোকের অন্তরে প্রকৃত ধর্মলাভের স্পৃহা জাগিয়ে তুললেন। স্বামীজীর পদতলে বসে ধর্মশিক্ষা করার ইচ্ছাও কম লোকের প্রাণে জাগ্রত হয়নি।*...

এদিকে ধর্ম মহাসভায় এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বিবেকানন্দের সাফল্যের বার্তা ভারতবাসীদের অন্তর আলোড়িত ক'রল। হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্র পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে, স্কুল-কলেজে পথে ঘাটে বাটে বিবেকানন্দ হ'লেন আলোচনার বিষয়। এই বীর সন্ন্যাসীর বিজয়ে ভারতবাসী মাত্রেই হ'ল গর্বিত।

রামনাদের ও খেতড়ির রাজা বিশেষ দরবারে আড়ম্বরের সঙ্গে প্রজাবৃন্দের নিকট ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী বিবেকানন্দের বিজয়কাহিনী ঘোষণা ক'রলেন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও মাদ্রাজ সহরের খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক এক বিরাট সভায় স্বামীজীর বিজয় ও প্রচারকে অভিনন্দিত ক'রে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। বাংলাদেশেও কম জাগরণের সৃষ্টি হয় নি। কলিকাতায় শিক্ষিত বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যেও বিশেষ সাড়া পড়ে গেল। খবরের কাগজে, বক্তৃতা ও আলোচনায় স্বামীজীর উচ্চ প্রশংসা হ'ল ঘোষিত। কলিকাতা টাউন-হলে রাজা প্যারীমোহন মুখার্জী পি, এস, আই'বাহাদুরের সভাপতিত্বে লোকাকীর্ণ সভায় হিন্দু জাতির পক্ষ হ'তে সর্বসম্মতিক্রমে স্বামীজী ও আমেরিকাবাসীদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

* ঐ সময়ে স্বামীজীর এক চিঠিতে আছে, "এদেশে একটি বীজ পুঁতেছি—সেটি ইতিমধ্যে চারা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।...আমি কয়েকশত অনুরাগী শিষ্য পেয়েছি।...প্রত্যেক কাজকেই তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়—উপহাস বিরোধ ও পরিশেষে গ্রহণ।...আগামী বর্ষে আমি তাদের এমনভাবে সংঘবদ্ধ করব যাতে তারা কর্মক্ষম হ'তে পারে। তখন কাজটা চলতে থাকবে।"

সভাপতি মহোদয় শিকাগো ধর্মসভার সভাপতি ও স্বামীজীর নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে পত্র লিখলেন।

ঐ পত্রের উত্তরে ডাঃ ব্যারোজ রাজা প্যারীমোহন মুখার্জীকে লিখেছিলেন, "প্রিয় মহাশয়! কালিকাতার টাউন-হলের বিরাট সভার বিবরণসহ আমাকে যে পত্র লিখেছেন, তা আমি এইমাত্র পেলুম। আমি এতে সাতিশয় আনন্দিত হয়েছি। শিকাগোর ধর্মমহামণ্ডলীতে আপনার বন্ধু স্বামী বিবেকানন্দ সসম্মানে গৃহীত হয়েছিলেন। তিনি বাগ্মিতাশক্তিবলে চুম্বকের আর্ষণের ন্যায় সকলকেই আকৃষ্ট ক'রেছিলেন এবং স্বীয় ব্যক্তিগত প্রভাব সম্যগ্‌রূপে বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর যত্নে লোকের চিন্তা ও ধর্মানুশীলনে আগ্রহ বিশেষভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে। প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা ও আলোচনার বন্দোবস্ত হচ্ছে। আমেরিকার জনসাধারণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গভীর প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা পোষণ করছে। আমাদের বিশ্বাস যে, আপনাদের সুপ্রাচীন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হ'তে আমাদের অনেক বিষয় গ্রহণ করতে হ'বে।"

যারা সভায় উপস্থিত হ'তে পারেনি—সুদূর পল্লীগ্রামবাসীরা পর্যন্ত ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তানের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল! যেন যাদু-করের শক্তিতে ভারতের ত্রিশ কোটি নরনারী জেগে উঠল আনন্দকোলাহল করতে করতে। ভারতগগন পূর্ণ হ'য়ে গেল বিবেকানন্দের সৌরভময় জয়গাথাতে।

বিবেকানন্দ কিন্তু পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যে বীজ বপন করেছিলেন, তা'রই অঙ্কুর-উদ্গমনের পরিবেশ সৃষ্টি করছিলেন। তিনি ১৮৯৫ ফেব্রুয়ারী হ'তে নিউইয়র্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন এবং তাঁর অবশিষ্ট সময় নিয়োজিত হ'ল কতকগুলি সত্যনিষ্ঠ অনুরাগী ধর্মপিপাসু উৎসাহী নরনারীকে ধর্মশিক্ষা দেবার কাজে। জ্ঞানযোগ ও রাজযোগের বক্তৃতাগুলির ফল এত

সুন্দর হয়েছিল যে, অল্প দিনের মধ্যেই বহু লোক তাঁর কাছে যোগমার্গের শিক্ষা গ্রহণের জন্য সমবেত হ'তে লাগল। তারা যোগশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন ক'রে পদ্মাসনে বসে যোগসাধনায় ব্রতী হ'ল। তাঁর রাজ-যোগের বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর আমেরিকার শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে এমনই আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ঐ গ্রন্থের তিনটি প্রকাশনের প্রয়োজন হয়।

ইতিমধ্যে আমেরিকার অনেক প্রসিদ্ধ লোক তাঁর অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ও শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ম্যাডাম মেরী লুইস, মিসেস ওলি বুল, ডাঃ এলান ডে, মিস ওয়াল্ডো, প্রোঃ ওয়াইন ম্যান, প্রোঃ রাইট, ডাঃ ষ্ট্রীট, মাদাম কালভে, মিঃ ও মিসেস্ লেগেট, মিস্ ম্যাক্লাউড প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে অনেকেই স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে বেদান্তপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।...*

* * *

পাশ্চাত্য বিজয়ে মত্ত হয়ে স্বামীজী তাঁর ভারতকে ভুলেন নি। প্রতীচ্যে তিনি "Hindoo monk of India"—তাঁর বাণী ছিল ধর্মের বাণী, বেদান্তের বাণী। কিন্তু ভারতে তিনি 'Patriot Saint of india'—দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতার ঋত্বিক—বিবেকানন্দ। প্রাচ্যের জন্য ধর্ম ও বেদান্তের বাণী ছাড়াও ছিল স্বাধীনতার বাণী, উদ্বোধন কর্ম ও সংগঠনের বাণী। দুঃস্থ পদদলিত প্রপীড়িত রুগ্ন ও মূর্খদের উদ্ধার ক'রে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করার বাণী। তাই তিনি পাশ্চাত্যদেশে থেকেই সমগ্র ভারতে বিভিন্ন কেন্দ্র ও শাখাকেন্দ্র স্থাপন ক'রে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলবার জন্য তাঁর শিষ্যবর্গ ও

* স্বামীজী ১৮৯৬, মার্চ মাসে আমেরিকা থেকে আলাসিঙ্গাকে লিখছেন, "...ইতিমধ্যেই আমার দু'জন সন্ন্যাসী শিষ্য ও কয়েক শত গৃহস্থ শিষ্য হ'য়েছে, কিন্তু বৎস, জনকয়েক ছাড়া তাদের অধিকাংশই গরিব। তবে জনকয়েক খুব ধনীও আছে। এসংবাদটি এখনই প্রকাশ ক'রে দিয়ো না যেন।..."

গুরুভ্রাতাদের আহ্বান করলেন, ও গ্রামে গ্রামে গিয়ে জনহিতকর কার্য ও গরিব এবং তথাকথিত নীচজাতির ঘরে ঘরে শিক্ষা বিস্তারে আত্মোৎসর্গ করার উপদেশ দিলেন। বলেছিলেন, "...আমি বলি—'দরিদ্র দেবো ভব, মুর্খ দেবো ভব'– দরিদ্রমূর্খ অজ্ঞানী কাতর এরাই তোমার দেবতা হোক, এদের সেবাই পরম ধর্ম জানবে।"

স্বামীজীর মনের এক গভীর স্তরে ভারতের চিন্তা স্থান পেয়েছিল। আমেরিকা হ'তে তিনি মাদ্রাজের তরুণ শিষ্যদের যে সকল উদ্দীপনাপূর্ণ পত্র লিখেছিলেন তাতে "ভারতের জনসাধারণকে জাগ্রত করবার" সুরটিই বিশেষ করে ঝঙ্কৃত হ'ত। আর ছিল দেশসেবা এবং জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করার তুর্য-ধ্বনি।

২০শে আগষ্ট, ১৮৯৩, আমেরিকা থেকে আলাসিঙ্গাকে লেখা চিঠিতে স্বামীজীর মর্মবেদনার গভীরতা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। তিনি লিখছেন, "...কাল রমণী-কারাগারের অধ্যক্ষ মিসেস্ জন্সন্ মহোদয়া এখানে এসেছিলেন। (এখানে কারাগার বলে না, বলে সংশোধনাগার)। আমেরিকায় যা যা দেখলুম, তারমধ্যে এটি অদ্ভুত জিনিষ। কারাবাসীদের সঙ্গে কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন তাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, আবার তারা ফিরে গিয়ে সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিণত হয়! কি অদ্ভুত, কি সুন্দর! তোমাদের না দেখলে বিশ্বাস হবে না। এটি দেখে তারপর যখন দেশের কথা ভাবলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হ'য়ে উঠল। ভারতবর্ষে আমরা গরিবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভেবে থাকি! তাদের কোন উপায় নেই, পালাবার কোন রাস্তা নেই, উঠবার জো নেই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত ও পাপীদের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নেই।...রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করছে!...শোন বন্ধু!...হিন্দু-

ধর্ম তো শিক্ষা দিচ্ছেন, জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব।...হিন্দুধর্মের মত আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম এরূপ করে না। ভগবান আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন, এতে ধর্মের কোন দোষ নেই।..."

তিনি অন্য চিঠিতে লিখেন, "...আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য আর সকল দেবতাকেই মন থেকে বিদায় দিতে হ'বে। একমাত্র জাগ্রত দেবতা—আমার জাতি।...এই বিরাটের পূজাই আমাদের প্রধান পূজা হ'বে।...সর্বপ্রথম আমরা যে দেবতার পূজা ক'রব তাঁরা হ'লেন আমাদের স্বদেশবাসী।"

দেশের চরম দারিদ্র্য দূর করবার জন্য কার্যকরী শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রতে তিনি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সার্বভৌম বেদান্তের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজে শিষ্যদের 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকা প্রকাশের জন্য টাকা পাঠিয়ে উৎসাহিত ক'রলেন। স্বামীজীর উদ্বোধন বাণী আকাশে বিলীন হ'য়ে যায়নি—বহু প্রাণে দুর্জয় অনুপ্রেরণারূপে তা প্রবেশ ক'রল। রোমাঞ্চিত ভারত তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল। মাদ্রাজে ও কলিকাতায় দু'টি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপিত হ'ল। আরো নানাভাবে তাঁর গুরুভ্রাতৃগণ গঠনমূলক প্রচারকার্যে ব্রতী হ'লেন। স্বামীজীর প্রাণে একটি বড় শক্তিশালী সঙ্ঘ-স্থাপনা করার পরিকল্পনা ছিল। জাতীয় উন্নতির জন্য সংহতির কতটা প্রয়োজন, তা পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে তিনি বিশেষ ক'রে হৃদয়ঙ্গম করেন। তিনি তাঁর এক গুরুভ্রাতাকে লিখেন, "...তোমাদের জাতির মধ্যে organisation (সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করার) শক্তির একেবারেই অভাব। ঐ অভাবই সকল অনর্থের কারণ। পাঁচজনে মিলে একটা কাজ করতে একেবারেই নারাজ। Organisation-এর

জন্য প্রথম আবশ্যক obedience (আজ্ঞাবহতা)..." এইভাবে স্বামীজী আমেরিকায় ব'সেই ভারতে তাঁর কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করতে লাগলেন।

* * *

অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তায় স্বামীজীর শরীর এত দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল যে শিষ্যগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হ'লেন! একটু বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন। সুযোগও উপস্থিত হ'ল। এক শিষ্যা সেণ্ট লরেন্স নদীর মধ্যস্থিত 'থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে' (সহস্রদ্বীপোদ্যানে) তাঁর বাড়িতে বিশ্রামের জন্য স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করলেন। স্থানটি অতি নির্জন, গাছপালা-বেষ্টিত। বিশাল নদীবক্ষে আরো ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপ। স্বামীজী ঐ প্রস্তাবটি ঈশ্বরপ্রেরিত বলে মনে ক'রলেন এবং ক্রমে বারজন শিষ্যসহ দেড়মাসকাল ঐ নির্জন স্থানে বাস করেন (১৮৯৫)। তিনি অধিকাংশ সময়ই ধ্যানে অতিবাহিত করতেন। ঐ ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা আনন্দপ্রদ বিশ্রাম। বাকী সময় ব্যয়িত হ'ত শিষ্যদের ধর্মজীবন-গঠনে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় শিষ্যদের নিয়ে তিনি ধ্যানের ও শাস্ত্রালোচনার ক্লাশ করতেন।

প্রথম দিন বাইবেলের জন-লিখিত সুসমাচার অবলম্বন ক'রে আলোচনা আরম্ভ হয়। পরে বেদান্তসূত্র গীতা উপনিষদ যোগদর্শন নারদভক্তিসূত্র অবধূত-গীতা প্রভৃতি গ্রন্থও আলোচনা ও অধ্যাপনার বিষয় হ'ল। তিনি যে সব প্রাণস্পর্শী ধর্মোপদেশ দিতেন তা-ই অবলম্বনে মিস্ ওয়ালডো নামক জনৈক শিষ্যা Inspired Talks বা দেববাণী-গ্রন্থ সংকলন করেন। যে বারজন শিষ্য স্বামীজীকে ঐ পরিবেশের মধ্যে পাবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন, তাঁদের দু'জন তাঁর কাছে সন্ন্যাস-দীক্ষা ও পাঁচজন ব্রহ্মচর্য-ব্রত গ্রহণ ক'রেন। অন্য সকলেও তাঁকে গুরুত্বে বরণ করলেন। বৃক্ষলতা-শোভিত দ্বীপমধ্যে নির্জন স্থানে বাস ক'রে তিনি পরমানন্দিত হ'ন। মাঝে মাঝে তিনি নিজের

হাতে রান্না ক'রে শিষ্যদের ভারতীয় খাবার খাওয়াতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরাণাদি অবলম্বনে কত নীতিপূর্ণ গল্প বলতেন।...

স্বামীজী নিউইয়র্কে ফিরে এসে আবার প্রচারকার্যে লেগে গেলেন। নিয়মিত ক্লাশ নেওয়া ছাড়াও. নানা স্থানে বক্তৃতার জন্য তিনি আহূত হ'তেন। এদিকে বিধাতার ইচ্ছায় ইউরোপে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীপ্রচারের জন্য ভূমি প্রস্তুত হচ্ছিল। কয়েকজন ইংরাজ বন্ধু স্বামীজীকে ইংলণ্ডে যাবার জন্য বারবার অনুরোধ করে লিখলেন,—"এখানে বেদান্ত প্রচারের বিস্তৃত ক্ষেত্র প'ড়ে আছে। আপনি এলেই সব ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে।" এই আহ্বানের মধ্যে তিনি ভগবানের ইঙ্গিত দেখতে পেলেন। ঠিক ঐ সময়ে নিউইয়র্কের জনৈক ধনাঢ্য বন্ধু প্যারিস হ'য়ে ইংলণ্ড যাচ্ছিলেন। তিনি স্বামীজীকে তাঁর সঙ্গী হবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। স্বামীজী তাঁর সঙ্গে আগষ্টের মাঝামাঝি যাত্রা করলেন।...প্যারিসে তিনি নেপোলিয়ানের সমাধিস্থান, চিত্রশালা গির্জা মিউজিয়াম প্রভৃতি দ্রষ্টব্যস্থান গুলি দেখে বিশেষ পুলকিত হ'লেন। স্বামীজী কোথাও অজ্ঞাত থাকতেন না। এখানেও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'ল।...

আঠার

ইংলণ্ডে পদার্পন করবার পূর্বে ইংরেজ জাতি বিজিত জাতির একজন হিন্দু প্রচারককে কিভাবে গ্রহণ করবে তা তাঁর বিশেষ চিন্তার বিষয় ছিল। কিন্তু

কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর মন দ্বিধাশূন্য হ'ল। তিনি মিস্ মূলার ও মিঃ ষ্টার্ডি প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর আমন্ত্রণে লণ্ডনে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের বাড়িতে থেকেই মধ্যাহ্নে লণ্ডনের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে বেড়াতেন। সকাল-সন্ধ্যায় আলোচনা-ক্লাশ হ'ত, এবং যারা দেখা করতে আসতেন, তাঁদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতেন। মহাতেজা ঐ তরুণ সন্ন্যাসী কয়েক দিনের মধ্যেই বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর নাম চারিদিকে প্রচারিত হ'ল। তিন সপ্তাহের মধ্যেই বিশিষ্ট ক্লাব ও সোসাইটিগুলি তাঁকে আমন্ত্রণ করতে লাগল। অভিজাতবর্গ ও শিক্ষিত সমাজের বহু নরনারী, এমন কি ধর্মযাজকরা পর্যন্ত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'লেন। সংবাদপত্রগুলি তাঁর প্রশংসামুখর হ'ল। *

২২শে অক্টোবর (১৮৯৫) তিনি পিকাডিলিস্থ প্রিন্সেপ-হল-এ 'আত্মজ্ঞান' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তার প্রভাব সম্বন্ধে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকা লিখেছিলেন, "...সে দিন এক ভারতীয় যুবক প্রিন্সেপ-হলে বক্তৃতা দিয়েছিল। রাজা রামমোহন রায়ের পর এক কেশব সেন ব্যতীত ভারতবাসীর মধ্যে এমন উৎকৃষ্ট বক্তা আর কখনো ইংলণ্ডের বক্তৃতামঞ্চে দৃষ্ট হয় নি।... বক্তৃতা প্রদানকালে তিনি মহাত্মা বুদ্ধ বা যীশুর দু-চারিটি কথার তুলনায় রাশি রাশি কলকারখানা, বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গ্রন্থাদি দ্বারা মানবজাতির যে কত সামান্য উপকার সাধিত হচ্ছে তৎসম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ ক'রেন। বক্তৃতা কালে তিনি কোন স্মারক-লিপির সাহায্য নেন নি। তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর ও বক্তৃতাকালে মুখে একটি কথাও আটকায় না।..."

রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডে দীর্ঘকাল প্রচারের ফলে যে

* ..."ইংরেজ জাতি সহজে নূতনভাব গ্রহণ করতে চায় না। কিন্তু তাদের মনে একবার কোন ভাব প্রবেশ করাতে পারলে তা তারা কিছুতেই ত্যাগ করে না"।—এই বৈশিষ্ট্যটুকু স্বামীজী প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই আবিষ্কার ক'রেছিলেন।

স্থান অধিকার করেছিলেন, বিবেকানন্দ একটিমাত্র বক্তৃতায় সে স্থান অধিকার করলেন। তাঁর প্রত্যেকটি বক্তৃতাই বহু সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত হ'ত। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি এত প্রসিদ্ধিলাভ করলেন যে, বহু কাগজের সংবাদ-দাতারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। ২৩শে অক্টোবর ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গেজেটের সংবাদদাতা লেখেন, "...স্বামীজী যখন কথা বলেন, তাঁর মুখ বালকের মুখের স্থায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে—মুখখানি এতই সরল অকপট ও সদ্ভাব-পূর্ণ।...আমার সঙ্গে যত লোকের সাক্ষাৎকার হয়েছে তার মধ্যে ইনি যে একজন মৌলিক ভাবপূর্ণ ব্যক্তি, একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি!"

স্বামীজী ইংরেজ জাতির বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার ক'রে তাদের অন্তর অধিকার ক'রলেন এবং তাদের গুণগ্রাহিতায় হ'লেন মুগ্ধ। তাই তিনি ভারতের আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য ইংলণ্ডকে উপযুক্ত স্থান মনে করতেন। তাঁর চিঠিতে দেখতে পাই: "...ইংরেজদের সম্বন্ধে আমার ধারণা আমূল পরিবর্তিত হয়েছে।...বৃটিশ সমাজের শত ত্রুটি সত্ত্বেও কোন ভাবধারা প্রচারের যন্ত্র হিসাবে তা সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি আমার চিন্তাগুলিকে এই জাতির কেন্দ্রস্থলে রাখতে চাই! তাহ'লে সেগুলি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে।..."

ইংরাজ জাতি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—"ইংরেজ জাতির উপর আমা-অপেক্ষা অধিক ঘৃণার ভাব নিয়ে আর কেউই বৃটিশভূমিতে পদার্পণ করেনি।... এখানে এমন কেউই উপস্থিত নেই, যিনি ইংরেজ জাতিকে আমার চাইতে বেশী ভালবাসেন।"

ইংলণ্ডের অভিজাত মহলে ব্যক্তিবিশেষের বাড়িতে যেসব বড় বড় আলোচনা সভা হ'ত, তার একটি সুন্দর চিত্রও সংবাদপত্রে দেখা যায়, "... বাস্তবিকই লণ্ডনের গণ্যমান্য পরিবারভুক্ত মহিলাগণকে চেয়ারের অভাবে ঠিক ভারতীয় শিষ্যদের মতো সশ্রদ্ধভাবে গৃহতলে পা গুটিয়ে বসে বক্তৃতা শুনতে

দেখা এক বিরল দৃশ্য।...স্বামীজী ইংরেজ জাতির হৃদয়ে ভারতের প্রতি যে প্রেম ও সহানুভূতির সঞ্চার করেছেন, তা ভারতের উন্নতির পক্ষে বিশেষ অনুকূল হ'বে।" 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়, "...আমরা আনন্দের সঙ্গে লিখছি যে স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনস্থ বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর হিন্দুদর্শন ও যোগসম্বন্ধীয় ক্লাশগুলিতে বহু উৎসাহী ও শ্রদ্ধাবান শ্রোতৃমণ্ডলী উপস্থিত থাকেন।"

স্বামীজী তিনবার লণ্ডনে এসেছিলেন। ১৮৯৫এ প্রায় তিন মাস, ১৮৯৬এর প্রথম ভাগে প্রায় চার মাস এবং ১৮৯৬র শেষের দিকে প্রায় তিন মাস প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁর বেদান্ত-প্রচার খুবই সাফল্য-মণ্ডিত হ'য়েছিল। তার ফলস্বরূপ তিনি এমন কয়েকজন ব্রিটিশকে পেয়েছিলেন যারা তাঁর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের মধ্যে মিস্ মুলার, জে, জে, গুড্উইন, মিস্ মার্গারেট নোব্ল, (ভগ্নী নিবেদিতা) এবং মিষ্টার ও মিসেস সেভিয়ার-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের অনেকেই ভারতের সেবায় আত্মোৎসর্গ ক'রেছিলেন।

স্বামীজীর প্রচারের ফল কতটা গভীর ও সুদূর প্রসারী হয়েছিল তা বুঝবার পক্ষে বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পালের ১৮৯৮এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজে লেখা পত্রখানি বিশেষ সাহায্য করবে।* তিনি

---

* তিনি লিখেছেন,..."ভারতে কতকলোকের ধারণা যে ইংলণ্ডে বিবেকানন্দের বক্তৃতা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি, তাঁর বন্ধু ও সমর্থকগণ সামান্য কার্যকেই অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করেছেন; কিন্তু আমি এখানে এসে সর্বত্রই তাঁর অসাধারণ প্রভাব দেখছি। ইংলণ্ডে আমি বহুব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করেছি, যাঁরা প্রকৃত পক্ষেই বিবেকানন্দের উপর গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন। যদিও আমি তাঁর সমাজভুক্ত নই এবং এও সত্য যে, তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ আছে। তবু আমি বলতে বাধ্য যে, তিনি সত্য সত্যই বহুলোকের চোখ খুলে দিয়েছেন ও তাদের হৃদয় উদার ও প্রশস্ত করছেন। তাঁর প্রচার-কার্যের ফলেই আজকাল বহুলোক বিশ্বাস করে যে, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র সমূহে বহু আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত আছে। তিনি জনসাধারণের মনে কেবলমাত্র এসব ভাবই প্রদান করেন নি, পরন্তু তিনি ভারত ও ইংলণ্ডকে এক স্বর্ণময় যোগসূত্র দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধনে কৃতকার্য হ'য়েছেন।

স্বামীজীর ইংলণ্ড-ত্যাগের ১৪ মাস পরে ওদেশে গিয়েছিলেন। তখনো স্বামীজীর প্রচারের প্রভাব তিনি লক্ষ্য করেন। প্রাচীন পন্থীরা হিন্দুধর্ম বলতে যা বোঝে, স্বামীজী সেই হিন্দুধর্ম প্রচার ক'রতে লণ্ডনে যাননি। 'ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গেজেটের' সংবাদদাতার প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন, "...কোন নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট আমি যে বার্তা পেয়েছি তা-ই জগতে প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য। এবং আমার বিশ্বাস বেদান্তের উদারভাবরাশি সকল ধর্মসম্প্রদায়ই নিজ নিজ ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তা গ্রহণ ক'রতে পারে।"

তাঁর উদার ভাবে সংবাদদাতা এতটা প্রভাবান্বিত হ'য়েছিলেন যে, তিনি লণ্ডনে ভারতীয় যোগী' নামে স্বামীজীর সম্বন্ধে ঐ কাগজে বিশেষ তথ্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।...

লণ্ডনে স্বামীজীর কাজ বেশ এগুচ্ছিল, কিন্তু আমেরিকা থেকে শিষ্যগণ তাঁকে ফিরে যাবার জন্য ক্রমাগত চিঠি লিখতে থাকায় আমেরিকার কাজের স্থায়িত্বের বিষয় চিন্তা ক'রে তিনিও ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হন।

লণ্ডন থেকে স্বামীজী ১৮ই নভেম্বর ১৮৯৫ তারিখে আলাসিঙ্গাকে লিখছেন, "...ইংলণ্ডে আমার কাজ বাস্তবিক খুব চমৎকার হয়েছে, আমি

"আমি ইতিপূর্বে মিঃ হাউইস্ লিখিত 'The Dead pulpit" নামক প্রবন্ধ হ'তে "Vivekanandism" সম্বন্ধে যে অংশটি উদ্ধৃত করেছি তাতেই আপনি অবগত হয়েছেন যে, বিবেকানন্দ-প্রচারিত মতবাদের প্রসারতা হেতু বহুব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টান চার্চের বন্ধন ছিন্ন করেছে।...তাছাড়া আমি বহু শিক্ষিত ইংরেজকে দেখেছি, যাঁরা ভারতকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন এবং ভারতীয় ধর্মমত ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ শ্রবণ করার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ ক'রে থাকেন।" শুধু ইংরেজ জাতির মধ্যে নয়, বিবেকানন্দের প্রচারের ফলে সমগ্র এংলো-স্যাক্সন জাতির মধ্যে ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টি সম্বন্ধে জানবার এবং সেগুলি জাতীয় জীবনে পরিণত করার প্রচেষ্টা সক্রিয় হ'য়েছিল।

নিজেই আশ্চর্য হ'য়ে গেছি। ইংরাজরা খবরের কাগজে বেশী বকে না, কিন্তু তারা নীরবে কাজ করে।...দলে দলে লোক আসছে, কিন্তু এত লোকের তো আমার জায়গা নেই। সুতরাং বড় বড় সম্রান্ত মহিলা ও আর আর সকলেই মেজের উপর আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসে। আমি তাদের কল্পনা ক'রতে বলি যে, তারা যেন ভারতের আকাশতলে শাখাপ্রশাখা সমন্বিত বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষের নীচে ব'সে আছে—আর তারা অবশ্য এ ভাবটা পছন্দই করে।

আমাকে আগামী সপ্তাহেই এখান থেকে চলে যেতে হবে—তাই এরা ভারি দুঃখিত। কেউ কেউ ভাবছে, আমি যদি এত শীঘ্র চলে যাই, আমার এখানকার কাজের ক্ষতি হবে। আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি কোন লোক বা জিনিষের ওপর নির্ভর করি না—একমাত্র প্রভুই আমার ভরসা এবং তিনি আমার ভেতর দিয়ে কাজ করছেন।"

কিন্তু ইংলণ্ড ত্যাগের পূর্বে স্বামীজী কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুকে আরব্ধ কার্য চালিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে মিঃ ষ্টার্ডি প্রমুখ শিষ্যগণ উপনিষদ অবলম্বনে বিভিন্নস্থানে ধর্মালোচনা চালাতে লাগলেন।...

লণ্ডন হ'তে স্বামীজী ফিরে এলেন নিউইয়র্কে, এবং তাঁর কাজ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য গঠনমূলক কাজে হ'লেন ব্রতী। ভারতবর্ষ হ'তে প্রচারকরূপে তাঁর গুরুভাইদের আনার ব্যবস্থাও তিনি ক'রলেন। এদিকে ভারতের ডাকের মধ্যে যে করুণ সুর ছিল, তা তাঁর মনকে কম চঞ্চল করেনি। অথচ আমেরিকার কাজটি সুপ্রতিষ্ঠিত করার পূর্বে তিনি ভারতে ফিরে যেতে পারেন না। ঐ সময় স্বামীজীকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হচ্ছিল, যা তাঁর স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর ছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্য করতেন না।

তিনি তাঁর কাজকে স্থায়ী করবার জন্য লোক তৈরী করায় মন দিলেন, যারা তাঁর অনুপস্থিতে, যে অঙ্কুরটির উদ্গমন হ'য়েছে, তা বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তিনি নিউইয়র্কে 'বেদান্ত সমিতি' স্থাপন ক'রলেন।* বষ্টন ও অন্যান্য সহরেও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রে, শিষ্য ও ছাত্রদের সহযোগে প্রচারকার্য চালাতে লাগলেন।

তাঁর বাণীর জন্য তৃষ্ণার্ত নরনারীর ভিড় হত। তারা আসত ক্লাব হ'তে, বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে। শুদ্ধচেতা খ্রীষ্টান ও স্বাধীনচেতা মনীষীরা এলেন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে। আবার এল সংশয়বাদীরা ও সমালোচকেরা। তিনি সকলকেই গ্রহণ করলেন এবং নির্বিচারে তাঁর যা দেবার ছিল, তা দিয়ে যেতে লাগলেন। এংলো-স্যাকসন্ জাতির মধ্যে যা গুণ ছিল, ভাল ছিল, তা তিনি উপেক্ষা করেন নি; এবং যা দোষ ছিল তারও তীব্র সমালোচনা করতে ক্ষান্ত হ'ন নি। পাশ্চাত্যের অর্থনীতি, শিল্পব্যবস্থা, জনশিক্ষা যাদুঘর কলকারখানা বিজ্ঞানের প্রগতি, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও বিভিন্ন জনহিতকর কাজ—এ সবেরই তিনি প্রশংসা করেছেন, এবং ভারতের উন্নতির জন্য এসবের প্রবর্তন যে বিশেষ প্রয়োজন তা তিনি অন্তরে সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার ইহলোক-সর্বস্ব-ভোগস্পৃহা, স্বর্ণের অপবিত্র পূজা, সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বগ্রাসিতা, অন্য জাতের রক্ত শোষণ ক'রে নিজের দেহ পুষ্ট করা—এ সব সাম্য ও মৈত্রীর কত বিরোধী তাও তিনি কঠোর ভাষাতে প্রকাশ করেছেন। বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্বের কল্যাণকামনাই ক'রে গিয়েছেন, তার কল্যাণের পথই দেখিয়ে গিয়েছেন। তার মধ্যে প্রধান ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের সভ্যতাকে

---

*১৮৯৬, ফেব্রুয়ারীতে স্বামীজী নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি স্থায়ীভাবে স্থাপন করেন। মিষ্টার ফ্রান্সিস্ এইচ লেগেট প্রেসিডেন্ট এবং স্বামীজীর অন্যান্য দীক্ষিত শিষ্যগণ বিভিন্ন কার্যকারক নির্বাচিত হন।

'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকার প্রথম খণ্ডে ২০৭ পৃষ্ঠাতে পাওয়া যায় যে, ১৮৯৫ খৃঃ নভেম্বরে স্বামীজী নিউইয়র্কে বিভিন্ন কার্যনির্বাহকসহ একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু ঐ সমিতির এবং তার কাজকর্মের অন্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ("রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাস"—৬৭ পৃষ্ঠা।)

মিলিত ক'রে বিশ্বে মৈত্রী সংস্থাপন করা। অতএব এ মিলনের পরিপন্থী সব-কিছুই ছিল তাঁর সমালোচনার বিষয়। এমন কি ইংলণ্ডেও তিনি বণিক-সমৃদ্ধি, শোণিত-লোলুপ যুদ্ধ ও অসহিষ্ণু ধর্মমতের প্রতি তীব্র কটাক্ষ ক'রেছিলেন—"...এই মূল্যে নিরীহ হিন্দুরা তোমাদের শূণ্যগর্ভ আস্ফালন-পূর্ণ সভ্যতার অনুরাগী হ'বে না।"...

পাশ্চাত্যের জন্য তাঁর কাজ ছিল ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদকে বহন ক'রে সেখানে নিয়ে যাওয়া। আর ভারত তথা প্রাচ্যের জন্য তিনি ধনসম্পদ ও শক্তি-অর্জনের উপায়-স্বরূপ বিজ্ঞানকে নিতে চেয়েছিলেন। এই আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানের বিনিময়দ্বারা তিনি পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে নূতন সভ্যতা গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হ'য়েছিলেন। বহু শতাব্দীর পরে ভারতীয় সংস্কৃতি আবার বিবেকানন্দের ভিতর দিয়ে নির্গমন-পথ ক'রে নিয়েছিল। * সমগ্র বিশ্বের স্থায়ী কল্যাণের জন্য এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল ও আছে।

স্বামীজীর পাশ্চাত্য-গমন একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। তা বিধাতার বিশ্বকল্যাণ-পরিকল্পনার অংশ-বিশেষ।...

স্বামীজী কখনো নোট লিখে বক্তৃতা দিতেন না, সেজন্য তাঁর অধিকাংশ বক্তৃতাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে—তার কোন লিখন এখন পাওয়া সম্ভব নয়।

*স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ দান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "...অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দ পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণ ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার মিলন করিবার সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। ...তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ-রচনায় নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" (রামকৃষ্ণ-মিশন শিক্ষামন্দির, বেলুড়মঠ-প্রকাশিত, সমীপন ১৯৬১, ২য় সংখ্যা)।

বিবেকানন্দ ছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনসেতু-স্বরূপ। সমগ্র বিশ্বে সাম্য ও মৈত্রী স্থাপনের গুরুদায়িত্ব তিনি কাঁধে নিয়েছিলেন। তাঁর ঐ শুভ প্রচেষ্টা কতটা ফলপ্রদ হ'য়েছে ইতিহাস তা প্রমাণ ক'রবে।

ধর্মসম্মেলনের পরে স্বামীজী যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে দুবৎসর যাবৎ যে শত শত বক্তৃতা দিয়েছিলেন ও আলোচনাদি করেছিলেন, তা যদি রক্ষিত হ'ত তো তাথেকে সহস্র সহস্র পৃষ্ঠার গ্রন্থ হ'তে পারত। কিন্তু ঐ সকল বক্তৃতা রক্ষার কোনই ব্যবস্থা হয়নি। ১৮৯৫ সালের শেষভাগে তিনি নিউইয়র্কে ফিরে আসার পরে, তাঁর শিষ্যগণ বক্তৃতাগুলি রক্ষার জন্য পর পর দুজন সাংকেতিক-লিপিকার নিযুক্ত করলেন। কিন্তু ফল সন্তোষজনক হ'ল না। স্বামীজী যে বিষয়ে বক্তৃতা করতেন লিপিকারগণ ঐ বিষয-বস্তুর সঙ্গে পরিচিত না থাকায় এবং তিনি অত্যন্ত দ্রুত বলতেন ব'লে তাঁর বক্তৃতার রিপোর্ট রাখা সম্ভব হ'ল না।

ঐ হতাশার সময়ে দৈবক্রমে জে, জে, গুডউইন নামক একজন ইংরেজ সাংকেতিক-লিপিকার পাওয়া গেল, যিনি স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি লিখে রাখতে সক্ষম হ'লেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি স্বামীজীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ও তাঁর চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে স্বামীজীর বক্তৃতা ও আলোচনাগুলি অতি সুন্দরভাবে লিখে রাখতে লাগলেন। ঐ সময়ের পরে, কি পাশ্চাত্যে কি ভারতবর্ষে, স্বামীজীর বক্তৃতা যা পুস্তকাকারে পাওয়া যাচ্ছে সমস্তই গুডউইনিয়ের কীর্তি।* স্বামীজী কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হ'ল।...

---

*স্বামীজী গুডউইনকে খুবই স্নেহ করতেন। বলতেন, "My faithful Goodwin"— আমার বিশ্বস্ত গুডউইন। স্বামীজীর পাশ্চাত্য দেশ হ'তে প্রত্যাবর্তনের পরে ১৮৯৮ সালের কোন সময়ে গুডউইন 'মাদ্রাজমেইল' কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরী নিয়ে মাদ্রাজে চলে যান, এবং ১৮৯৯এর ২রা জুন উতকামণ্ডে "Enteric Fever"এ আক্রান্ত হ'য়ে হঠাৎ মারা যান। ঐ সময়ে তাঁর কাছে সাংকেতিক লেখা স্বামীজীর বহু বক্তৃতা ছিল। তিনি চাকরী নেবার পরে সে বক্তৃতাগুলি প্রচলিত ইংরেজীতে লিখে দেবার সময় পান নি। ঐভাবে স্বামীজীর অনেক বক্তৃতা ও কথোপকথন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। স্বামীজীর সব বক্তৃতাবলি প্রকাশিত হ'লে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার নানাভাবে আরো বেশী সমৃদ্ধ হ'ত।

নিউইয়র্কের কার্য সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে স্বামীজী গুডউইনকে সঙ্গে নিয়ে ডেট্রয়েটে পনর দিনের জন্য গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে তিনি নিজেকে যেন বিলিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রতিদিন বক্তৃতা ছাড়াও তাঁকে বহু লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনাদি করতে হ'ত। তাঁর শেষের দিনের বক্তৃতা সম্বন্ধে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা, "ডেট্রয়েটের জনসাধারণকে তিনি শেষ দর্শন দেন বেথেল মন্দিরে। স্বামীজীর জনৈক অনুরাগী ভক্ত র‍্যাবাই লুই গ্রোসম্যান ঐ ইহুদী-মন্দিরের পূজারী ছিলেন। সে দিন রবিবার, সন্ধ্যাকাল এবং জনতা এত অধিক হয়েছিল যে, আমাদের ভয় হচ্ছিল পাছে লোক বিহ্বল হ'য়ে কি একটা কাণ্ড ক'রে বসে! রাস্তার উপরেও অনেকদূর পর্যন্ত লোকের ভিড়, এবং আরো শত শত লোক ফিরে যাচ্ছিল। বিবেকানন্দ সেই বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্র-মুগ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'পাশ্চাত্য জগতের প্রতি ভারতের বাণী এবং সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ'। তাঁর বক্তৃতা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়েছিল।"...

ডেট্রয়েটের কর্মভার তাঁর শিষ্য স্বামী কৃপানন্দের উপর দিয়ে স্বামীজী এলেন বষ্টনে। ঐ সময়ে তিনি শত শত অনুরাগী শ্রোতার সামনে বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। তার মধ্যে 'এলেন জিমনেশিয়ামে' চারটি, কেম্ব্রিজে ওলি বুলের বাড়ীতে দুটি, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বুধমণ্ডলীর সামনে একটি এবং 'বিংশশতাব্দী' সভায় বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বেদান্তদর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-দর্শনের অধ্যাপক হবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, "আমি সন্ন্যাসী। চাকরী কি ক'রে করব?"

ইতিমধ্যে স্বামীজীর 'কর্মযোগ' ও 'ভক্তিযোগ' বই দু'খানি প্রকাশিত হ'য়ে

আমেরিকার চিন্তাশীল মনস্তত্ত্ববিদ্ ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বামীজীর স্নায়ুমণ্ডলী বিশেষ দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল। তিনি যে সার্বভৌম বেদান্ত প্রচার করতেন তাতে সকল ধর্ম ও মতবাদের স্থান ছিল। সেজন্য তাঁর মনে একটি বিশ্বমন্দির (Universal Temple) নির্মাণের পরিকল্পনা ক্রমেই রূপ নিয়েছিল, যেখানে সকল ধর্ম, মতবাদ ও সম্প্রদায়ের লোক, সব কলহ ঈর্ষা ও মতদ্বৈধ ভুলে গিয়ে সমবেত-ভাবে নিজ নিজ ভগবানকে উপাসনা করবে। *

বেদান্তধর্মকে পাশ্চাত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ক্যালিফর্ণিয়ার ক্যাট্‌স্‌কিল পাহাড়ের উপর ১০৮ একর জমি নিয়ে, তাঁর শিষ্যবর্গ ও বেদান্তের ছাত্রদের ভজন-সাধনের জন্য কতকগুলি কুটীর নির্ম্মাণের ইচ্ছাও স্বামীজীর ছিল। †

আমেরিকায় 'ভারতের বাণী' সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে স্বামীজীর জীবনীশক্তি প্রায় নিঃশেষ হ'য়েছিল। তবু তিনি তা করেছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে

*স্বামীজী ঐ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত ক'রে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর পরবর্তী পতাকাবাহী স্বামী ত্রিগুণাতীত ১৯০০ সালে স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত 'The Vedanta Society of San Fransisco'তে ১৯০৯ সালে 'Hindu Temple' নামে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলের উপাসনার জন্য প্রথম বেদান্তমন্দির নির্মাণ করেন। ঐ মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির ফলে ঐ কেন্দ্রের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ ১৯৫৯ সালে সানফ্রানসিস্‌কোতে সকল ধর্মাবলম্বীর উপাসনালয়রূপে আর একটি মন্দির নির্মাণ ক'রেছেন। হলিউড কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দও বৃহত্তর স্যাণ্টো বার্বারা নামক স্থানে একটি বেদান্তমন্দির স্থাপন ক'রেছেন। বর্তমানে আমেরিকায় যে দশটি স্বামী কেন্দ্র আছে, প্রত্যেক কেন্দ্রেই বিশ্বমন্দিরের ভাবানুযায়ী উপাসনালয় স্থাপিত হ'য়েছে।

স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ সানফ্রানসিস্‌কো থেকে ৮০ মাইল দূরে সান এন্টোন ভ্যালিতে এক জনবিরল স্থানে ঐ জাতীয় কাজ আরম্ভ করেছিলেন। অনুরূপ একটি বিরাট আশ্রম সানফ্রানসিস্‌কো শহরের অনতিদূরে ওলিমায় দুহাজার একর ব্যাপী পার্বত্য বনভূমিতে স্বামী অশোকানন্দের চেষ্টায় গড়ে উঠছে। যুক্তরাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশের পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সোসাইটি কর্তৃক ১২০ একর ব্যাপী বনানীর মধ্যে সাধন-ভজনের উপযোগী আর একটি আশ্রমও স্থাপিত হয়েছে। অন্যান্য দু'একটি কেন্দ্রেও ছোট 'রিট্রিট' আছে। এই ভাবে স্বামীজীর পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে।

ঐ দেশের কাজ যাতে ভালভাবে চলে সেজন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি বহু অনুরাগী ভক্তকে বেদান্তধর্মে দীক্ষিত করেন এবং অনেকে তাঁর কাছে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস-ব্রত নিয়ে বেদান্ত-প্রচারে রত হন। এইরূপে আমেরিকার 'শীর্ষস্থানীয়' বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক লেখক-লেখিকা—স্বামীজীর ভাবের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও অনুরক্ত হন।

আমেরিকার কাজে স্বামীজী যখন এইভাবে ব্যস্ত, তখন ইংলণ্ডের শিষ্য-বর্গের কাছ থেকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান আসতে লাগল। ইংলণ্ডের কর্ষিত ভূমিতে বীজবপনের সময় আগত। তিনিও প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। পূর্ব ব্যবস্থামত স্বামী সারদানন্দ তাঁকে সাহায্য করার জন্য ভারতবর্ষ হ'তে যাত্রা করেছেন। ১৮৯৬, ১লা এপ্রিল তিনি লণ্ডনে অবতরণ করলেন; স্বামীজীও ১৫ই এপ্রিল নিউইয়র্ক হ'তে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। কিন্তু যাত্রার পূর্বে আমেরিকার যন্ত্রটি শেষ চালিত করলেন সবেগে।

উনিশ

লণ্ডনে পৌঁছে সারদানন্দকে দেখে স্বামীজী বিশেষ আনন্দিত হন। উভয়েই একত্রে মিঃ ষ্টার্ডির বাড়িতে থেকে প্রচার কার্য আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারদানন্দকে প্রচারকরূপে গ'ড়ে তোলাও স্বামীজীর অন্যতম কাজ ছিল।

তিনি গুরুভ্রাতাকে নানাভাবে শিক্ষা দেওয়া ছাড়া বিশিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত ক'রে দিলেন।

মে মাসের প্রথমেই নিয়মিত ভাবে জ্ঞানযোগের ক্লাশ আরম্ভ হয়। তা ছাড়া তিনি পিকাডিলি পিকচার-গ্যালারি, প্রিন্সেপ-হল, বিভিন্ন আলোচনা সভা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, এ্যানি বেসান্তের বাড়ী এবং অনেক ঘরোয়া বৈঠকে বক্তৃতা করেন। ইংলণ্ডের শ্রোতাদের চিন্তাশীলতার ভাব তিনি লক্ষ্য ক'রেছিলেন। রক্ষণশীলতাও তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি তাঁর প্রিয়তম গুরুদেব-সম্বন্ধেও কোথাও কোথাও ব'লেছিলেন।…

যুক্তরাষ্ট্রে স্বামীজী কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীকে বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ জাতির দানগুলি স্বামীজীর কাজে আরো বেশী সাহায্য ক'রে।

লণ্ডনে অবস্থান কালে স্বামীজী ও পণ্ডিত-প্রবর ম্যাক্সমূলারের মিলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ম্যাক্সমূলার ইতিপূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হ'ন। তাঁকে 'পূর্বাকাশে উদীয়মান নক্ষত্র ও অধুনাতম অবতাররূপে' তিনি ঘোষণা করেন। কেশবচন্দ্র সেনের সহসা ধর্মমত পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান ক'রতে গিয়েই তিনি রামকৃষ্ণকে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন এবং তখন হ'তেই তিনি ঐ মহাপুরুষের জীবনী ও বাণী যতটুকু পেতেন সংগ্রহ ক'রে 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকায় 'প্রকৃত মহাত্মা' নামে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরে একটি প্রবন্ধ লেখেন,যাতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। স্বামীজী পূর্বেই ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে দেখা করবেন স্থির করেছিলেন। তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ আমন্ত্রণ পেয়ে স্বামীজী ১৮৯৬এর ২৮শে মে অক্‌সফোর্ডে বৃদ্ধ প্রফেসারের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। দু'জনের মিলন খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য হিসাবেই বিবেকানন্দ তাঁর কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

স্বামীজী ইউরোপের বৃদ্ধ প্রোফেসারকে প্রাচীন আর্য-ঋষিদের অবতার

বলে সম্বোধন করেন।* শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামীজী যেমন বললেন, "আজকাল সহস্র সহস্র নরনারী রামকৃষ্ণদেবের পূজা করছে", অমনি বৃদ্ধের বদনমণ্ডল আনন্দোজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তিনি আবেগভরে উত্তর দিলেন, "এঁর মত লোককে যদি পূজা না করে তো কাকে করবে?" তিনি উৎসাহের সঙ্গে আরো জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আপনারা তাঁকে (পরমহংসদেবকে) জগতের কাছে পরিচিত করবার জন্য কি ক'রছেন?" পরে তিনি বললেন যে, যদি প্রয়োজনীয় উপাদান এনে দেওয়া হয় তো তিনি সানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি জীবনী লিখতে প্রস্তুত আছেন।† স্বামীজী প্রশ্ন ক'রলেন, "আপনি কবে ভারতে যাবেন? যিনি আমাদের ঋষিদের চিন্তাসমূহ শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা ক'রেছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য সকলেই অতি আনন্দের সঙ্গে প্রস্তুত

* ম্যাকস্‌মূলারের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে স্বামীজী এতই খুশী হয়েছিলেন যে, তিনি মান্দ্রাজের 'ব্রহ্মবাদিন্‌' পত্রিকার জন্য ৬ই জুন (১৮৯৬, তারিখে যে পত্র প্রেরণ করেন তা দ্রষ্টব্য।...উদ্বোধন-কার্যালয়-প্রকাশিত "হিন্দুধর্মের নবজাগরণ" পুস্তিকায় ম্যাকস্‌মূলার ও পল ডয়সনের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাতের বিবরণ তাঁর নিজের লেখা চিঠির অনুবাদ রূপে বে'র হয়েছে। তাতে দুপক্ষেরই গভীর আন্তরিকতা আমাদের চমৎকৃত করে।

† শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনীর উপাদান সংগ্রহের জন্য স্বামীজীর লণ্ডন থেকে রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠির একাংশ। "২৪শে জুন, ১৮৯৬। প্রিয় শশী, শ্রীজীর সম্বন্ধে ম্যাকস্‌মূলারের লিখিত প্রবন্ধ আগামী মাসে প্রকাশিত হ'বে। তিনি তাঁর একখানি জীবনী লিখতে রাজী হ'য়েছেন। তিনি শ্রীজীর সমস্ত বাণী চান। সব উক্তিগুলি সাজিয়ে তাঁকে পাঠাও অর্থাৎ কর্ম সম্বন্ধে সব একজায়গায়, বৈরাগ্য সম্বন্ধে অন্যত্র, ঐরূপ ভক্তি জ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে।

তোমাকে এ কাজ এখনই শুরু করতে হ'বে। শুধু যে সব কথা ইংরাজীতে অচল, সেগুলি বাদ দিও। (হাগা, পেচ্ছাব, থুথু, মাগী, শরীরের অনাবিষ্কার্য স্থান ইত্যাদি)। বুদ্ধি ক'রে সে সকল জায়গায় যথা সম্ভব অন্য কথা দিবে।..."কামিনী-কাঞ্চনকে" "কাম-কাঞ্চন" করবে— Lust and gold etc,—অর্থাৎ তাঁর উপদেশে সর্বজনীন ভাবটা প্রকাশ করা চাই। এই চিঠি কাহাকেও দেখাবার আবশ্যক নাই। তুমি উক্ত কার্য সমাধা ক'রে সমস্ত উক্তির ইংরাজী তর্জমা classify (শ্রেণীবিভাগ) ক'রে, 'প্রোফেসার ম্যাকস্‌মূলার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ইংলণ্ড' এই ঠিকানায় পাঠাবে।"...স্বামীজী সারদানন্দকেও উপাদান-সংগ্রহে নিয়োজিত করেছিলেন। ঐ সংগৃহীত উপাদান-অবলম্বনে ম্যাকস্‌মূলার "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা ক'রেছিলেন।

থাকবে সন্দেহ নেই।" অধ্যাপক উচ্ছ্বসিত ভাবে বললেন, "তা হ'লে হয়তো আমি আর ফিরব না। আমার দেহ সেখানেই সমাহিত ক'রতে হবে।"...

রাত্রে স্বামীজী যখন ট্রেনের জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন, তখন বৃদ্ধ অধ্যাপক ঝড় বৃষ্টি মাথায় ক'রে ষ্টেশনে হাজির হ'লেন। তাঁকে দেখে স্বামীজী বিশেষ কুণ্ঠা প্রকাশ ক'রে বললেন, "এ দুর্যোগের মধ্যে আপনি এত কষ্ট ক'রে কেন এলেন?" অধ্যাপক গদ্ গদ্ স্বরে উত্তর দিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের একজন যোগ্যতম শিষ্যের দর্শন-লাভের সৌভাগ্য প্রতিদিন হয় না।" ঐ মর্মস্পর্শী কথা ক'টি স্বামীজীকে বিশেষ অভিভূত ক'রেছিল। তিনি আজীবন অধ্যাপকের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন।...

ম্যাকস্‌মূলারের সঙ্গে দেখা হবার পরে ৩০শে মে, ১৮৯৬ লণ্ডন থেকে স্বামীজী মিসেস্ বুলকে লিখেছিলেন, "গত পরশু ম্যাকস্‌মূলারের সহিত আমার দেখা হ'য়ে গেল। তিনি একজন ঋষিকল্প লোক; তার বয়স ৭০ বৎসর হ'লেও তাঁকে যুবা দেখায়। এমন কি তাঁর মুখে একটি বার্ধক্যের রেখাও নেই। হায়! ভারতবর্ষ ও বেদান্তের প্রতি তাঁর যেরূপ ভালবাসা তার অর্ধেক যদি আমার থাকত! তার উপর তিনি যোগশাস্ত্রের প্রতিও অনুকূলভাব পোষণ করেন। এবং উহাতে বিশ্বাস করেন। তবে বুজরুকদের তিনি একদম দেখতে পারেন না।

সর্বোপরি রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপর তাঁর ভক্তি অগাধ এবং তিনি তার সম্বন্ধে 'নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরির' জন্য একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তাঁকে জগতের সমক্ষে প্রচার করবার জন্য কি করছেন?' রামকৃষ্ণ তাঁকে অনেক বৎসর যাবৎ মুগ্ধ করেছেন। ইহা কি একটা সুসমাচার নয়?..."

ঐ সময়ে স্বামীজী বক্তৃতাদি ছাড়াও সপ্তাহে ৫টি ক্লাশ ও ১টি প্রশ্নোত্তর ক্লাশ নিতেন। এভাবে জুলাই মাস পর্যন্ত প্রচার-কার্য চালিয়ে তিনি সেভিয়ার-দম্পতি ও মিস্ মূলারের সঙ্গে ইউরোপ-ভ্রমণে বের হ'লেন। বিশ্রামের জন্য সকলেই প্রথমে গেলেন সুইজারলণ্ডে। একদিন বেড়াতে বেড়াতে পাহাড়ের উপর একটি ছোট্ট উপাসনা-মন্দিরে তিনি মেরীর পাদপূজা করেন। মন্দিরের পূজারীর আপত্তি থাকতে পারে মনে ক'রে, তিনি নিজে না গিয়ে মিসেস সেভিয়ারের হাতে দেবীর পাদপূজার ফুল দিয়ে বলেন, "ইনিও মা।" অন্য সময়ে জনৈক শিষ্য ম্যাডোনার মূর্তি এনে স্বামীজীকে আশীর্বাদ করতে বলাতে—তিনি শ্রদ্ধাবনত শিরে শিশু-যীশুর পাদস্পর্শ ক'রে ব'লেছিলেন, "আমি যদি তখন উপস্থিত থাকতাম, তাহ'লে শুধু চোখের জল দিয়ে নয়—বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম।"...

কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা গেল। বরফের ঠাণ্ডা হাওয়া, জলপ্রপাত ও পার্বত্য শোভা দেখে স্বামীজী বিশেষ পুলকিত হন—হিমালয়ের কথা স্মরণ হ'ত। ঠিক ঐ সময়ে জার্মানীর কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক পল ডয়সন স্বামীজীকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার নিমন্ত্রণ করেন। ঐ আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য তিনি কীল-এ প্রোফেসারের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। বেদান্তচর্চাই অধ্যাপকের একমাত্র জীবনব্রত ছিল। আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রোফেসার বলেন, "...বেদ ও বেদান্তের উচ্চ চিন্তারাশি ক্ষণকালের মধ্যেই মনকে উন্নত আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যে নিয়ে যায়।...মানুষের চিন্তা সত্যের সন্ধানে যে-সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে, উপনিষদ্ বেদান্তদর্শন ও শাঙ্করভাষ্য তার শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি।"

স্বামীজীর সঙ্গে বেদান্ত ও উপনিষদ আলোচনাতে প্রোফেসার এত মুগ্ধ হ'লেন যে, তিনি স্বামীজীকে কিছুদিন তথায় অবস্থান করার অনুরোধ

জানালেন। কিন্তু লণ্ডনের কাজের জন্য তা সম্ভব নয় জানতে পেরে তিনি নিজেই স্বামীজীর সঙ্গে বেদান্ত-আলোচনার জন্য পুনরায় হামবুর্গে মিলিত হন এবং সকলে হল্যাণ্ডের রাজধানী আমষ্টারডাম শহরে তিন দিন থেকে একসঙ্গে লণ্ডনে এলেন। স্বামীজীর বক্তৃতাদি শুনে বেদান্তের মর্মার্থ উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল প্রোফেসারের অন্তরে।

লণ্ডনে দু সপ্তাহকাল প্রতিদিন তাঁদের সাক্ষাৎ হ'ত। পাশ্চাত্যের এই দু'জন শ্রেষ্ঠ মনীষীর সম্বন্ধে স্বামীজী 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় লিখেছিলেন, "...ভারতবর্ষ নিজেকে যতদূর জেনেছে, তার চাইতেও এ মনীষীদ্বয় অনেক বেশী জেনেছেন। এ দু'জন মনীষীর নিকট ভারতবর্ষ বিশেষভাবে ঋণী।" যে ম্যাকস্‌মূলার সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর বেদের গবেষণা করেছেন, সেই মহাজনকে স্বামীজী আর্যঋষির অবতার বলতেন।

* * *

ইতোমধ্যে স্বামী সারদানন্দ নিউইয়র্কে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে বেদান্ত-প্রচারকার্য আরম্ভ করেছেন। স্বামীজীও লণ্ডনে ফিরে কয়েকদিন বিশ্রামের পর ৮ই অক্টোবর থেকে নিয়মিত বক্তৃতা ও ক্লাশ আরম্ভ করলেন। ঐ প্রচারের ফল হ'য়েছিল প্রচুর। ইংলণ্ডের ধর্মযাজকদের চিন্তাও তা-দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং বহু মনীষী স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে উপকৃত হয়েছিলেন।

পূর্ব ব্যবস্থামত ইতিমধ্যে তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দও লণ্ডনে পৌঁছেছেন। স্বামীজী নবাগত প্রচারককে প্রস্তুত ক'রে কর্মক্ষেত্রে নামাবার ব্যবস্থা করলেন। ২৭শে অক্টোবর ব্লুমস্‌বেরি স্কোয়ারে তাঁর পরিবর্তে অভেদানন্দ অতি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। স্বামীজী বিশেষ সন্তুষ্ট হ'ন এবং প্রচারকার্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি সুখী হ'লেন। প্রতীচ্যে বেদান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। স্বামীজী এক সময়ে বলেছিলেন, "...বিশ জন কর্তব্যপরায়ণ

কর্মক্ষম প্রচারক পেলে ২০ বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য-ভূখণ্ডকে বেদান্তের ভাবে ভাবিত করতে পারি।" *

ভারতের চিন্তা তাঁর অন্তর অধিকার করেছে। সমগ্র ভারত তাঁর বাণী গ্রহণ করবার জন্য উদগ্রীব। তিনি এক সময়ে জনৈক শিষ্যকে লিখেছিলেন, "ভারতের বাইরে প্রদত্ত একটি আঘাত ভিতরে প্রদত্ত সহস্র আঘাতের সমান।" পাশ্চাত্যে তিনি যে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছেন, তার প্রতিধ্বনি ভারতকে রোমাঞ্চিত করেছে, জাগ্রত করেছে। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত। স্বামীজীর প্রাণে ভারতের গঠনমূলক কাজ রূপ নিয়েছিল। তিনি ভারতে লিখলেন যে, প্রথমে মাদ্রাজ কলিকাতা ও হিমালয়ে এক একটি কেন্দ্র স্থাপন ক'রে কাজ আরম্ভ করতে চান। এবং ক্রমে বোম্বাই এলাহাবাদ ও সমগ্র ভারতে কেন্দ্র স্থাপন করবেন।...

স্বামীজী প্রথমবার ইংলণ্ডে এসে যে ভূমিকর্ষণ করেছিলেন, দ্বিতীয়বার এসে তাতে করেছিলেন বীজবপন। তিনি নানা স্থানে তাঁর বাণী প্রচার করতে লাগলেন। তার ফলও হয়েছিল অভাবনীয়। মনীষী ও চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ তাঁর সঙ্গে বেদান্ত আলোচনা করতে এসে তাঁর যুক্তিগুলিকে শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হ'লেন। তাঁর বক্তৃতাদিতে এত লোক হ'ত যে স্থানাভাবে শত শত লোক দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনত। সংবাদপত্রগুলি তাঁর প্রশংসায় শত-মুখ হ'ল।

* বেলুড়মঠ কর্তৃক মে, ১৯৬২তে প্রকাশিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জেনারেল রিপোর্টে দেখা যায়—বর্তমানে আমেরিকায় বিভিন্ন স্থানে ১০টি প্রধান কেন্দ্র এবং ৮টি রিট্রীট্, এবং আর্জেনটিনা ইংলণ্ড ও সুইজারলণ্ডে একটি করে স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সর্বসমেত ১৮ জন সন্ন্যাসী ও কয়েকজন ব্রহ্মচারী-দ্বারা এই বিরাট প্রচারকার্য পরিচালিত হচ্ছে। (ফরাসী দেশেও একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে—লেখক।)

১৮৯৬ খৃঃ, ১৮ই জানুআরি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা স্বামীজীর প্রচার-কার্য সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "...আমরা আনন্দের সঙ্গে লিখছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনস্থ বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর হিন্দু-দর্শন ও যোগ সম্বন্ধীয় ক্লাশগুলিতে বহু উৎসাহী ও শ্রদ্ধাবান শ্রোতৃমণ্ডলী উপস্থিত থাকেন। লণ্ডনস্থ জনৈক সংবাদদাতা লিখেছেন—'লণ্ডন সহরের কতিপয় বিভবশালিনী সম্ভ্রান্ত মহিলা চেয়ারের অভাবে মেজেতে পা মুড়ে বসে গুরুভক্ত ভারতীয় শিষ্যের ন্যায় ভক্তিভরে স্বামীজীর উপদেশ শুনছেন—এ বাস্তবিকই বিরল দৃশ্য।' আমরা শুনেছি যে ক্যান্‌নস, হেজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক তিনি বিশেষ সম্মানে গৃহীত হয়েছেন। প্রথমোক্ত মহোদয়ের বাড়ীতে স্বামীজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি 'লেভী' আহুত হয়েছিল, তাতে লণ্ডনের অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।"...

১৮৯৬, ১০ই জুন 'দি লণ্ডন ডেলি ক্রনিকল' কাগজে দেখা যায়—"স্বামীজী একজন বিখ্যাত বেদান্তবাদী। তাঁর আচরণ অনন্যসাধারণ, আকৃতি চিত্তাকর্ষক। তাঁর গভীর দার্শনিক তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যাপ্রণালী ও ইংরাজী ভাষার ব্যুৎপত্তি দেখলে বুঝা যায়, কেন আমেরিকাবাসিগণ তাঁকে এত সমাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন। তিনি নাম যশ ও পার্থিব সুখভোগের বাসনা বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁকে কোন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত বলা যায় না। কারণ তিনি স্বাধীন চিন্তাধারা সকল ধর্ম হ'তেই কিছুনা কিছু সত্য গ্রহণ করেছেন।"...

তিনি শুধু বেদান্তই প্রচার করেন কি। বেদান্তের তত্ত্বগুলি যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে সেজন্য বলগর্বিত পাশ্চাত্য সভ্যতার আমূল সংস্কারের জন্যও তাঁর চেষ্টা বড় কম ছিল না। ঐ সভ্যতা মানবমনে সর্বগ্রাসী বুভুক্ষা জাগিয়েছিল। ভোগবিলাসই জীবনের মূলমন্ত্র। অতৃপ্ত তৃষ্ণা মানবমনকে অশান্ত করেছে,

জগতকে নিয়ে বলেছে ধ্বংসের দিকে। এর প্রতিকার একমাত্র বেদান্তের বাণীতে। তাই পাশ্চাত্যের বুকে দাঁড়িয়েই তিনি বলেছিলেন, "সাবধান, আমি দিব্য চক্ষে দেখছি, সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতা একটা আগ্নেয়গিরির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেটা যে-কোন মুহূর্তে অগ্নি উদগীরণ ক'রে পাশ্চাত্য জগৎকে ধ্বংস ক'রে ফেলতে পারে। এখনো যদি তোমরা সাবধান না হও, তা হ'লে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তোমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।"...

বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎবাণী হুবহু সত্য হ'তে চলেছে। বিগত দুই মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম এবং তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিধ্বংসকারী বিরাট-আয়োজনের দিকে তাকালে আমাদের প্রাণ হু হু করে উঠে। কিন্তু এখনো মদমত্ত দর্পীদের মনে সুবুদ্ধির উদয় হচ্ছে না। বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে বিশ্বধ্বংসের কাজে না লাগিয়ে মানবজাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্যবর্ধনে যদি লাগান হ'ত।...বোধ হয় আরো বড় রকমের ধ্বংসের প্রয়োজন নূতন সৃষ্টির জন্য, নূতন গঠনের জন্য।...

ঐ সময়ে জনৈক ইংরেজ বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "স্বামীজী, এ ক'বৎসর পাশ্চাত্যে বাসের পরে ভারতবর্ষ আপনার কেমন লাগবে?" আবেগভরে তিনি উত্তর দেন, "পাশ্চাত্য দেশে আসবার পূর্বে আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসতাম, কিন্তু এখন ভারতের বায়ু, এমনকি ভারতের প্রতিধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র। ভারতভূমি পবিত্রভূমি, ভারত আমার পরম পবিত্র তীর্থ।"...

স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে মনস্থির করে মাদ্রাজে ও অন্যত্র শিষ্যদের লিখলেন। সেভিয়ার-দম্পতি ও গুডউইন্ স্বামীজীর সঙ্গে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। মিস্ মূলার ও মিস্ নোবলও ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারকল্পে স্বামীজীর অনুগমন করবেন।

বন্ধু ছাত্র ও শিষ্যবর্গের প্রাণ স্বামীজীর বিরহচিন্তায় ভারাক্রান্ত। বিরাট বিদায়-সভায় শত শত নরনারী উপস্থিত। অনেকেরই চোখে জল। অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হ'ল। স্বামীজীও তার জবাব দিলেন। তিনি লণ্ডন-বাসিদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হ'য়েছিলেন।

* * *

১৮৯৬, ১৬ই ডিসেম্বর সেভিয়ার-দম্পতিসহ স্বামীজী লণ্ডন ত্যাগ ক'রে ডোভার ক্যালে ও মণ্টসেনিসের পথে এলেন ইতালিতে। রোম তাঁকে অভিভূত করেছিল। ক্যাথলিকদের সঙ্ঘঠনশক্তি ও প্রচারের উদ্যম তাঁর প্রাণে নানা চিন্তার উদ্রেক করে। তাদের উপাসনা-পদ্ধতির সঙ্গে হিন্দুধর্মানুষ্ঠানের সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে তিনি বিস্মিত হন।·· রোম হ'তে নেপলস্। গুডউইন এখানে মিলিত হলেন। ৩০শে ডিসেম্বর নেপ্‌লস্ হ'তে জাহাজ ছাড়ল। ১৮৯৭-এর ১৫ই জানুআরী ঐ জাহাজ কলম্বো পৌঁছবার কথা।···

পাশ্চাত্য দেশ পেছনে রেখে স্বামীজী এগিয়ে চলেছেন প্রাচ্যের দিকে। যাবার সময় ঠিক তার উল্‌টো ছিল। কয়েকজন মাত্র সঙ্গী, তাই গভীর চিন্তার প্রচুর অবকাশ পেলেন। স্বামীজীর সমগ্র মনপ্রাণ ভারতের চিন্তায় ডুবে গেল। পাশ্চাত্য থেকে তিনি কি রিক্ত হস্তে ফিরছেন? না, তিনি নিয়ে যাচ্ছেন বহু সঞ্চয়—সব-কিছু ভারতের উন্নতির কাজে লাগাবেন। পাশ্চাত্যের সংগঠনশক্তি বিজ্ঞান কর্মপরতা অদম্য উৎসাহ—এসব ভারতের জাতীয়-জীবনের জন্য দরকার। কিন্তু কিভাবে তা কাজে লাগাবেন তা-ই হ'ল তাঁর চিন্তার বিষয়।

দরিদ্রদের তিনি ভোলেন নি। এও তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন যে, গণতন্ত্রের দেশেও বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে যদিও ততটা ব্যবধান' দেখা যায় না, তথাপি ওসব দেশেও নিপীড়িত মানুষের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়।

তাই তাঁর অন্তরের বেদনাবোধ সকল গণ্ডিরেখা অতিক্রম ক'রে সমগ্র বিশ্বের দরিদ্র ও অবহেলিতদের জন্য প্রবাহিত হয়েছিল।...সমগ্র জগতের শূদ্রশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে হ'বে—এই ছিল তাঁর পণ।...

ডেট্রয়েটে কয়েকজন শিষ্যের নিকট তিনি একদিন বলেছিলেন, "...বাস্তবিকপক্ষে বলতে গেলে আমার কার্যের প্রকৃত আদর হ'তে পারে একমাত্র ভারতবর্ষে।...তারা বুঝবে যে কি রত্ন আমি শরীরের রক্ত জল ক'রে এখানে ছড়িয়ে যাচ্ছি।...এই রত্নের সম্পূর্ণ সমাদর শুধু সেই দেশেই সম্ভব। আর হবেও তা-ই। কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখবে ভারতের মূলগ্রন্থি পর্যন্ত নড়ে উঠবে। তার শিরায় শিরায় বিদ্যুত ছুটবে, বিজয়োল্লাসে ভারতবাসী আমায় বুকে তুলে নেবে।" তিনি ভারতবাসীদের চিনতেন। কিন্তু তিনি কখনো ভাবেন নি যে, সমগ্রজাতি তাঁর আগমন-প্রতীক্ষায় এতটা উৎকণ্ঠিত-চিত্তে বসে আছে। তাদের পূজ্য প্রিয় বিবেকানন্দকে বরণ ক'রে নেবার জন্য দেশব্যাপী অভাবনীয় আয়োজন! এ আয়োজন স্বতঃপ্রণোদিত—রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা এতে লেশমাত্র নেই। অসংখ্য তোরণ নির্মিত হয়েছে, পথ ঘাট গৃহ সুসজ্জিত, উৎসব-মুখরিত।

১৮৯৭, ১৫ই জানুআরি গোধূলিলগ্নে তিনি যখন কলম্বোতে পৌঁছলেন, তাঁর গৈরিক উষ্ণীষ দেখেই কলম্বো জাহাজঘাটে সাগরগর্জনবিনিন্দী অগণিত মানুষের আনন্দকোলাহল উত্থিত হ'ল। কলম্বো হিন্দুসমাজের পক্ষ হ'তে দু'জন সভ্য (স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা নিরঞ্জনানন্দ সহ) জাহাজে উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।" ষ্টীমলঞ্চ ক'রে তাঁকে যখন তীরে আনা হ'ল, তখন অগণিত নরনারী লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে। স্বামীজীর গলায় অর্পিত হ'ল বিজয়মাল্য। বেদগান হ'তে লাগল, বেজে উঠল মাঙ্গলিক বাদ্য। পুষ্পমাল্যাদি সুশোভিত সুদৃশ্য ধ্বজ-ছত্র-চামর-পরিবৃত বিরাট শোভাযাত্রাসহ স্বামীজীকে

নিয়ে যাওয়া হ'ল শ্বেতবস্ত্র-মণ্ডিত অর্ধ মাইল দূরবর্তী দারুচিনি-বাগানে বিস্তৃত সভামণ্ডপে। শত শত লোক অনুগমন ক'রল জয়ধ্বনি ক'রে। ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি মাঙ্গলিক বাদ্যের সঙ্গে মিশে মধুর সঙ্গীতের সৃষ্টি ক'রল।...

স্বামীজী মঞ্চোপরি আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠ থেকে জয়ধ্বনি উত্থিত হ'ল। সিংহলবাসীরা স্বামীজীকে প্রথম অভ্যর্থনা করার সুযোগ পেয়ে বিশেষ গৌরবান্বিত। অভিনন্দনপত্র পাঠ হবার পরে স্বামীজী সংক্ষেপে বললেন, "...আপনাদের দ্বারা অভিনন্দিত হ'য়ে আমি পরম আনন্দিত।...আমি কোন রাজা মহারাজা ধনকুবের বা প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নই। আমি একজন কপর্দকহীন সন্ন্যাসীমাত্র। তথাপি আপনারা যে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন তাতেই বুঝা যাচ্ছে হিন্দুজাতি এখনো তার আধ্যাত্মিক সম্পদ হারায়নি। এ সম্মান আমার নয়—ধর্মের প্রতি সম্মান।...আর বাস্তবিকই যদি হিন্দুজাতিকে বাঁচতে হয়, তো ধর্মকেই আশ্রয় করতে হ'বে। ধর্মইতার জাতীয়-জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ।"...

পরদিন ধনীদরিদ্র শত শত দর্শনার্থী নরনারীর ভিড়। সকলেই ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন ক'রল স্বামীজীর চরণে। অপরাহ্ণে 'ফ্লোরাল হলে' সহস্র সহস্র উৎসাহী শ্রোতার সামনে স্বামীজী 'পুণ্যভূমি ভারত' সম্বন্ধে প্রাচ্যে তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিলেন। ধর্মভূমি ভারতের মহিমা কীর্তন ক'রে তিনি বললেন, "... পূর্বে সকল হিন্দুর মতো আমিও বিশ্বাস করতাম ভারত কর্মভূমি।...আজ আমি এই সভার সমক্ষে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি—ইহা সত্য সত্য—অতি-সত্য! যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যেতে পারে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকে তার কর্মফল ভোগ করতে আসতে হ'বে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে ভগবল্লাভাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রকেই

পরিণামে আসতে হবে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষান্তি ধৃতি দয়া শৌচ প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হয়েছে—যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ সর্বাপেক্ষা অধিক হয়েছে—তবে নিশ্চয় ক'রে ব'লতে পারি, তা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতভূমি।..." পরে তিনি 'নিরীহ হিন্দুদের ধর্মপ্রাণতা' এবং 'ধর্মই ভারতের মুখ্য সম্বল, রাজনীতি সমাজনীতি নয়'—'আধ্যাত্মিক আলোকই জগতে ভারতের দান'—'সনাতন ও যুগধর্ম' এবং 'সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী' শুনালেন। কলম্বোতে স্বামীজী 'বেদান্তদর্শন' সম্বন্ধে আর একটি ভাষণ দেন। অনুরাধাপুরমে 'সর্বজনীন ধর্ম' ও কাণ্ডি জাফনা প্রভৃতি স্থানে যে সকল উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে সকলকে মুগ্ধ করল। বেদের অভয়বাণীতে সকলের অন্তর হ'ল উদ্দীপ্ত। সিংহলে বিভিন্ন স্থানে স্বামীজী দশ দিন ছিলেন। সর্বত্রই তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত হন, এবং জনসাধারণের উৎসাহ তাঁকে অভিভূত করে। *

বিশ

২৪শে জানুয়ারি রাত্রে একখানি দেশী জাহাজে স্বামীজী দক্ষিণ ভারত-অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ মাইল। এই জলভাগটু

* কলম্বোবাসিগণ স্বামীজীকে তথায় বেদান্তপ্রচারের একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপনের অনুরোধ জানান। তদনুসারে স্বামীজী ১৮৯৭ সালে আলমোড়া অবস্থান করার সময় তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দকে সিংহলে বেদান্তপ্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

বোধ হয় মহাবীর হনুমান উল্লম্ফনে অতিক্রম করেছিলেন। সিংহলের বিপুল অভ্যর্থনা ও সমারোহের সংবাদ মাদ্রাজ কলিকাতা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে তড়িৎবেগে প্রচারিত হ'ল। সর্বত্র জনসাধারণ উন্মত্ত হ'য়ে উঠল। পরদিন দুপ্রহরের পূর্বে জাহাজ পৌঁছল পাম্বানে। স্বামীজী জানতেন না যে রামনাদের রাজা স্বয়ং উপস্থিত এবং রাজকীয় বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছে। জাহাজ হ'তে স্বামীজীকে তটভূমিতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। পাত্র-মিত্র সহ রাজা সাষ্টাঙ্গ প্রণত হ'লেন গুরুদেবের চরণে। তীরে অগণিত পাম্বান-বাসী অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। নৌকা থেকে নামবার পরই বিপুল-ভাবে সম্বর্ধিত হ'লেন স্বামীজী। সুদৃশ্য বিশাল চন্দ্রাতপের নীচে স্বামীজীকে যে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হ'ল তার ভাষা বড়ই মর্মস্পর্শী,—"পাশ্চাত্যে আপনার হিন্দুধর্মপ্রচার বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে। এক্ষণে এই নিদ্রিত ভারতকে তা'র বহুদিনের অকালনিদ্রা হ'তে জাগাবার জন্যও বদ্ধপরিকর হউন।" এই আবেদনের সুরটি স্বামীজীর অন্তর স্পর্শ করল। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "...ভারতের জাতীয় জীবন একমাত্র ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতিচর্চা, যুদ্ধ-বিদ্যা-পারদর্শিতা, বাণিজ্য বা শিল্পসমৃদ্ধিতে নয়। ধর্মই আমাদের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন এবং জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। আর এই ধর্মই পৃথিবীর নিকট আমাদের একমাত্র দেয়।..."

সভার পরে স্বামীজীকে রাজশকটে ক'রে বাসের জন্য রাজার বাংলায় নিয়ে যাওয়া হল। রাজ-আদেশে গাড়ী থেকে ঘোড়া খুলে দিতেই—প্রজাদের সঙ্গে স্বয়ং রাজা গাড়ী টানতে লাগলেন। রাজার ভক্তি সকলকে অভিভূত করল। পরদিন স্বামীজী 'রামেশ্বর-মন্দির দর্শনে গেলেন। গাড়ী মন্দিরের নিকটবর্তী হ'তেই অগনিত জনতা হাতী উট ঘোড়া, নানা পতাকা ও বিভিন্ন-সঙ্গীত-মুখরিত বিরাট শোভাযাত্রাসহ স্বামীজীকে অভিনন্দিত ক'রল।

স্বামীজী দেববিগ্রহের পূজা করলেন। মন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্য্য ও স্থাপত্য-কৌশল এবং সহস্র স্তম্ভোপরি প্রতিষ্ঠিত চাঁদনিটি দেখলেন। দেবতার জন্য সঞ্চিত বহুমূল্য মণিমাণিক্য হীরা জহরত প্রভৃতি দেখে ভারতের অগণিত গরিব দুঃখীদের জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল। অনন্তর জনতার বিশেষ আগ্রহে তিনি "তীর্থ মাহাত্ম্য ও উপাসনা" সম্বন্ধে একটি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছিলেন, "...শিবের পূজা শুধু মন্দিরস্থ বিগ্রহের অর্চনা নয়; কিন্তু দীনদরিদ্র আতুরের মধ্যে যে জীবরূপী শিব আছেন, তাঁরই পূজা।..."

স্বামীজীর বক্তৃতা রাজার অন্তর আলোড়িত করেছিল। তিনি উন্মত্তের মতো দু'হাতে ধন বিতরণ করতে লাগলেন এবং সহস্র দীন দুঃখী আতুরকে পেটভরে খাওয়ালেন, বস্ত্র দিলেন।

স্বামীজীর শুভ পদার্পণ স্মরণার্থে চল্লিশ ফুট উচ্চ একটি স্তম্ভ নির্মিত হ'য়ে তাতে লিখিত হল—

"সত্যমেব জয়তে। পাশ্চাত্য দেশে বেদান্তধর্ম প্রচারে অশ্রুতপূর্ব সাফল্য লাভ ক'রে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দ ইংরেজ শিষ্যদের সঙ্গে ভারতভূমির যে স্থলে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন, সেই পবিত্র স্থানকে চিহ্নিত করবার জন্য রামনাদাধিপতি ভাস্কর সেতুপতি কর্তৃক এ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হ'ল। সন ১৮৯৭, ২৭শে জানুআরী"

পাম্বান হ'তে স্বামীজী এলেন রামনাদে। সন্ধ্যাকাল। সুনীল নভোমণ্ডলে অসংখ্য তারকা স্বামীজীকে অভিনন্দিত করল। তোপধ্বনি হ'তে লাগল। বিচিত্র বর্ণের আতসবাজিতে আকাশ ছেয়ে গেল। রাজভ্রাতা স্বামীজীর গাড়ীর অশ্বরজ্জু ধারণ করলেন। স্বয়ং রাজা শোভাযাত্রার পুরোবর্তী হ'য়ে স্বামীজীর গাড়ীর অনুসরণ করলেন। শত শত মশাল জ্বলছিল। দেশীও

বিদেশী ব্যাণ্ড 'হের ঐ আসে বিজয়ী বীর' এই সুরটি বাজাচ্ছিল ঐক্যতানে। চারিদিকে শতশত কণ্ঠের জয়ধ্বনি ও কোলাহলের মধ্যে স্বামীজী উপনীত হলেন রাজপ্রাসাদে। অভিনন্দনের বিপুল আয়োজন হয়েছে রাজদরবারে। প্রাণের আবেগে রাজা স্বামীজীকে বহু প্রশংসা ক'রে একটি ক্ষুদ্র ভাষণ দিলেন। রাজভ্রাতা রামনাদবাসীদের পক্ষ হ'তে বহু সাধুবাদপূর্ণ মানপত্র পাঠ ক'রে স্বর্ণপেটিকাসহ ঐ মানপত্র অর্পন করলেন স্বামীজীর হাতে।

প্রত্যুত্তরে স্বামীজী কম্বুকণ্ঠে সমগ্র ভারতকে শোনালেন জাগৃতি ও আশারবাণী, "...সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায় বোধ হচ্ছে। মহা দুঃখ অবসান-প্রায় প্রতীত হয়। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জেগে উঠেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ, তথা হ'তে এক অপূর্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হচ্ছে। জ্ঞান ভক্তি কর্মের অনন্ত হিমালয়রূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতিশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন তা স্পষ্টতর, ততই যেন তা গভীরতর হচ্ছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃত দেহের শিথিলপ্রায় অস্থি-মাংসে পর্যন্ত প্রাণ-সঞ্চার করছে—নিদ্রিত শব জাগ্রত হচ্ছে। তার জড়তা দূর হচ্ছে। অন্ধ যে সে দেখতে পাচ্ছে না। বিকৃত মস্তিষ্ক যে সে বুঝছে না যে, আমাদের মাতৃভূমি তাঁর গভীর নিদ্রা ত্যাগ ক'রে জাগ্রত হচ্ছেন। আর কেউ এক্ষণে এঁর গতিরোধে সমর্থ নয়। ইনি আর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এঁকে আর দাবিয়ে রাখতে পারবে না। কুম্ভকর্ণের সুদীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ হচ্ছে।"...

অনন্তর তিনি—"ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড, রাজনীতি বা অপর কিছু নয়; বর্তমানে ভারতে জড়বাদের ও প্রয়োজনীয়তা আছে ও সাহস অবলম্বন করার

নির্দেশ দিয়ে বললেন—"যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। সর্ব প্রকার দুর্বলতা ত্যাগ কর—দুর্বলতাই মৃত্যু, দুর্বলতাই পাপ।" অনন্তর দৃঢ়তা অবলম্বনের আবেদন জানালেন ও ভবিষ্যৎ ভারতকে গড়ে তুলবার আহ্বান জানিয়ে বললেন—"হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, এখন ঘুমাবার সময় নয়। ঐ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মিলন করছেন।...উঠ, আর নূতন জাগরণে নবপ্রাণে, পূর্বাপেক্ষা মহা গৌরবমণ্ডিতা ক'রে ভক্তিভাবে তাঁকে তাঁর অনন্ত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা কর।..."

স্বামীজীর ঐ দেববাণী সমগ্র ভারতকে তোলপাড় ক'রে সারা দেশবাসীর মনের উপর তড়িৎ-স্পর্শের মতো তা হ'ল কার্যকরী। ভারতবাসীর আত্মশক্তির কাছে, মানুষের মধ্যে যে ব্রহ্ম সুপ্ত আছেন—তাঁর কাছে এ বাণী পৌঁছল দুর্জয় আবেদনরূপে। মৃতের মধ্যেও এল প্রাণের স্পন্দন। রামনাদ থেকে আরম্ভ করে স্বামীজী সমগ্রভারতে শোনালেন নবজাগরণ ও মহাশক্তির বাণী—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" আর সকলের কর্ণে দিলেন "অভীঃ" মন্ত্র।...

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর 'ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থে বর্তমান ভারতে স্বামীজীর দান সম্বন্ধে তাঁর 'বাণী' উদ্ধৃত ক'রে অনেক কথাই আলোচনা করেছেন।—"মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখাই প্রকৃত ঈশ্বরদর্শন। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ"—"জাতীয় সমস্যাগুলি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে সমাধান সম্ভব," ইত্যাদি। স্বামীজীর "অভীঃ" বাণী-সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "...কিন্তু তাঁর ভাষণ ও রচনার মধ্যে একটি সুর যা বারবার ধ্বনিত হচ্ছে তা 'অভয়'—নির্ভীক হও। বীর হও।...মানুষকে তিনি শোচনীয় পাপী ব'লে মনে করেননি কখনো। দৈবশক্তি বিরাজ করে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে। কেন ভয় পাবে মানুষ? জগতে যদি কোন পাপ থাকে, দুর্বলতাই হ'ল সে

পাপ। দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। উপনিষদের মহান্ শিক্ষা এ-ই ছিল। ভয় হতেই অমঙ্গল ও দুর্বলতার জন্ম। স্বামীজী বলেছেন, বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন এরূপ বলিষ্ঠ মানুষের, যাদের পেশীগুলি লৌহের ন্যায় দৃঢ়, স্নায়ু ইস্পাতের মতো কঠিন। আর যাদের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ব্রহ্মাণ্ডের গূঢ়তম রহস্য-ভেদে সক্ষম।' তিনি দুর্বল করা 'গুহ্যতত্ত্বের' নিন্দা করেছিলেন।...'ধর্মের পরীক্ষা এখানেই। যা কিছু তোমার শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা আনে, তা বিষবৎ পরিত্যাজ্য।..."

নেহরু এ-জাতীয় বহু উদ্ধৃতি স্বামীজীর বক্তৃতাবলী ও পত্র থেকে সংগ্রহ করেছেন ব'লে তাঁর গ্রন্থেলিখেছেন।

* * *

কুম্ভকোনমে তিন দিন অবস্থান ক'রে স্বামীজী যাত্রা ক'রলেন মাদ্রাজের দিকে। প্রত্যেক ষ্টেশনেই দর্শনার্থী অসংখ্য লোকের ভিড়। যে সব ষ্টেশনে গাড়ী থামবার কথা নয়, সেখানেও শত শত লোক প্রাণের মমতা ত্যাগ ক'রে রেললাইনের উপর শুয়ে পড়ে গাড়ী থামাল। সেই ভারত-গৌরবকে দর্শন করবে, তাঁর মুখে দু'টো কথা শুনবে। স্বামীজী সকলেরই আকাঙ্ক্ষা মিটাতেন—দর্শন দিতেন, দু'টি হস্ত প্রসারিত ক'রে করতেন আশীর্বাদ।

* * *

মাদ্রাজ তাঁর জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। নানাস্থানে সতেরটি বিজয়-তোরণ নির্মিত হ'ল। গৃহদ্বার কদলীবৃক্ষ ও পুষ্পমাল্যে শোভিত ঘরে ঘরে উড়ছে বিজয় বৈজয়ন্তী। উৎসব মুখরিত সমগ্র মাদ্রাজ সহর বিবিধ বর্ণে বড় বড় অক্ষরে স্থানে স্থানে লিখিত হয়েছে—পূজনীয় বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হউন, স্বাগত হে ভগবৎ-সেবক, স্বাগত হে অতীতের ঋষি, স্বাগত

বিবেকানন্দর প্রতি নবজাগ্রত ভারতের সাদর সম্বর্ধনা, এসো হে শান্তির অগ্রদূত, এসো শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য সন্তান, স্বাগত হে পুরুষসিংহ, এসো হে বিজয়ী বীর—ইত্যাদি।

৬ই ফেব্রুয়ারী প্রভাত হ'তেই দলে দলে লোক পুষ্পমাল্য ও পাতাকা হস্তে যাত্রা ক'রল রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে। মাদ্রাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বিশ্ববরণ্য সন্ন্যাসীকে সাদরে অভ্যর্থনা করার জন্যে সমবেত। ট্রেন প্লাটফরমে দাঁড়াতেই সহস্র-কণ্ঠোত্থিত জয়ধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহলে আকাশ পূর্ণ হ'ল। অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ স্বামীজীকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত ক'রলেন। দর্শকব্যূহ ভেদ ক'রে স্বামীজীকে নিয়ে যাওয়া হ'ল নিকটস্থ শকটের দিকে। স্বামীজীর পাশে গাড়ীতে বসেছিলেন তাঁর গুরু-ভ্রাতা শিবানন্দ ও নিরঞ্জনানন্দ। যুবকগণ গাড়ীর ঘোড়া খুলে অজস্র জয়ধ্বনির মধ্যে স্বামীজীর গাড়ী টেনে নিয়ে চলল সমুদ্রতীরবর্তী 'কাসল্ কারনান্' নামক প্রাসাদোপম অট্টালিকার দিকে।. স্বামীজীর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। অসংখ্য নরনারী নারিকেল ও বিবিধ ফল উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত। স্থানে স্থানে পুরাঙ্গনাগণ কর্পূর ও দীপ জেলে. আরত্রিক ক'রে স্বামীজীর চরণে নিবেদন ক'রছে ভক্তি-অর্ঘ্য। তাদের শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা দর্শনে স্বামীজী বিহ্বল হ'লেন। বেলা সাড়ে ন'টার সময় 'কাসল কারনান্'—এ গাড়ী পৌছলে 'মাদ্রাজ বিদ্বৎ-মনোরঞ্জিনী' সভার পক্ষ হ'তে স্বামিজীকে অভিনন্দিত ক'রে একটি সংস্কৃত মানপত্র পঠিত হ'ল।...

পরদিন রবিবারে। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হ'তে স্বামীজীকে মানপত্র দেওয়া হয়। পরে ইংরেজী সংস্কৃত তামিল ও অন্যান্য ভাষায় প্রদত্ত হ'ল ছাব্বিশ খানি মানপত্র *। বিপুল জনতা। সকলের অনুরোধ স্বামীজী

* ঐ মানপত্রগুলির মধ্যে খেতড়ির মহারাজার মানপত্রও ছিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকা হ'তেও

বাইরে এসে অভিনন্দনের জবাব দেবার জন্য একখানি গাড়ীর কোচবক্সে আরোহণ ক'রলেন। কিন্তু চারিদিকে বিপুল জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হ'ল না। অগত্যা তিনি সংক্ষেপে শ্রোতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ দিয়ে তাদের আকুল উৎসাহ দর্শনে আনন্দ প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন, "দেখো, যেন আগুন নিভে না যায়।" †

পরদিবস স্বামীজী 'ভিক্টোরিয়া হলে' বিরাট জনতার সামনে "আমার সমরনীতি" নামক প্রসিদ্ধ বক্তৃতা দিলেন। তিনি সংগঠন নীতির ব্যাখ্যা করলেন। ধর্মই জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড—সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে দানধর্মের ব্যাখ্যাকালে বর্তমানের বিদ্যাদানের উপরই বিশেষ জোর দিলেন। আরো বললেন, "দুর্বলতাই পাপ। উপনিষদের বলপ্রদ শিক্ষা-অবলম্বনেই জাতীয় জীবনে উন্নতি সম্ভব। উপনিষদ বলেছেন, 'হে মানব, তেজস্বী হও। উঠে দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন ক'র।' জগতের সাহিত্যে কেবল উপনিষদেই 'অভীঃ' ভয়শূণ্য হও—এই বাক্য উচ্চারিত হয়েছে।...উপনিষদুক্ত এই তেজস্বীতাই এখন বিশেষভাবে আমাদের জীবনে পরিণত করার সময় এসেছে।"...স্বামীজীর বাণী বিপুল বিস্ফোরক-সম্ভাবনায় পূর্ণ ছিল। শ্রোতাদের প্রাণে আবর্তের সৃষ্টি ক'রল—আগুন জ্বলে উঠল।

মানপত্র এসেছিল। তার মধ্যে আমেরিকার উইলিয়ম জেম্‌স্‌ ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সাক্ষরিত মানপত্রও ছিল। ডেট্রয়েট হ'তেও ৪২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি-সাক্ষরিত একখানি অভিনন্দন-পত্র এসেছিল। ব্রুকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েসন 'মহান আর্যপরিবারের ভারতীয় ভ্রাতাদের প্রতি'—আন্তরিকতা জ্ঞাপক মানপত্র প্রেরণ করে। সিংহল হ'তে মাদ্রাজ পর্যন্ত যে বিপুল অভ্যর্থনা হয়েছিল, তার প্রতিধ্বনি—বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হ'য়ে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত সমগ্র ভারতে আবর্তনের সৃষ্টি করে।

† 'Strike the iron while it is hot'—স্বামীজী এ নীতিবাক্যের মর্ম ভাল করেই জানতেন। তাই তিনি সমগ্র ভারতে আগুণ জ্বালিয়ে দিলেন এবং তপ্ত লৌহে আঘাত করতে লাগলেন। ঐ আঘাতের প্রতিধ্বনি ভারতের সকল প্রান্তে পৌঁছে গেল।

স্বামীজী ন' দিন মাদ্রাজে ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি অভিনন্দনগুলির উত্তর ছাড়াও পাঁচটি ভাষণ দিলেন—আমার সমর নীতি, ভারতীয় জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ, ভারতের মহাপুরুষগণ, আমাদের উপস্থিত কর্তব্য, ভারতের ভবিষ্যৎ। সমুদ্রতীরে যে বাড়ীতে স্বামীজী ছিলেন সে স্থানটি সর্বক্ষণ দলে দলে দর্শনার্থীদের দ্বারা পূর্ণ হ'য়ে থাকত। তাঁকে দর্শনমাত্র সকলে ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হ'ত, কতভাবে করত অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন। তা খুবই মর্মস্পর্শী ছিল এবং স্বামীজীকে বিশেষ অভিভূত করেছিল। যদিও স্বামীজী পৃথিবীর তিনটি শ্রেষ্ঠ জাতির মহোচ্চ সম্মানের অধিকারী হ'য়েছিলেন, তথাপি তিনি ঐ সম্মান অতি নম্রভাবেই গ্রহণ করেছেন। এক মানপত্রের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "অভিনন্দনপত্রসমূহে আমার প্রতি যে সকল সুন্দর বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে, তার জন্য কিভাবে যে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব, তা জানিনে। আমি প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে ঐ সব প্রশংসার যোগ্য করেন এবং আমি যেন সারা জীবন আমাদের ধর্ম ও মাতৃভূমির সেবা করতে পারি।"...

স্বামীজীর ওজঃপূর্ণ বাণী ভারতবাসীর জীবনে বিপ্লব এনেছিল।* জাতীয়তাবাদ নূতন রূপ নিল সংগঠনের ভিতর দিয়ে—নির্ভীক জাগরণে। যদিও রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না, তথাপি ঐ জাতীয়-জাগরণ সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিল স্বামীজীর বাণীকে কেন্দ্র ক'রেই। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সমসাময়িক ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যায় উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বিবেকানন্দের জাগৃতির বাণী ভারতের জাতীয় ও সামাজিক

* কলম্বো হ'তে আলমোড়া এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে স্বামীজী যে সকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার অতি সামান্যও এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হ'ল না। ঐসকল বক্তৃতা উদ্বোধন-কার্যালয় হ'তে প্রকাশিত 'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ঐ ভাষণগুলিতে তাঁর অগ্নিময়ী বাণীর স্পর্শ পাওয়া যায়।

জীবনের অচলায়তনকে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। তাঁর আবির্ভাব ও বাণী-প্রচারের সময় হ'তেই জাতীয়-জাগরণ ও গণ-অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় এক নূতন প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। সে প্রেরণা দেশবাসী সাধারণ মানুষকেও নিজেদের দাবী সম্বন্ধে করেছিল অবহিত। মানুষের অন্তরের নিদ্রিত ভগবানকে ক'রেছিল জাগ্রত। প্রতিপত্তিশালী মুষ্টিমেয় লোকদের দ্বারা অবহেলিত জনসাধারণের মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন ভবিষ্যৎ ভারত।* তাই তিনি তাদের নিজ নিজ ভূমিকা গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন।...

—"নূতন ভারত বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে; বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে বাজার থেকে; বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"

স্বামীজীর ডাকে তারা সাড়া দিয়েছিল। বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল সদর্পভঙ্গীতে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে আন্দোলন দেখা দিল

---

* জনশিক্ষা ও গণোন্নতির উপরই জাতির ভাগ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ভারতের উপেক্ষিত কৃষক তাঁতী শ্রমিক ও মেথর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নয়নের উপর স্বামীজী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর বাণী ও রচনাবলীতে এ সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই পাই। তিনি বলেছেন, "...মনে রেখো যে সব দেশেই এরা জাতির মেরুদণ্ড।...বেদান্তের জন্মভূমি ভারতবর্ষে জনসাধারণকে যেন যুগ যুগ ধরে সম্মোহিত ক'রে রাখা হয়েছে। অশুচি তাদের স্পর্শ। অপবিত্র তাদের সঙ্গ।...ইউরোপের বহু নগরে ভ্রমণের সময় দরিদ্র জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং শিক্ষাদীক্ষা দেখে ভারতের অসহায় গরিবদের অবস্থা মনে পড়ে যেত, আর চোখের জল ফেলতাম। এ পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করে বুঝলাম, প্রভেদ গণশিক্ষায়। জনসাধারণের দুর্গতি দেখে আমার হৃদয় এত ভারাক্রান্ত যে, অন্তরের ব্যথা প্রকাশ করা অসম্ভব।...মনে রেখো, দরিদ্রের কুটিরেই ভারতীয় জাতির বসতি। কিন্তু হায়, তাদের জন্য কেহ কখনো কিছু করে নি। আমাদের বর্তমান সংস্কারকগণ বিধবা বিবাহ নিয়ে বিব্রত। সর্ববিধ সংস্কারেই আমার সহানুভূতি আছে সত্য। তবে এ কথাও ঠিক যে, বিধবাদের স্বামীলাভের সংখ্যার উপর জাতির ভাগ্য নির্ভর করে না, করে জাতির জনসাধারণের অবস্থার উপর। ওদের উন্নীত করতে পার কি? আমাদের জনসাধারণ পার্থিব ব্যাপার সম্বন্ধে বড়ই অজ্ঞ। তবে তারা সজ্জন; কারণ এদেশে দারিদ্র্যের সঙ্গে দৌর্জন্যের কোন সম্পর্ক নাই।..."

তা আর শিক্ষিত ও প্রতিপত্তিশালীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার, পল্লীঅঞ্চলের সাধারণ মানুষও সে আন্দোলনে দলে দলে যোগ দিল এবং গ্রহণ ক'রল প্রকৃষ্ট-ভূমিকা।...

গান্ধীজী তাঁর সাধীনতা সংগ্রামে সাধারণ মানুষকে যে মুক্তি-সেনাবাহিনী-রূপে পেয়েছিলেন, তাও বিবেকানন্দের বাণীর প্রভাবে। দেশের মুক্তির অর্থ যে দরিদ্র জনগণের মুক্তি—এই তত্ত্বটি বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত ভাবধারায় প্রচারিত না হ'লে গান্ধীর গণআন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হ'ত কি না সন্দেহ। বিবেকানন্দই ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সেনাপতি। তিনি যে মুক্তি-ফৌজের সূত্রপাত করেছিলেন, তাদেরই আত্মত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে ভারত স্বাধীনতা অর্জন ক'রেছে। তিনি যে অভয়ের বাণী—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"-রূপ জাগৃতির বাণী শুনিয়েছিলেন, তাতেই সাড়া দিয়েছিল লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ। তারই ফলস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বঙ্গে এবং পরে সমগ্র ভারতে জাতীয় আন্দোলন নূতনরূপ পরিগ্রহ ক'রল, আবেদন-নিবেদনের নির্জীব পথ থেকে সরে এসে তীব্র নির্ভীক জাতীয়তা বোধের—নূতন সংগঠনের ভিতর দিয়ে।...

* * *

মাদ্রাজে অবস্থানকালে স্বামীজী ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু নিমন্ত্রণ পত্র পেলেন। খেতড়ির মহারাজা, পুণা হ'তে লোকমান্য তিলক ও বিভিন্ন স্থান হ'তে বহু বিশিষ্ট লোক তাঁকে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর যাওয়া সম্ভব হ'লনা। কলম্বো হ'তে মাদ্রাজ পর্যন্ত অবিরাম বক্তৃতা আলোচনা ও লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথোপকথনে তিনি এত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন যে, তাঁর বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন হ'ল। তাই তিনি স্থলপথে না গিয়ে বিশ্রামের জন্য জলপথে কলিকাতা যাত্রা করলেন ১৫ই ফেব্রুয়ারী সকালে। মাদ্রাজবাসিগণ স্বামীজীকে তথায় একটি স্থায়ী কেন্দ্র

স্থাপনের অনুরোধ জানাল। তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, "এখন নয়। এর পরে আমি তোমাদের কাছে আমার এমন একজন গুরুভাইকে পাঠাব, যে তোমাদের গোঁড়া ব্রাহ্মণের চেয়েও গোঁড়া, অথচ পূজা শাস্ত্রজ্ঞান ধ্যান-ধারণাদিতে অতুলনীয়।" *

ষ্টীমারঘাটে বহুলোক সমবেত হয়েছিল। মাদ্রাজের আর্যবৈশ্য সমাজ ও রাজমহেন্দ্রীর জনসাধারণের পক্ষ হ'তে তাঁকে দু'খানি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়।...

একুশ

বাংলাদেশ, বিশেষ ক'রে কলিকাতাবাসীরা ব্যাকুলভাবে স্বামীজীর শুভাগমন প্রতীক্ষায় ছিল। নাগরিকদের পক্ষ হ'তে অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হ'ল। সম্বর্ধনার বিপুল আয়োজন। ২০শে ফেব্রুয়ারী খিদিরপুরে জাহাজ থেকে নেমে স্বামীজী দেখেন যে, তাঁর জন্য একখানি স্পেশাল ট্রেন অপেক্ষা করছে। সকাল সাড়ে সাতটায় ঐ ট্রেন শিয়ালদহে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে শত কণ্ঠোত্থিত জয়ধ্বনিতে ষ্টেশন কম্পিত হ'য়ে উঠল। শিষ্যগণসহ স্বামীজী ট্রেন হ'তে নেমে যুক্তকরে সকলকে প্রত্যভিবাদন জানালেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ পুষ্পমাল্যে তাঁকে ভূষিত ক'রলেন। কীর্তনের দল উচ্চ

* ১৮৯৭, মার্চ মাসের শেষের দিকে তিনি তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্য সদানন্দকে মাদ্রাজে প্রচারের জন্য পাঠালেন।

সংকীর্তনে চারিদিক মুখরিত করল, আর বিশহাজার কণ্ঠ হ'তে উঠল গগনভেদী জয়ধ্বনি। বহু কষ্টে জনতা ভেদ ক'রে পাশ্চাত্য শিষ্যদের সঙ্গে স্বামীজীকে চারঘোড়ার গাড়ীতে বসানো হ'ল। উৎসাহী যুবকবৃন্দ ঘোড়া খুলে দিয়ে টেনে নিয়ে চলল স্বামীজীর গাড়ী। সুসজ্জিত পথের দুপাশে বহু নরনারী বিচিত্র বর্ণের নিশান হাতে জয়ধ্বনি করছে। পর পর সুশোভিত তিনটি তোরণ অতিক্রম ক'রে গাড়ী এসে দাঁড়াল রিপন কলেজ বাড়ীতে।...

অনন্তর রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের বাগবাজারস্থ ভবনে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে দুপ্রহরে আতিথ্য গ্রহণ ক'রে অপরাহ্নে স্বামীজী গেলেন আলমবাজার মঠে। বরাহনগর হ'তে মঠ ১৮৯২ সালে সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছে। পাশ্চাত্য শিষ্যদের বাসের ব্যবস্থা হয় কাশীপুরে গোপাল লাল শীলের উদ্যান বাটীতে।

* * *

বাংলাদেশ কলিকাতাবাসিগণ ও তাঁর গুরুভ্রাতৃবৃন্দ স্বামীজীকে বরণ ক'রে নিলেন। তাঁর কিন্তু এক মুহূর্তও বিশ্রামের অবকাশ রইল না। তিনি অকাতরে নিজেকে বিলিয়ে দিতে লাগলেন। শত শত লোক আসত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বহু নিমন্ত্রণপত্রও আসতে লাগল বিভিন্ন স্থান থেকে। তিনি অবিলম্বে গঠনমূলক কাজে মন দিলেন। বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রস্থাপন, সেবাকর্ম, শিক্ষার প্রবর্তন, কর্মিসংগ্রহ—এ সবই ছিল তাঁর কাজের অন্তর্গত। বিরাট পরিকল্পনা স্বামীজীর প্রাণে রূপ নিয়েছে। সমগ্র ভারতকে জাগাতে হবে, সমৃদ্ধ উন্নত ও বলশালী করতে হবে। গণোন্নতি জাতিভেদ-দূরীকরণ নারীকল্যাণ সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপুষ্টি এবং আরো বহু গঠনমূলক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ তাঁর চিন্তার বিষয় হ'ল।

প্রতিদিন বহু বিশিষ্ট নাগরিক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন।

তাঁদের সঙ্গে ঐসকল বিষয়ের আলোচনা হ'ত। তিনি বলতেন, "আমার কার্য হবে বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্র ও বজ্রের মতো দৃঢ়।" তাঁর সময় ছিল অল্প, কিন্তু কর্ম যে বিরাট। তাই তিনি অধৈর্য হ'য়ে প'ড়তেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতার নাগরিকগণ স্বামীজীকে অভিনন্দিত করলেন। শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধকান্তদেবের বাড়ীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে আহূত সভায় কলিকাতার প্রথিতনামা ব্যক্তিগণ ও ছাত্রসমাজ মিলে প্রায় পাঁচ হাজার লোক সমবেত। স্বামীজী সভায় উপস্থিত হ'তেই সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে বললেন, "ভারতের জাতীয় জীবনে এই পুরুষসিংহ অতুলকীর্তি স্থাপন ক'রেছেন। লক্ষের মধ্যে কদাচিৎ এরূপ একজন মহাপুরুষ দেখতে পাওয়া যায়।" অতঃপর তিনি অভিনন্দনপত্র পাঠ ক'রে একটি রৌপ্য পাত্রে সে'টি স্বামীজীর হস্তে প্রদান ক'রলেন। স্বামীজী দাঁড়িয়ে জন্মভূমিকে বন্দনা ক'রলেন। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' ব'লে প্রণাম জানিয়ে বললেন কলিকাতাবাসীদের সম্বোধন করে. "...আজ আপনাদের কাছে আমি সন্ন্যাসিরূপে উপস্থিত হই নি, ধর্মপ্রচারকরূপেও নয়। কিন্তু পূর্বেকার সেই কলিকাতাবাসী বালকরূপে আপনাদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে উপস্থিত হ'য়েছি। ...হে ভ্রাতৃগণ! আমার ইচ্ছা হয় এই নগরীর রাজপথের ধূলোর ওপর ব'সে বালকের মতো সরলভাবে আপনাদের কাছে প্রাণের সব কথা খুলে বলি।" অতঃপর তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ ক'রে বললেন,..."যদি কায়মনোবাক্যে আমি কোন সৎকার্য ক'রে থাকি, যদি আমার মুখ হ'তে এমন কোন কথা নির্গত হ'য়ে থাকে, যাতে জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হ'য়েছে—তাতে আমার কোন গৌরব নেই। সব গৌরব তাঁর। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখনো অভিশাপ বর্ষণ ক'রে থাকে, যদি আমার মুখ হ'তে কখনো কারও প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বের হ'য়ে থাকে, তারজন্য আমি দায়ী, তিনি নন। যা কিছু দুর্বল দোষযুক্ত সবই আমার। যা কিছু জীবনপ্রদ বলপ্রদ,

যা কিছু পবিত্র, সবই তাঁর শক্তির খেলা, তাঁর বাণী এবং তিনি স্বয়ং। সত্য বন্ধুগণ, জগৎ এখনো সেই নরবরের সঙ্গে পরিচিত হয়নি।—"

সর্বশেষে তিনি উপনিষদের নামে শক্তির প্রশস্তি গান ক'রে কলিকাতাবাসী যুবকদের বললেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"—উঠ জাগো, কারণ শুভমুহূর্ত এসেছে।...তোমারা ব'লছ আমি কিছু কাজ ক'রেছি। যদি তাই হয় তো এও স্মরণ রেখো যে, আমিও এক সময় অতি নগণ্য বালকমাত্র ছিলাম —যদি আমার দ্বারা এতদূর হ'য়ে থাকে তো, তোমরা আমার চাইতে কত বেশী কাজ করতে পার! উঠ জাগো, জগৎ তোমাদের আহ্বান করছে।...আমি তো এখনো কিছু ক'রতে পারি নি। তোমাদেরই সব ক'রতে হ'বে। যদি কাল আমার মৃত্যু হয়, সঙ্গে সঙ্গে কাজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হ'বে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের মধ্য হ'তে সহস্র সহস্র ব্যক্তি এ'ব্রত গ্রহণ ক'রবে এবং এ কাজের এতদূর উন্নতি ও বিস্তার করে যে, তা কল্পনায়ও কখনো আশা করিনি। দেশের উপর আমার বিশ্বাস আছে, বিশেষ ক'রে দেশের যুবকদের উপর।..."

স্বামীজী বাংলার যুবকদের নিকট অনেক কিছু আশা করতেন। তিনি তাদের কাছে মাতৃভূমির জন্য মহাবলী প্রার্থনা ক'রেছিলেন। বাংলার যুবকগণ স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া দিল। যারা সেদিন ঐ সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিল না, স্বামীজীর বাণী তাদের প্রাণও আলোড়িত ক'রল, এবং অনাগতদের জন্যও তিনি রেখে গেলেন তাঁর আবেদন। সেই শাশ্বত বাণীর অমোঘ স্পন্দন স্বদেশপ্রেমিকমাত্রকেই সচেতন ক'রে তুলেছিল। বাংলার যুবকগণ বিবেকানন্দের অমর্যাদা করে নি। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর বাণীকে সার্থক ক'রেছে, সম্মান দেখিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেখাবে।...

শ্রীরবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আধুনিকালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎবাণী প্রচার ক'রেছিলেন। সেটি কোন আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে ব'লেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যেই ব্রহ্মের শক্তি—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে জাগিয়েচে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে, বিচিত্রত্যাগে ফলচে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনই সম্মান দিয়েচে তখনই শক্তি দিয়েচে।...বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই, তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী।..." (রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ-মন্দির, বেলুড়মঠ, প্রকাশিত, ১৯৬১ সালের 'সন্দীপন' ২য় সংখ্যা)

বিবেকানন্দের দেহত্যাগের কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাংলায় তথা সমগ্র ভারতে নির্ভীক জাতীয় আন্দোলন যে রূপ নিয়েছিল – যার ফলে ভারত স্বাধীন হয়েছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী যে প্রকৃষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—তার উদ্দীপনাও এসেছিল একমাত্র স্বামীজীর বাণী থেকেই।...

নেতাজী তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, "...বিবেকানন্দ আমার জীবনে যখন প্রবেশ করলেন, তখন আমার বয়স পনর বৎসরেরও কম। তারপর থেকে আমার অন্তরে এক প্রচণ্ড বিপ্লব এল এবং সব কিছু ওলট পালট হ'য়ে গেল।...তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক প্রতিকৃতি এবং শক্তিপূর্ণ বাণীর মাধ্যমে বিবেকানন্দ আমার সম্মুখে পূর্ণ বিকশিত আদর্শ ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হ'লেন, এবং তিনি যে পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধেই গভীরভাবে চিন্তা ক'রতে লাগলুম।...আমার অস্থি-মজ্জার ভিতরে পর্যন্ত এক অভিনব জাগরণের সৃষ্টি হ'ল।...দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস নিবিষ্ট চিত্তে আমি তাঁর বাণী ও রচনাবলী পড়তে লাগলাম। তাঁর পত্রাবলীতে এবং কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত প্রদত্ত বক্তৃতা মালাতে দেশবাসীর প্রতি

এত সব কার্যকর উপদেশ ছিল যে, সেগুলি আমাকে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।"

* * *

কলম্বো থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত ও পরে কলিকাতায় দেশবাসীর পক্ষ থেকে স্বামীজীকে যে রাজোচিত অভিনন্দন দেওয়া হয়েছিল, তাতে তিনি বিশেষ বিব্রত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই বিজয়-অভিযান ও বক্তৃতাদি থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে তিনি গঠন-মূলক কাজে ব্রতী হ'লেন। তাই দেখতে পাই তিনি কয়েক দিন পরে কলিকাতা ষ্টার থিয়েটারে—"সর্বাবয়ব বেদান্ত" শীর্ষক একটি মাত্র ভাষণ দিয়েই বক্তৃতাপর্ব আপাততঃ বন্ধ ক'রে দিলেন।...

গুরুভাইরা সকলেই তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ১৮৯৭ খৃঃ মার্চের শেষে স্বামীজী রামকৃষ্ণানন্দকে পাঠালেন মাদ্রাজে বেদান্ত প্রচারের জন্য। তিনি মাদ্রাজ শহরে স্থায়ীকেন্দ্র স্থাপন ক'রে ক্রমে শহরের বিভিন্ন অংশে সপ্তাহে দশ বারটি ক্লাশ করতে এবং বক্তৃতা দিতে লাগলেন। এইরূপে কিছু দিনের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে বহু সমিতি প্রতিষ্ঠা ক'রে তিনি বেদান্ত-প্রচার ও সেবাকার্যের প্রবর্তন করেন।

স্বামীজীর সেবাভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। স্বামীজীও তাঁকে ঐ আর্ত-নারায়ণ-সেবাকার্যে অর্থ ও সেবক দিয়ে সাহায্য করতে লাগলেন। অখণ্ডানন্দ শত শত অনশনক্লিষ্টদের মুখে অন্ন দিলেন, দুর্ভিক্ষে বহু লোকের প্রাণরক্ষা করে ও পরিত্যক্ত শিশুদের সংগ্রহ ক'রে মহুলাতে প্রতিষ্ঠা ক'রলেন একটি অনাথাশ্রম এবং জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ঐ শিশুদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা দ্বারা মানুষ ক'রে তোলার কাজে জীবন দান ক'রলেন। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঐ জনকল্যাণ-সাধনকেই শ্রেষ্ঠব্রতরূপে গ্রহণ ক'রেছিলেন।

ঐ বৎসরেই (১৮৯৭) স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দিনাজপুরে একটি দুর্ভিক্ষ সেবাকেন্দ্র স্থাপন ক'রে চারিদিকে বহুগ্রামে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য ক'রেছিলেন। পরে অন্যান্য স্থানেও বিবিধ সেবাকার্য প্রবর্তিত হয়েছিল। ঐ বৎসরের মাঝামাঝি গুরুভাই স্বামী শিবানন্দ প্রেরিত হ'লেন সিংহলে বেদান্ত-প্রচারের জন্য। স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ সাফল্যের সঙ্গে আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারের কাজ চালাচ্ছিলেন। জনসেবাকার্য ভারত ও ভারতেতর দেশে নানাভাবে ছড়িয়ে প'ড়ল। কিন্তু এ যন্ত্রটিকে চালিত ক'রতে স্বামীজীর অনেক শক্তি ক্ষয় হ'য়েছিল। তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে গুরুভ্রাতারা বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। তাঁদের কাছে স্বামীজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি, তাঁরই নির্বাচিত নেতা। স্বামীজীর ভিতর শক্তিসংক্রমণ দ্বারাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব ক'রেছিলেন তাঁর যুগচক্র প্রবর্তন।...

স্বামীজী হিমালয়ে একটি মঠ স্থাপন, গঙ্গাতীরে কোন প্রশস্ত স্থানে ভাবী মঠ-প্রতিষ্ঠা ও রামকৃষ্ণ মিশন-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা প্রভৃতি বিবিধ পরিকল্পনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত। কিন্তু গুরুভাইদের অনুরোধও তিনি অমান্য করলেন না। ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন গুরুভাই এবং পাশ্চাত্য ও মাদ্রাজী শিষ্যদের কয়েকজনকে নিয়ে তিনি দার্জিলিং শৈলাবাসে গমন করেন।

পর্বতের শীতল আবহাওয়া ও নির্জন আবেষ্টনীতে এসে তিনি আনন্দিত হ'লেন। কিন্তু যে বিশ্রাম তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তা তিনি পেলেন না। কতকগুলি বড় পরিকল্পনার রূপায়ণে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন।

খেতড়ির রাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁকে কয়েক দিনের কলিকাতায় আসতে হয়েছিল। রাজার সঙ্গে আলমবাজার মঠে পাশ্চাত্যে প্রচার-কার্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হ'ল। বিশেষ ক'রে স্বামীজীকে

তাঁর সঙ্গে ইংলণ্ডে নিয়ে যাবার জন্যই রাজা এসেছিলেন, কিন্তু অসুস্থতার জন্য স্বামীজীর পক্ষে তা করা সম্ভব হ'ল না।

স্বামীজী পুনরায় ফিরে গেলেন দার্জিলিং-এ। কিন্তু তাঁর মাথায় যে-সব চিন্তা জেগেছিল, সে-গুলি কার্যে পরিণত না করা পর্যন্ত তিনি পাহাড়েও অস্বস্তি বোধ ক'রতে লাগলেন। পাহাড় থেকে নেমে এসে আলমবাজার মঠের সংগঠন কার্যে ব্রতী হ'লেন। চারজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত ক'রলেন। মঠবাসীদের আধ্যাত্মিক জীবনগঠনও তাঁর অন্যতম কাজ ছিল।...

পাশ্চাত্যের সংহতিশক্তি স্বামীজীকে মুগ্ধ ক'রেছিল। সংহতি ছাড়া কোন স্থায়ী বড় কাজ সম্ভব নয়। তাই তিনি সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের নিয়ে সঙ্ঘরচনার ব্যবস্থা করলেন। ১৮৯৭ সালের ১লা মে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। স্বামীজীর আহ্বানে বাগবাজারে বলরাম বসুর ভবনে আশ্রমিক ও গৃহী ভক্তগণ সমবেত হয়েছেন। স্বামীজী সকলকে লক্ষ্য ক'রে সঙ্ঘগঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বললেন, "সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোন বৃহৎ কার্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়।...আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হ'য়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ ক'রে সংসার-আশ্রমে র'য়েছেন, দেহাবসানের দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যাঁর পবিত্র নাম ও অলৌকিক জীবনের অভাবনীয় প্রসার হ'য়েছে, এই সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান সেই শ্রীরামকৃষ্ণের নামে প্রতিষ্ঠিত হ'বে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা এ কাযে সহায় হোন।"

সর্বসম্মতিক্রমে স্বামীজীর প্রস্তাব গৃহীত হ'ল এবং ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী ও আইনকানুনের বিশদ আলোচনার পর প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা স্থিরীকৃত হ'ল :

১। এ সঙ্ঘ "রামকৃষ্ণ মিশন" নামে পরিচিত হ'বে।

২। এর উদ্দেশ্য—রামকৃষ্ণদেব মানবজাতির কল্যাণের জন্য যে সকল সত্য প্রচার ও নিজের জীবনে অনুষ্ঠান ক'রেছিলেন, তা প্রচার করা এবং সর্বসাধারণের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য ঐ সকল তত্ত্ব কার্যে পরিণত করতে সকলকে সাহায্য করা।

৩। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও আদর্শ—জনসাধারণের সেবা ও আত্মিক কল্যাণ-সাধন। রাজনীতির সঙ্গে এ সঙ্ঘের কোন সম্বন্ধ নেই।

এইভাবে নানা কার্যপদ্ধতি ও আইন গঠিত হ'ল। সর্বসম্মতিক্রমে স্বামীজী সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হ'লেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও যোগানন্দ হ'লেন কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি ও সহ-সভাপতি। এইভাবে স্বামীজী ঐ দিন "রামকৃষ্ণ মিশনে"র প্রতিষ্ঠা ক'রে সঙ্ঘকে 'বহুজনহিতায়' সক্রিয় ক'রে দিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির কল্যাণের জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন রূপ যে যুগ্মসঙ্ঘ গঠন ক'রেছিলেন, তাতে মানব-সেবার প্রাধান্য যদিও সুস্পষ্ট, তথাপি এ প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কর্মধারা, ভারত ও ভারতেতর দেশের বহু জনসেবা-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কর্মধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'ই হ'ল এ প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র। জীবকে শিবজ্ঞানে পূজা মুখ্য সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশাল হৃদয়ে যে বিশ্বপ্রেম প্রতিভাত হ'য়েছিল, বিবেকানন্দ জনসেবার মাধ্যমে মানবজাতির মধ্যে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সেই বিশ্বপ্রেম ও এক মানবতার অনুভূতি উদ্বুদ্ধ করার জন্যই এই সঙ্ঘ গঠন ক'রেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সৌভ্রাত্রস্থাপনও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। চরম আদর্শবাদের দিক থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন জনসেবাক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে, এবং জগতের সমুদয় সেবাব্রতীর সম্মুখে বিশ্বমানবতার এক নব দিগন্ত ক'রেছে উদ্‌ঘাটিত।

এই সঙ্ঘের সেবাব্রতীদের সামনে—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' নিজের মুক্তি ও জগতের হিতরূপ যুগ্ম আদর্শ স্থাপিত। জীব মাত্রকেই ভগবানের অভিব্যক্তি জ্ঞানে সেবা ক'রলে ভগবানেরই পূজা করা হয়। এই নরনারায়ণ-সেবা-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি-ক্রমে আত্মানুভূতি হ'য়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে নারায়ণ-জ্ঞানে আর্ত পীড়িত দুঃস্থ ও মূর্খদের সেবার দ্বারা আত্মোপলব্ধি ও জগতের হিত দুই-ই সাধিত হ'বে। শাস্ত্রে কলিযুগের জন্য যে দানধর্ম্মের মহিমা কীর্তিত হয়েছে—"দানংমেকং কলৌযুগে"—সেই দানধর্মকে স্বামীজী রূপান্তরিত করেছেন চিত্তশুদ্ধির উপায়ভূত সেবাধর্মে। দান চার প্রকার—ধর্মদান বিদ্যাদান প্রাণদান ও অন্নদান। ধর্মপ্রার্থীকে ধর্মোপদেশ, বিদ্যাহীনকে বিদ্যাদান, আর্ত রুগ্ন ও মুমূর্ষুকে ঔষধ পথ্য ও সেবার দ্বারা বাঁচিয়ে তুলে প্রাণ দান করা এবং ক্ষুধাতুরকে অন্নদান—এই চার প্রকার দানই ভগবৎ-সেবা-জ্ঞানে করতে হ'বে। ভগবদ্‌বুদ্ধিতে এই প্রকার সেবা, পূজারই নামান্তর।

উপনিষদ বলেছেন "পিতৃদেবো ভব মাতৃদেবো ভব।" যুগধর্মের প্রবর্তক বিবেকানন্দ উপনিষদবাক্যের সঙ্গে যুক্ত ক'রেছেন 'দরিদ্র দেবো ভব, মূর্খ দেবো ভব'। (দরিদ্র মূর্খ এরাই তোমাদের দেবতা হোক্), দানের সময় দাতার মনে যে অহংকার, উচ্চনীচবোধ থাকে, তার স্থানে—দাতা সেবক এবং গ্রহীতা তৎকালে ভগবান—এই সেব্য-সেবকভাব আরোপ ক'রে, প্রত্যেক মানুষকে দেবতার আসনে বসিয়ে দীন পূজারী করতে হ'বে নিজেকে। স্বামীজী-প্রবর্তিত এ সেবাধর্ম ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ধর্মজীবনে এবং সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে সুদূর প্রসারী ফল প্রসব করার বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ।

স্বামী বিবেকানন্দ নরনারায়ণ সেবাকল্পে ১৮৯৭ সালে যে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন, সেটি ১৮৯৯ সালে বেলুড়ের বিস্তৃত ভূমিতে স্থানান্তরিত বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সহিত যুক্ত হ'য়ে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীবৃন্দ পরিচালিত

একনায়ক যুগ্মপ্রতিষ্ঠানরূপে (মঠ ও মিশনরূপে) ধীরে ধীরে প্রসার লাভ ক'রেছে। বেলুড় মঠ হ'তে জেনারেল সেক্রেটারী কর্তৃক ১৯৬২, মে মাসে প্রকাশিত ১৯৬০-৬১ সালের কার্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, বর্তমানে ভারত ও ভারত-বহির্ভূত দেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৩৮টি স্থায়ী কেন্দ্র ও ২২টি উপকেন্দ্র আছে। উপকেন্দ্রগুলিও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত।

ঐ কেন্দ্রগুলি হ'তে ঐ বৎসর চিকিৎসা-বিভাগে ১২টি হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ২৭,৮১৬ জন রোগীর চিকিৎসা হয়, আর ৬৮টি ডিস্‌পেন্‌সারীতে ৩৭,০২,৯৬৯ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়। শিক্ষাবিভাগে ১৭৬টি শিক্ষাকেন্দ্র হ'তে ৪৩,৪০২ জন ছাত্র এবং ১৮,১২৯ জন ছাত্রী, ভারতবর্ষ পাকিস্থান সিংহল সিংহাপুর ফিজি ও মরিসাস্ দ্বীপে শিক্ষালাভ ক'রেছে।

এতদ্‌ব্যতীত গ্রামউন্নয়ন নারীকল্যাণ এবং শ্রমিক ও অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সেবাকার্য করা হ'য়েছে ব্যাপকভাবে। গ্রন্থপ্রকাশন বিভাগ হ'তে ইংরাজী ও ভারতের ৮টি প্রধান ভাষাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা ও ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি প্রচারের জন্য বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে। পাশ্চাত্যদেশের কাজ বিশেষ ক'রে বক্তৃতা ক্লাশ আলোচনা ও গ্রন্থপ্রণয়নের মাধ্যমে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা প্রচার। এইভাবে স্বামীজী মানবজাতির কল্যাণের জন্য যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন রূপ যন্ত্রটি চালু ক'রেছিলেন, তা চলেছে অগ্রগতির পথে। তিনি ব'লেছিলেন, "এ যন্ত্রকে কেউ আর থামাতে পারবে না।"

বাইশ

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন পরে (৬ই মে, ১৮৯৭) স্বামীজী চিকিৎসকদের পরামর্শে কয়েকজন গুরুভাইকে সঙ্গে নিয়ে নৈনীতাল হ'য়ে

আলমোড়া যেতে বাধ্য হন! সেভিয়ার-দম্পতি, মিস্ মূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিষ্যগণ পূর্বেই আলমোড়ায় গিয়েছিলেন। আলমোড়াবাসিগণ স্বামীজীকে বিশেষ আড়ম্বর ও সম্মানের সঙ্গে অভিনন্দিত করেন। ঐ অভিনন্দনের উত্তরে তিনি তপোভূমি হিমালয়ের মহিমা কীর্তন ক'রে তথায় একটি মঠ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রলেন।

হিমালয়ে এসে তিনি বিশেষ আনন্দিত হ'লেন এবং ঐ নিভৃতস্থানে ব'সে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির সার্থক রূপায়ণের বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। যে আন্দোলন তিনি আরম্ভ ক'রেছেন তা'কে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে তাঁর কম শক্তি ক্ষয় হয় নি। তিনি বলেছিলেন, "একটি মাত্র চিন্তার আগুন আমার মাথার মধ্যে জ্বল্‌ছে; তাহ'ল ভারতের জনসাধারণের উন্নতি বিধান, এবং সে জন্য যে যন্ত্রটি চালু করার বিশেষ প্রয়োজন তা কতটা করেছি।...ছেলেরা কি ভাবে দুর্ভিক্ষে সেবা ক'রছে, দুঃখী দরিদ্রদের মধ্যে কাজ ক'রছে, তা দেখে মন আনন্দে ভ'রে ওঠে। তারা প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে অস্পৃশ্য কলেরা রোগীর বিছানায় ব'সে সেবাশুশ্রূষা করছে। অভুক্ত দরিদ্র এমন কি চণ্ডালের মুখেও অন্ন তুলে দিচ্ছে!..." এই দরিদ্রনারায়ণ সেবাই বিরাট্ পুরুষের পূজা।...

স্বামীজী আমেরিকা থেকে ভারতে পদার্পণ ক'রেই ভারতবাসীদের, বিশেষ ক'রে যুবকদের, মাতৃভূমির সেবায় জীবন উৎসর্গ করবার জন্য আহ্বান করছেন, "আগামী পঞ্চাশৎবর্ষ ধ'রে সেই পরমজননী মাতৃভূমিই যেন তোমাদের আরাধ্যদেবতা হন।...প্রথম পূজা বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাঁরা র'য়েছেন তাঁদের পূজা। তাঁদের পূজা ক'রতে হ'বে। সেবা নয়—পূজা। এইসব মানুষ—এইসব পশু—এরাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসীগণই তোমার প্রথম উপাস্য।"

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে যন্ত্র ক'রে স্বামীজী সেই বিরাটের পূজা প্রবর্তন ক'রেছেন।

আলমোড়াতে স্বামীজী প্রায় আড়াই মাস ছিলেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল প্রাচ্যে ও পাশ্চাতে আরব্ধ কর্মগুলির প্রসার-লাভের সাহায্য করা। কিন্তু আলমোড়া ত্যাগের পূর্বে তিনি যে দু'টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হন। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশেষ আগ্রহে তিনি জিলা-স্কুলে হিন্দীতে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার বিষয় ছিল "বেদের উপদেশ—তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক।" স্বামীজী যে এমন সুন্দর হিন্দী জানতেন তা কারোই জানা ছিল না। ইংলিস ক্লাবে ইংরেজ অধিবাসীদের জন্য তিনি ইংরেজীতে যে বক্তৃতা দেন, সে সভার সভাপতি ছিলেন গুর্খা রেজিমেণ্টের কর্ণেল পুলি। ঐ বক্তৃতার বিষয় ছিল, "উপজাতীয় দেবতা ও আত্মতত্ত্ব।" বক্তৃতাশ্রবণকালে সকলেরই মন এক উচ্চ ভাবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।...

৯ই আগষ্ট আলমোড়া ত্যাগ ক'রে স্বামীজী পাঞ্জাব ও কাশ্মীর সফরে বের হ'লেন। বেরেলি আম্বালা অমৃতসর রাওয়ালপিণ্ডি ও মারি হ'য়ে শ্রীনগর। কাশ্মীরে তিনি রাজ-অতিথিরূপে ছিলেন। সর্বত্রই তিনি বহুভাবে সম্মানিত হন। অনেক স্থানে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হ'য়েছিল। তিনি হিন্দীতেই অধিকাংশ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতায় ভারতের উদ্ধারের কথা বলেন। গুরুগোবিন্দ সিং-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে ব'লেছিলেন, "...যদি তোমরা দেশের হিতসাধন ক'রতে চাও, তোমাদেরও প্রত্যেককে গোবিন্দ সিং হ'তে হবে।...তাঁর ভিতর যে হিন্দু-রক্ত ছিল তার দিকে লক্ষ্য করো।" সকলকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হ'তে মুক্ত হ'বার আবেদন জানান, মানবাত্মার মহিমা কীর্তন করেন, ছুৎমার্গে পরিহার

ও নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করেন ; জাতিভেদ খাদ্যাখাদ্য-বিচার ও পুণ্যভূমির মহিমাও আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁর অন্তরের অগ্নির স্পর্শ তিনি সকলকে দিলেন। আর্যসমাজীদের সঙ্গেও তাঁর বিবিধ আলোচনা হয়েছিল।...

শ্রীনগর হ'তে তিনি পুনরায় এলেন মারিতে। স্বামীজীকে অভিনন্দন দেওয়া হ'ল। তিনিও তার উত্তরে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিলেন। তাঁকে দর্শন করতে বিপুল জনতার সমাগম হয়। মারি থেকে রাওয়ালপিণ্ডি হ'য়ে কাশ্মীর রাজের বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি এলেন জম্মুতে। কাশ্মীররাজ স্বামীজীকে দর্শন ক'রে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'লেন। এবং প্রধান অমাত্যও রাজকর্মচারীদের সঙ্গে স্বামীজীর ধর্মপ্রসঙ্গ শুনে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁকে অন্ততঃ দশ বার দিন ওখানে থে'কে একদিন অন্তর একটি ক'রে বক্তৃতা দেবার অনুরোধ জানালেন। স্বামীজী জম্মুতে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। জম্মুর পরে শিয়ালকোট। ওখানেও দুটি বক্তৃতা হয়। আলমোড়া ছেড়ে এ পর্যন্ত প্রায় তিনমাস কাল বিভিন্নস্থানে বক্তৃতা ধর্মচর্চা ও আলোচনাদি চালিয়ে তিনি এলেন লাহোরে। স্বামীজীর আগমনে তথায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। লালা হংসরাজ প্রভৃতি আর্যসমাজের নেতৃবৃন্দ বিশেষ সমাদরে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি লাহোরে যে দশ এগার দিন ছিলেন, প্রতিদিনই তাঁকে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হ'ত। আর্যসমাজ শিখসম্প্রদায় ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানে যোগদান ও আলাপ-আলোচনা ছাড়াও তিনি "হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি" "বেদান্ত" ও "ভক্তি" সম্বন্ধে তিনটি সারগর্ভ বক্তৃতাদানে সকল শ্রেণীর শ্রোতার বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন। বক্তৃতা শোনার জন্য এত লোক সমাগম হ'ত যে সামলান যেত না।

শিখদের এক শুদ্ধিসভায় যোগদান ক'রে তাঁদের উদারভাব দেখে তিনি খুবই প্রীত হন।. যে সকল শিখ বিশেষ কারণে ধর্মান্তরগ্রহণ করেছে, কিন্তু অনুতপ্ত হ'য়ে পুনরায় স্বধর্মে ফিরে আসতে চায়, তাদের জন্যই এ শুদ্ধির ব্যবস্থা।...

লাহোরে প্রোফেসার তীর্থরাম গোস্বামী (যিনি পরে স্বামী রামতীর্থ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন) স্বামীজীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গ তাঁর জীবনের একটি মহাশুভ মুহূর্ত। তিনি সশিষ্য স্বামীজীকে তাঁর গৃহে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। ভোজনান্তে স্বামীজী গান ধরলেন, "জহাঁ রাম তহাঁ কাম নহীঁ, জাহাঁ কাম তহাঁ নহীঁ রাম।" গানের মর্মবাণী তীর্থরামের অন্তরে ঘন ঘন আঘাত করতে লাগল। তিনি তাঁর সোনার ঘড়িটি স্বামীজীকে উপহার দিলেন। স্বামীজী তা গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তীর্থরামের পকেটে ঘড়িটি গুঁজে দিয়ে বললেন, "বেশ তো, বন্ধু, এই পকেটেই আমি এটি ব্যবহার করব।"

স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে তীর্থরামের অন্তরের সুপ্ত বৈরাগ্য উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল। 'ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা'—এই আপ্ত-বাক্য হ'ল সার্থক। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কর্মত্যাগ ক'রে যতিজীবন গ্রহণ করেন।...তিনি ধর্ম প্রচারের জন্য আমেরিকায়ও গিয়েছিলেন। অনেক ধর্ম গ্রন্থ রচনা করেছেন। উত্তর ভারতে তাঁর বড় শিষ্যসম্প্রদায় আছে।

* * *

এই বক্তৃতা সফরে স্বামীজীর শরীর বিশেষ অসুস্থ হ'য়েছিল। অথচ তিনি যেন দৈব-বলে সব কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।...লাহোর হ'তে দেরাদুন সাহারানপুর দিল্লী আলোয়ার জয়পুর ও খেতড়ি। পুনরায় জয়পুর আজমীর ও খাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থান হ'য়ে তিনি জানুআরি (১৮৯৮) মাসের মাঝামাঝি

ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। সমগ্র গুজরাট ও বোম্বাই অঞ্চলের বহু স্থান থেকে পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ সত্ত্বেও শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি ঐ সকল স্থানে যেতে পারেন নি।...

স্বামীজী প্রায় পাঁচমাস উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। সর্বত্রই তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল—বেশীর ভাগই হিন্দীতে। লিপিকার দ্বারা সংরক্ষিত হয়নি ব'লে অনেক বক্তৃতাই এখন আর পাবার জো নেই। ধর্মালোচনা কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তরও ছিল প্রচারের অঙ্গ বিশেষ। এই ভাবে তিনি শিক্ষিত পদস্থ ও জনসাধারণ সকল স্তরের মানবের অন্তর স্পর্শ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তার ফলও হয়েছিল সুদূর প্রসারী। তিনি তাঁর অমৃতময় ভাবধারা দিয়ে সহস্র সহস্র অন্তর স্নাত ক'রে দিয়েছিলেন।

স্বামীজীর কাজ ছিল মানবাত্মাকে নিয়ে, রাষ্ট্রকে নিয়ে নয়। মানুষের মধ্যে যে ভগবান যেন শৃঙ্খলিত আছেন, তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টাই তিনি করেছেন সর্বত্র। স্বামীজীর বাণী দেবত্বের বাণী। তিনি বলেছিলেন,—"নিজেরা দেবতা হও এবং অপরকে দেবত্বে উন্নীত হ'তে সাহায্য কর।" 'নরনারায়ণ'—সেবার আহ্বানের মধ্যেও সেই সুর হচ্ছে ঝঙ্কৃত। সমগ্র বিশ্ববাসী বিবেকানন্দকে কিভাবে গ্রহণ করেছে, তার প্রমাণ পাই তাদের স্বতঃপ্রণোদিত বিবেকানন্দ শতাব্দী-জয়ন্তী উৎসবের প্রস্তুতির মাধ্যমে। ইংরেজী ছাড়াও বাংলা হিন্দী গুজরাটী তামিল তেলুগু ও মালয়ালম প্রভৃতি ভারতের ক'টি প্রধান ভাষাতে স্বামীজীর সমগ্র বাণী ও রচনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে। এক বাংলা ভাষাতেই পঁচিশহাজার সেট্ অর্থাৎ আড়াই লক্ষ গ্রন্থ মুদ্রিত হচ্ছে।

স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত দেশবিদেশের বিভিন্ন স্তরের নরনারীর পৃষ্ঠপোষকতায় একটি শক্তিশালী "শতাব্দী-জয়ন্তী কমিটি" গঠিত হয়েছে। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ-পরিচালিত কেন্দ্রগুলি ছাড়াও বহু অস্থায়ী

কেন্দ্রে শুধু যে নানা কার্যসূচীর মাধ্যমে এক বৎসর ব্যাপী 'শতাব্দী-জয়ন্তী উৎসব' অনুষ্ঠিত হবে তা নয়, ভারতের সহস্র সহস্র গ্রামে শহরে এবং বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে অনুষ্ঠিত হ'য়ে ঐ 'জয়ন্তী-উৎসব' পরিণত হ'বে জাতীয় উৎসবে।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী-প্রস্তুতি সংবাদ উদ্বোধন ১৩৬৮, মাঘ সংখ্যায় এই মর্মে প্রকাশিত : জানুআরি ১৯৬৩—জানুআরি ১৯৬৪।

"১৯৬৩ খৃঃ জানুআরি মাসে যখন বেলুড় মঠে 'বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী' উৎসবের উদ্বোধন হইবে, তখন স্বামী বিবেকানন্দের গ্রাম-উন্নয়ন চরিত্রগঠন ও প্রকৃত মানুষ-গঠন বিষয়ক বাণীগুলি ভারতের সাড়ে পাঁচলক্ষ গ্রামের অধিবাসী-দের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভার সমাজ-উন্নয়ন-বিভাগের (Union Ministry of Community Development) উদ্যোগে মুদ্রিত হইবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভার যোগাযোগ ও প্রচার-দপ্তর (Union Ministry of Information and Broad Casting) কর্তৃক স্বামীজীর জীবনী-অবলম্বনে একটি প্রামাণিক চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা হইবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-সচিব (Secy., Education Ministry) শ্রী কৃপাল 'শিক্ষা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ' নামক একখানি পুস্তক বিভিন্ন ভাষায় ছাপাইয়া সারা ভারতে বিনামূল্যে বিতরণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সমাজ-উন্নয়ন-সমিতির সভানেত্রী (Chairman, Central Welfare Board) শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখ ১৭টি ভারতীয় ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের—'ভারতের নারী' পুস্তকখানি ছাপিবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ১৯৬৩ খৃঃ তিনি (স্বামীজীর সম্বন্ধে) একটি বিশেষ সংখ্যাও (Special number) প্রকাশ করিবেন বলিয়াছেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান সমিতি প্রভৃতির সহযোগিতায় ভারতে ও ভারতের বাহিরে স্বামীজীর শিক্ষা ও ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা আলোচনা ও সভার ব্যবস্থা করা হইবে।

বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের এক সম্মেলন হইবে; সর্বধর্ম-সমন্বয় ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বারাণসীতেও অনুরূপ একটি সম্মেলন হইবে।"

*

স্বামীজী ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে কলিকাতায় এলেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনাগুলি একে একে রূপ নিচ্ছিল। কলিকাতায় ফিরে এসে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৮৯৮) বেলুড়ে গঙ্গার পশ্চিমতীরে মঠের জন্য একটি পুরাতন বাড়ী সমেত সাত একরের কিছু বেশী জমি কিনলেন। নূতন জমিতে ঠাকুরঘর ও অন্যান্য গৃহাদি নির্মাণ কার্য আরম্ভ হ'ল। মুখ্যতঃ স্বামীজীর শিষ্যা মিস্ মুলার ও মিসেস ওলি বুলের আর্থিক আনুকূল্যেই মঠের জমি কেনা ও গৃহাদি নির্মাণ সম্ভব হয়। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি—আলমবাজার হ'তে মঠ সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হ'ল মঠের নূতন জমির দক্ষিণ দিকে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগান বাড়ীতে।

মিস মুলার, মিস মার্গারেট নোবল (নিবেদিতা), মিসেস ওলি বুল, ও মিস্ ম্যাকলাউড—এই পাশ্চাত্য শিষ্যগণ ভারতে এসেছেন পুণ্যভূমি ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কাজে সাহায্য করবার জন্য। তাঁরা নূতন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের এক ক'রে নিয়ে নূতন কেনা জমির একাংশে অবস্থিত পুরাতন বাড়ীতেই বাস ক'রতে লাগলেন। শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিষ্যাদের ভারতের সেবার উপযোগী ক'রে গড়ে তোলা স্বামীজীর অন্যতম কাজ ছিল। তিনি সকালে বিকালে তাঁদের বিবিধ উপদেশ দিতেন, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতেন এবং

তাঁদের ধারাবাহিক শিক্ষার জন্য অন্যতম সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দকে নিয়োজিত ক'রলেন।

এদিকে স্বামী সারদানন্দ আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার ক'রে স্বামীজীর আহ্বানে ভারতে ফিরে এসে মঠ-পরিচালনার কাজে ব্রতী হ'য়েছেন। স্বামী শিবানন্দ সিংহলে বেদান্তপ্রচার ক'রে মঠে প্রত্যাগমন ক'রেছেন। দিনাজপুরে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য শেষ ক'রে ত্রিগুণাতীতানন্দও স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হ'লেন। গুরুভাইদের কর্মশক্তি ও সাফল্য দেখে স্বামীজী বিশেষ গর্ব অনুভব ক'রলেন।

কয়েকদিন পরেই ২২শে ফেব্রুয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-পূজাদি অনুষ্ঠিত হ'ল। ঐ দিন স্বামীজী ৫০ জন অব্রাহ্মণ গৃহী ভক্তকে গায়ত্রী-মন্ত্র ও যজ্ঞোপবীত প্রদান করলেন। বলেছিলেন, "ত্রিবর্ণেরই উপনয়নে অধিকার আছে।...কালে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উন্নীত ক'রতে হ'বে।" ২৭শে ফেব্রুয়ারী বিপুল সমারোহের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধারণ উৎসব দাঁদের ঠাকুর-বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হ'ল। সহস্র সহস্র নরনারীকে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে একসঙ্গে ব'সে প্রসাদ ভোজন ক'রতে দেখে স্বামীজী বিশেষ আনন্দিত হ'ন।

* * *

মিস্ মার্গারেট নোবল তাঁর পূর্ব জীবনের সমস্ত সংস্রব ত্যাগ ক'রে ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য এসেছেন। স্বামীজী শিষ্যার জীবন গ'ড়ে তুলছিলেন আদর্শ ব্রহ্মচারিণীরূপে, ত্যাগ বৈরাগ্য তিতিক্ষা ও তপস্যার ভিতর দিয়ে। সময় বুঝে শিষ্যার প্রার্থনানুসার এক শুভদিনে (২৫শে মার্চ) তাঁকে ব্রহ্মচারিণীব্রতে দীক্ষিত ক'রলেন। মার্গারেট নোবলের নূতন নাম হ'ল "নিবেদিতা"। তিনি নিজের নাম লিখতেন—Nivedita of Rk. V. অর্থাৎ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চরণে নিবেদিতা। অক্ষরে অক্ষরে ঐ নাম সার্থক হ'য়েছিল। অনাঘ্রাত ফুলের মতো সৌরভময় পবিত্র জীবনটি তিনি ভারতের

সেবায় উৎসর্গ ক'রেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে স্বামীজী ব'লেছিলেন যে, নিবেদিতা ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের একটি শ্রেষ্ঠ উপহার।...নিবেদিতা প্রাণ দিতে এসেছে, গুরুগিরি ক'রতে আসে নি।*

উত্তর ভারতের বক্তৃতা সফর শেষ ক'রে এসে স্বামীজী কিছুকাল আর সর্ব-সাধারণে বক্তৃতা দেন নি। তিনি গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। শুধু ১১ই মার্চ ষ্টার থিয়েটারে মার্গারেট নোবল 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব' এবং ১৮ই মার্চ স্বামী সারদানন্দ এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে 'আমেরিকায় আমাদের উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি সভাপতিত্ব ক'রেছিলেন। ২১শে মার্চ বৌবাজার বিজ্ঞান-পরিষদের একটি অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা দেন। ১৯শে মার্চ স্বামীজী তাঁর ২ জন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করলেন। তাঁদের নাম হ'ল স্বামী স্বরূপানন্দ ও সুরেশ্বরানন্দ।...

খুব সাবধানতা সত্ত্বেও স্বামীজীর স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল। ডাক্তারদের পরামর্শে তিনি ৩০শে মার্চ দার্জিলিং যাত্রা করেন। নির্জন হিমালয়ের ক্রোড়ে এসে তিনি অনেক সময় ধ্যানমগ্ন হ'য়ে থাকতেন। অবশ্য জরুরী চিঠিপত্রের জবাব ও কাজ-কর্মের নির্দেশও তাঁকে দিতে হ'ত। বিশ্রাম উপভোগ ক'রে তিনি কতকটা সুস্থ বোধ করেন। কিন্তু কলিকাতায় প্লেগের আবির্ভাবে শত শত লোকের প্রাণনাশ এবং সহস্র সহস্র লোকের প্রাণভয়ে পলায়ন ও সারা শহরে মহাবিশৃঙ্খল অবস্থার সংবাদ পেয়ে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ৩ রা মে নেমে এলেন কলিকাতায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্লেগনিবারণ-কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেইদিনই হিন্দী ও বাংলাতে ২ খানি ঘোষণাপত্র ছাপালেন। লোকদের সাহস দিলেন, আশ্বাসের বাণী শোনালেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বামী

* নিবেদিতার জীবন সাধনা ও অবদান সম্বন্ধে বিশদভাবে জানার পক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন সিষ্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল হ'তে প্রকাশিত প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখিত "ভগিনী নিবেদিতা" জীবনী-গ্রন্থখানি বিশেষ সাহায্য করবে।

শিবানন্দ, নিবেদিতা ও সদানন্দের নেতৃত্বে সেবাকার্যও আরম্ভ হ'ল। সেবা-শিবির নির্মাণ, স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন, বস্তিগুলির আবর্জনা অপসারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী প্রবর্তিত হ'ল। বাঙ্গালী যুবকগণ দলে দলে এগিয়ে এল সেবাকার্যে। নিবেদিতা মূর্তিমতী সেবারূপে সহস্র সহস্র প্রাণে আশা ও সাহস উদ্দীপিত ক'রলেন।

স্বামীজীর জনৈক গুরুভ্রাতা তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, "এত টাকা কোত্থেকে আসবে ?" স্বামীজী তিলমাত্র দ্বিধা না ক'রে বললেন, "কেন ? দরকার হ'লে মঠের নূতন জায়গা জমি সব বিক্রি করব।" কিন্তু তা ক'রতে হয় নি। রামকৃষ্ণ মিশনের ঐ কল্যাণকর কার্যের জন্য প্রচুর অর্থ-সাহায্য এসে গেল। দেবদূতের মতো স্বামীজী আবির্ভূত হ'য়েছিলেন কলিকাতায় ঐ সঙ্কটময় মুহূর্তে। প্লেগ উপশমিত হ'ল।...

হিমালয়ে বিশ্রাম ও একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীজী ১১ই মে আলমোড়া যাত্রা ক'রলেন। সঙ্গে কতিপয় গুরুভ্রাতা এবং পাশ্চাত্য শিষ্যা ও ভক্তগণ। স্বামীজী পাশ্চাত্য শিষ্যাদের ভারতের কৃষ্টি ও ধর্মের সঙ্গে পরিচিত ক'রতে চান। এসব তাদের শিক্ষার অঙ্গ বিশেষ।

শৈলাবাসে স্বামীজী অনেক সময় ধ্যান-ভজনে কাটাতেন। আশ্রম-স্থাপনের জন্য অনুকূল স্থানের সন্ধানও নিতে লাগলেন। পাশ্চত্য শিষ্যা ও ভক্তদের নানাবিধ শিক্ষাদান, দর্শনার্থীদের সঙ্গে ধর্মালোচনা এবং ভারত ও পাশ্চাত্যের বিবিধ কর্ম পরিচালনাতেও তাঁর অনেক সময় ব্যয় হত। মাদ্রাজ হ'তে প্রকাশিত "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকাখানি নানা কারণে বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। স্বামীজী কাগজখানি আলমোড়ায় স্থানান্তরিত ক'রে স্বামী স্বরূপানন্দের হস্তে সম্পাদনা ও সেভিয়ার-দম্পতির উপর পরিচালনার ভার দিলেন।* এভাবে আলমোড়ার

* স্বামীজী-পরিকল্পিত হিমালয়ের মঠটি সেভিয়ার-দম্পতি কর্তৃক ১৮৯৯ খৃঃ মায়াবতীতে স্থাপিত হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও তথায় স্থানান্তরিত হয়।

কাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি পাশ্চাত্য শিষ্যাদের নিয়ে ১০ই জুন কাশ্মীর যাত্রা করলেন। তিন মাসের অধিককাল ছিলেন কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে। দীর্ঘকাল স্বামীজীর সঙ্গলাভ ক'রে শিষ্যাদের ধর্মজীবন বিশেষ উন্নত হ'য়েছিল। স্বামীজীর সঙ্গে থাকাই একটা বড় রকমের শিক্ষা। ভগিনী নিবেদিতা ঐ সময়কার বিবরণ "Notes of some wanderings with Swami Vivekananda" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। স্বামীজীর মন ঐ সময়ে জাগতিক সব কিছুর অনেক ঊর্ধ্বে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে বিরাজ ক'রত। লোক-কল্যাণ-চিকীর্ষাও যেন তাঁর মন থেকে হ'য়েছিল বিদূরিত। তিনি নিজেকে বিরাটের চরণতলে অবলুণ্ঠিত ক'রেছিলেন।...

সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রীর সঙ্গে তিনিও ৺অমরনাথ দর্শনে গেলেন। একমাত্র নিবেদিতা ছিলেন তাঁর সঙ্গে। ১৮ হাজার ফুট উচ্চ এক দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম ক'রে তিনি কৌপীনমাত্র পরিহিত হ'য়ে অমরনাথের গুহায় (১২,৭৩০ ফুট) প্রবেশ ক'রে ধ্যানমগ্ন হ'লেন ঐ তুষারময় গুহাতে। সদাশিব ৺অমরনাথ তাঁকে দর্শন দিয়ে ইচ্ছামৃত্যু বর দিলেন। তাঁর মনপ্রাণ শিবময় হ'য়ে গেল। তিনি আনন্দে আত্মহারা। কয়েকদিন যাবত তাঁর মুখে মহাদেবের কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না।...

৺অমরনাথ দর্শনের কয়েকদিন পরে তিনি হঠাৎ একাকী চলে গেলেন ৺ক্ষীরভবানী দর্শনে। ঐ জাগ্রততীর্থে তিনি ৭ দিন কৃচ্ছ্র সাধনায় অতিবাহিত করেন। মুসলমানদের অত্যাচারে দেবীমন্দির বহুদিন পূর্বেই বিধ্বস্ত। এক কুণ্ডমধ্যে দেবীর পূজা হয়।

তিনি তথায় প্রত্যহ পূজা ও হোমাদি করতেন এবং চাউল ও বাদাম প্রভৃতি সংযোগে একমন দুধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়ে দেবীকে ভোগ নিবেদন করতেন।

পূজারী ব্রাহ্মণের বালিকা কন্যাকে "কুমারী"রূপে পূজা ক'রে জপমালা হস্তে বহুক্ষণ জপে মগ্ন থাকতেন। দেবীমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দর্শনে তিনি ব্যথিত-চিত্তে একদিন ভাবছেন,—আমি যদি তখন থাকতুম তো প্রাণ দিয়েও মাকে রক্ষা করতুম। সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হ'ল—"তুই আমায় রক্ষা করছিস্। না, আমি তোকে রক্ষা করছি! বিধর্মীরা যদি মন্দির ধ্বংস করে ও আমার মূর্তি কলুষিত করে, তোর তাতে কি?...বৎস, আমি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে এখানে সাততলা সোনার মন্দির নির্মাণ করতে পারি।" দৈববাণী শ্রবণে তিনি স্তব্ধ হ'লেন। মুহূর্তে পটপরিবর্তিত হ'য়ে গেল। হৃদয়কন্দর এক দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে গেল। তিনি অন্তরে বাইরে সেই আদ্যাশক্তির স্পন্দন অনুভব করতে লাগলেন। মা-ই একমাত্র কর্ত্রী কারয়িত্রী, বিশ্বসৃজনপালন-সংহারকারিণী। তিনি তো ক্ষুদ্র যন্ত্র মাত্র—মা'র কোলের ছোট্ট শিশুটি।

যুগাচার্য বাগ্মী কর্মী নেতা গুরু জনসেবক দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দ জগজ্জননীর বিরাটসত্তার মধ্যে নিজেকে ক'রে দিলেন বিলীন। তিনি হ'লেন মাতৃগতপ্রাণ শিশু। মুখে শুধু মা মা রব। তাঁর নিজের ইচ্ছা কিছুই রইল না—সবই মায়ের ইচ্ছা।...

সাত দিন পরে ৺ক্ষীরভবানী হ'তে প্রত্যাবর্তন ক'রে যখন তিনি শিষ্যাদের সঙ্গে মিলিত হলেন, তখন তাঁর এই পরিবর্তন দেখে সকলেই বিস্মিত হ'লেন। মাতৃভাবে তিনি ভ'রে দিলেন সকলের অন্তর।...

কাশ্মীর-ভ্রমণ শেষ ক'রে ১৮ই অক্টোবর তিনি হঠাৎ বেলুড় মঠে উপস্থিত হলেন। স্বামী সারদানন্দ স্বামীজীর শিষ্যাদের নিয়ে যাত্রা করলেন উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণে।

তেইশ

স্বামীজীকে পেয়ে মঠবাসীরা খুবই আনন্দিত হ'লেন। কিন্তু তাঁর শরীর ও মনের অবস্থা দেখে বিষাদের কাল ছায়ায় সকলের প্রাণ আচ্ছন্ন হ'ল।

এদিকে নূতন জমির উপর মঠবাড়ী নির্মাণকার্য প্রায় সম্পূর্ণ। মঠ-স্থানান্তরের আয়োজন চলছে। ১৮৯৮ খৃঃ ১২ই নভেম্বর, ৺কালীপূজার পূর্বদিন সঙ্ঘজননী শ্রীসারদাদেবী বাগবাজার হ'তে নূতন মঠপ্রাঙ্গনে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাদি সমাপন করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তথায় অধিষ্ঠিত হন যুগযুগান্তরের জন্য। বেলুড় মঠ মহাতীর্থে পরিণত হ'তে চলল।

পরের দিন সকালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বিশেষ আশীর্বাদ নিয়ে বাগবাজারে 'ভগিনী নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়ের' প্রতিষ্ঠা হ'ল।

পরবর্তী ৯ই ডিসেম্বর জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে একটি মহাস্মরণীয় দিন। ঐ দিন সকালে পুণ্যক্ষণে স্বামীজী নিজে কাঁধে ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাস্থি-পূর্ণ কৌটাটি বয়ে নিয়ে এলেন ভাড়াটে মঠবাড়ী হ'তে নূতন মঠ-প্রাঙ্গনে, এবং বিবিধোপচারে পূজা ও হোমাদি সম্পন্ন করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রতিষ্ঠিত করলেন বেলুড় মঠে। স্বামী শিবানন্দের সহযোগিতায় এক মন দুধের পায়েস রান্না ক'রে শ্রীঠাকুরকে নিবেদন করা হ'ল।

নূতন মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে স্বামীজীর মাথা থেকে একটা বিরাট চিন্তার ভার নেমে গেল। তিনি সমাগত সকলকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "আজ আপনারা কায়মনোবাক্যে শ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন, যেন মহাযুগাবতার শ্রীঠাকুর বহুজন-হিতায়, বহুজন-সুখায় এই পুণ্যক্ষেত্রে দীর্ঘকাল বিরাজ ক'রে এস্থানকে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়-কেন্দ্র ক'রে রাখেন।..."

পরে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে সম্বোধন ক'রে ব'লেছিলেন, "ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা

থেকে নামল।…এখানে সকল মতের, সকল ভাবের সামঞ্জস্য থাকবে। ঠাকুরের উদার ভাবের এটি কেন্দ্রস্থান হ'বে। এ স্থান থেকে মহাসমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটায় জগৎ প্লাবিত হ'য়ে যাবে।”…

সন্ন্যাসীরা নূতন মঠে ধীরে ধীরে বাস করতে লাগলেন। পরবর্তী ২রা জানুআরি নীলাম্বর বাবুর বাগান থেকে মঠ সম্পূর্ণরূপে নূতন মঠ-বাড়ীতে স্থানান্তরিত হ'ল।…

যদিও পরিকল্পনাগুলি একে একে কার্যে পরিণত হ'য়ে স্বামীজীর চিন্তার লাঘব হচ্ছিল, তথাপি তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছিল। হাঁপানিতে এত কষ্ট পাচ্ছিলেন যে ডাক্তারদের পরামর্শে তিনি বৈদ্যনাথ গেলেন। কিন্তু বিশ্রাম ও নির্জনবাসে তাঁর স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি দেখা গেল না। অগত্যা ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি ফিরে এলেন বেলুড় মঠে।…

মঠ সুচারুরূপে চলছে, ধ্যানজপ এবং শাস্ত্রাদি পাঠ ও আলোচনার বিরাম নেই, দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন। গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের নিয়ে এক সভার আয়োজন ক'রে সকলকে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সমগ্র ভারতে প্রচার করার উপদেশ দিলেন। স্বামী বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দকে প্রচার-কার্যে প্রেরণ করলেন ঢাকায়।…

দলে দলে কলেজের ছাত্র ও শিক্ষিত লোক আসত স্বামীজীর কাছে। তিনি তাদের সঙ্গে শুধু ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান দেশবিদেশের কথা ইতিহাস ও সাহিত্য আলোচনাই করতেন না, পরন্তু প্রত্যেককেই 'মানুষ হবার' মন্ত্র দিতেন। তিনি বলতেন, “আমি এমন ধর্ম প্রচার করতে চাই, যাতে ঠিক ঠিক মানুষ তৈরী হয়।” যুবকদের সম্বোধন ক'রে বলতেন,—“দু হাজার বীরহৃদয় বিশ্বাসী চরিত্রবান ও মেধাবী যুবক এবং ত্রিশকোটী টাকা হ'লে আমি ভারতকে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারি।”…

ভারতবর্ষে তিনি বক্তৃতা কমই দিয়েছেন। তাঁর বিশেষ কাজ ছিল "জমি তৈরী করা।" তিনি ভারতে "জমি তৈরী" ক'রে তাকে উর্বরও ক'রে গিয়েছেন। *

ভারতের কল্যাণ-চিন্তায় যখন মগ্ন, তখনো কিন্তু তিনি তাঁর পাশ্চাত্যদেশে আরব্ধ কর্মের কথা ভোলেন নি। কারণ তার উপর ভারতের উন্নতিও কতকাংশে নির্ভর করে। তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দীর্ঘ বিশ্রাম ও বায়ু-পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সেজন্য ডাক্তারদের পরামর্শে তিনি সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। এবার সঙ্গে নিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দকে। নিবেদিতাও তাঁর নারী-শিক্ষা-কার্যের অর্থ-সংগ্রহের জন্য ইংলণ্ডে যাবেন স্থির করেছিলেন। তিনিও চললেন স্বামীজীর সঙ্গে। ১৮৯৯, ২০শে জুন 'গোলকোণ্ডা' জাহাজে কলিকাতা থেকে যাত্রা করে সকলে মাদ্রাজ কলম্বো এডেন নেপলস্ ও মার্সেল-এর পথে ৩১শে জুলাই লণ্ডনে পৌছলেন। টিলবেরী ডকে বহু ভক্ত ও বন্ধু স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেছিল। দু'জন আমেরিকান শিষ্যও ডেট্রয়েট থেকে এসেছিলেন তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য।

লণ্ডনে সাধারণ সভায় স্বামীজী কোন বক্তৃতা দেন নি। বন্ধু-বান্ধবদের ভিড় লেগে গিয়েছিল। ১৬ই আগষ্ট তিনি নিউইয়ার্ক যাত্রা করেন এবং প্রায় একবৎসর আমেরিকায় ছিলেন। স্বামীজীর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণের বিবরণ অতি অল্পই পাওয়া যায় এবং তাও অতি বিচ্ছিন্নভাবে রক্ষিত। যদিও তিনি বিভিন্নস্থানে বহু বক্তৃতা দিয়েছিলেন, ক্লাশ কথোপকথন আলাপ-আলোচনাও কম ছিল না, কিন্তু সে সবের কোন লিখিত বিবরণ রক্ষিত হয় নি। সে জন্য তাঁর কাজের পরিমাণ জানা যায় না। কিন্তু তাঁর কয়েক-

* ঐ ভূমিতে বপনের জন্য তিনি বায়ুমণ্ডলে বীজ ছড়িয়েছিলেন, কিন্তু ফসল সামান্যই দেখে গিয়েছেন। বর্তমান ভারতের উন্নতির মধ্যেই দেখতে পাই সে ফসল। বিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে পরিবর্তন এসেছে, তা বিবেকানন্দ ভারতে যে জাগরণ এনেছিলেন তারই ফলস্বরূপ।

খানি চিঠিতে তাঁর তৎকালীন মানসিক অবস্থার যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তাতে তিনি যে কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বিরাট ইচ্ছার ইঙ্গিতে চলেছিলেন, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি লিখছেন, "...মায়ের কাজ মা-ই করছেন। সেজন্য এখন বেশী মাথা ঘামাই না।... মা-ই যন্ত্রী, আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র ছাড়া আর কি?" তবু ঐ যন্ত্রটি অনুপম কর্ম করে যাচ্ছিল।...

নিউইয়র্কে এসে স্বামী অভেদানন্দের বেদান্তপ্রচারের সাফল্য দেখে স্বামীজী খুবই আনন্দিত হ'লেন। স্বামী তুরীয়ানন্দকে অভেদানন্দের সঙ্গে কাজ করবার জন্য রেখে তিনি বিশ্রামের জন্য গেলেন রিজলিম্যানরে।

৮ই নভেম্বর নিউইয়র্কে ফিরে এসে এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১০ই সর্বসাধারণের পক্ষ হ'তে তাঁকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হ'ল। উত্তরে তিনি একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিলেন। পুরাতন বন্ধুরা তাঁকে পেয়ে বিশেষ আনন্দিত। নিউইয়র্কে দু'সপ্তাহ অবস্থান-কালে স্বামী তুরীয়ানন্দকে মণ্ট-ক্লেয়ারের কার্যভার দিয়ে তিনি ২২শে নভেম্বর ক্যালিফর্ণিয়া যাত্রা করেন। পুরাতন বন্ধুদের আহ্বানে পথে তাঁকে শিকাগোয় নামতে হয়েছিল। তথায় তিনি বিশেষ ভাবে সম্বর্ধিত ও অভিনন্দিত হ'লেন।

ডিসেম্বরের প্রথমে ক্যালিফর্ণিয়ায় এসে তিনি ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাগ পর্যন্ত লস্ এঞ্জেলিসে অবস্থান করেন। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে তাঁকে বিভিন্ন স্থানে বহু বক্তৃতা ও ধর্মালোচনা করতে হয়েছিল। তিনি ঐ সময় যে সকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে নিম্নে প্রদত্ত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—বেদান্তদর্শন, বিশ্বমৈত্রী, কর্মরহস্য, মনের শক্তি, ঈশদূত যীশুখৃষ্ট, বিশ্বজনীন সাধনার উপায়, ভারতের পৌরাণিক কাহিনী, রামায়ণ, মহাভারত, জড়ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদ-চরিত, ফলিত মনস্তত্ত্ব, রাজযোগ, হিন্দুমতে মুক্তির পথ, সার্বভৌম ধর্মের আদর্শ, বিশ্ববাসীর নিকট বুদ্ধের বাণী,

আরবের ধর্ম ও হজরত মহম্মদ, বেদান্তদর্শন কি ভাবী ধর্ম? বিশ্বের দরবারে যীশুর বার্তা, জগতের নিকট মহম্মদের বাণী, ভক্তিযোগ, বিশ্বের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বাণী, আনুষ্ঠানিক উপাসনা প্রভৃতি। এই বক্তৃতাগুলি এতই মৌলিকচিন্তা ও তথ্যপূর্ণ ছিল যে সর্বত্রই বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, এবং সমগ্র ক্যালিফর্ণিয়ার বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন।

ফলে প্যাসাডেনা, স্যানফ্রান্সিস্কো, ওকল্যাণ্ড ও আলামিডা প্রভৃতি স্থানে বেদান্তের প্রভাব পড়েছিল স্থায়িভাবে। স্বামীজী যদিও ঐ অঞ্চলে সহস্র সহস্র শ্রোতার সামনে পঞ্চাশটিরও অধিক শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা দিয়েছিলেন, কিন্তু তার একটি বক্তৃতাও সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন সংবাদ পত্রের রিপোর্ট থেকে কোন কোন বক্তৃতার অতি সামান্য অংশমাত্র পাওয়া যায়। বক্তৃতার প্রভাবে তিনি সমগ্র ক্যালিফর্ণিয়াকে মাতিয়ে তুলেছিলেন এবং স্থানীয় অনুরাগী শিষ্যদের উদ্যোগে কয়েকটি বেদান্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বামীজী যদিও পূর্ণ উদ্যমে বেদান্ত প্রচার করেছিলেন, তথাপি তাঁর মানসিক নির্লিপ্ততার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় মিস্ ম্যাক'লাউডকে আলামিডা হতে ১৯০০, ১৮ এপ্রিলের লিখিত চিঠিতে, "...আমি ভালই আছি, মানসিক খুবই ভাল আছি।...এখন পুঁটলি পাটলা বেঁধে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা ক'রে বসে আছি। 'অব শিব পার করো মেরা নইয়া'—হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও।

যতই যা হোক, জো, আমি এখন সেই পূর্বের বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটির তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হ'য়ে শুনত, আর বিভোর হ'য়ে যেত। ঐ বালকভাবটিই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতির উপর কিছু-

কালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা! আবার সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চির পরিচিত কণ্ঠস্বর, যা আমার প্রাণের ভিতরটাকে পর্যন্ত কণ্টকিত ক'রে তুলেছে।…যাই প্রভু যাই।

হাঁ, এবার আমি ঠিক যাচ্ছি।…আমার সামনে দেখছি অপার নির্বাণ-সমুদ্র।…আমি যে জন্মেছিলাম, তাতে আমি খুশী…আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি তাতেও খুশী।…

শিক্ষাদাতা গুরু নেতা আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে এখন কেবল পূর্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চির পদাশ্রিত দাস।… আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা-ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই মা, যাই। তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ ক'রে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ অস্পর্শ অজ্ঞাত অদ্ভুত রাজ্যে। অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবল মাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নেই।…

চারিদিকে কতকগুলি পুতুল আর ছবি সাজান রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না, এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক সেই রকম দেখাচ্ছে; আমার প্রাণের শান্তির বিরাম নেই। আবার সেই আহ্বান।! …প্রভু, যাই।…

…র কর্মগ্রন্থি সব শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তবু বিরাট পুরুষের ইঙ্গিতে …অক্লান্ত কর্ম ক'রে যাচ্ছিলেন।…

ক্যালিফর্ণিয়া ত্যাগের পূর্বে জনৈক ভক্তিমতী শিষ্যা স্বামীজীকে 'স্যান্টা-ক্ল্যারা' অঞ্চলে পর্বতের সানুদেশে নির্জন প্রদেশে ১৬০ একর ভূমি দান করেন। স্বামীজী ঐ দান গ্রহণ ক'রে তথায় বেদান্ত-সাধনার একটি কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন। ক্যালিফর্ণিয়াবাসের শেষদিকে তিনি প্যারিস প্রদর্শনী

উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মেতিহাস-সভায় যোগদানের নিমন্ত্রণ পেলেন। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে ঐ সম্মেলনে যোগদানের জন্য মে মাসের শেষের দিকে তিনি নিউইয়র্ক যাত্রা করেন। পথে শিকাগো ও ডেট্রয়েতে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়ে নিউইয়র্কে পৌছলেন। এখানেও স্বামীজীকে প্রতি শনি রবিবারে গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হ'য়েছিল।...

তাঁর স্বাস্থ্য কিন্তু মোটেই ভাল ছিল না—যেন অকাল-বার্ধক্য তাঁকে আক্রমণ করেছে। তিনি আমেরিকা হইতে বিদায় নিয়ে ২০শে জুলাই যাত্রা করেন প্যারিস অভিমুখে, এবং তথায় লেগেট-দম্পতির অতিথিরূপে ছিলেন। প্যারিসে পাশ্চাত্যের বহু কবি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক গায়ক-গায়িকা শিক্ষয়িত্রী চিত্রকর শিল্পী প্রভৃতি গুণিগণের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ঐ সুযোগে তিনি ফরাসী ভাষাও বেশ ভাল করে শিখে নিলেন।...

শিকাগো সর্বধর্ম সম্মেলনের ফল দেখে ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্যারিসে ধর্ম-সম্মেলনের আয়োজনে জোর আপত্তি জানিয়েছিল। সে জন্য প্যারিস বিশ্ব-প্রদর্শনী উপলক্ষে শুধু ধর্মেতিহাস-সম্মেলনেরই ব্যবস্থা হয়। স্বামীজী ঐ সম্মেলনে দু'টিমাত্র বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার ফল হয়েছিল অভাবনীয়। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও দার্শনিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি বৈদিক ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রথম বক্তৃতায় 'বৈদিকধর্ম প্রকৃতি-পূজা হ'তে উদ্ভূত'—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই মত তিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতর্ক-দ্বারা খণ্ডন ক'রতে গিয়ে জার্মান পণ্ডিত ওপার্টের সঙ্গে তর্ক করেন। শিব-পূজা যে বেদ হ'তে উদ্ভূত এবং বেদই হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম ও ভারতের অন্যান্য ধর্মের ভিত্তি, তাও তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন।

দ্বিতীয় বক্তৃতায় তিনি বুদ্ধদেবের বহু পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং গীতা মহাভারতের পরে রচিত হয়নি—তা প্রমাণ ক'রে ভারতীয় নাট্য

চারুকলা সাহিত্য ও জ্যোতিষের উপর গ্রীক প্রভাব অস্বীকার করেন। উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে, বিশেষ করে নবীনদের অনেকেই স্বামীজীর মত অনুমোদন করেছিলেন।...

স্বামীজী ঐ সময়ে প্রায় তিন মাসকাল প্যারিসে ছিলেন। বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত ও মনীষী তাঁর ভাবে প্রভাবিত হন। পাশ্চাত্যে ফরাসী সভ্যতার প্রভাব দেখে তিনি মুগ্ধ হন। "প্রাচ্যও পাশ্চাত্য" নামক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "... প্যারিস ইউরোপীয় সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ।...এই প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপে আদর্শ।...এদের রচনার নকল সকল ইউরোপীয় ভাষায়।...দর্শন বিজ্ঞান শিল্পের খনি এই প্যারিস;...সকল জায়গায় এদের নকল।"...

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য-ভ্রমণে তিনি আমেরিকা ও ইউরোপের সংগঠনশক্তির পেছনে যে হিংস্র ভোগলালসা, স্বার্থ ও প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠার অদম্য চেষ্টা এবং সাম্রাজ্যবাদের লোলুপ দৃষ্টি বিদ্যমান, তা আবিষ্কার করেছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে তিনি আর আকৃষ্ট হ'লেন না। তিনি নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "...পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রা অট্টহাস্যের মতো। কিন্তু তার তলায় আছে কান্না। ওর পরিসমাপ্তিও কান্নাতেই! হাসি ঠাট্টা তামাসা— যা কিছু সবই উপরে। কিন্তু এর ভিতরটা বড়ই করুণ।...এখানে (ভারতে) উপরেই যত বিষাদ, যত কান্না; কিন্তু ভিতরে আছে নির্বিকার ভাব আর আনন্দ।" *...

চারজন বন্ধুসহ স্বামীজী ২৪শে অক্টোবর প্যারিস ত্যাগ করেন এবং ভিয়েনা হাঙ্গারী সার্ভিয়া রুমানিয়া বুলগেরিয়া কনষ্টান্টিনোপল হয়ে মিশরে

* ভগিনী ক্রিষ্টিন-এর স্মৃতিকথা হ'তে জানা যায় স্বামীজী ১৮৯৬ সালে তাঁকে ব'লেছিলেন, "পরবর্তী যে আলোড়ন নূতন যুগের সৃষ্টি করবে, তা রাশিয়া বা চীন থেকে আসবে।...পৃথিবীতে এখন তৃতীয় যুগ চলেছে। এ যুগে বৈশ্য প্রাধান্য। কিন্তু চতুর্থ যুগে শূদ্রের (সর্বহারাদের) প্রাধান্য হ'বে।"

আসেন। ২।৩ দিন ক'রে থেমে থেমে তিনি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখলেন, কিন্তু প্যারিসের পর ইউরোপের কোন শহরই তাঁর ভাল লাগল না। তা ছাড়া পাশ্চাত্যের ভোগ-লালসা ও প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁর অন্তরকে বিশেষভাবে পীড়িত করেছিল। তিনি ভারতে ফিরবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে পড়েছিলেন এবং সঙ্গীদের নিকট বিদায় নিয়ে প্রথম যে জাহাজ পেলেন, তাতেই ভারতে ফিরলেন। তিনি অন্তরে শুনছিলেন অসীমের ডাক।... প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন প্রচেষ্টা, বেদান্তের প্রভাবে ইউরোপকে 'ধূমায়মান আগ্নেয়-গিরির মুখ থেকে রক্ষা করার ইচ্ছা'—সব কিছুই চাপা পড়ে গেল মনের একটা নিভৃত কোণে। তিনি নির্বাণের ডাকে সাড়া দিলেন।

চব্বিশ

বোম্বাই থেকে তিনি ৯ই ডিসেম্বর (১৯০০) রাত্রে হঠাৎ বেলুড় মঠে উপস্থিত হলেন। স্বামীজীকে পেয়ে মঠবাসীদের আনন্দ আর ধরে না। মঠে সবেমাত্র প্রসাদ পাবার ঘণ্টা পড়েছিল। তিনিও বসে গেলেন সকলের সঙ্গে প্রসাদ পেতে। তারপর সারারাত কেটে গেল নানা কথাবার্তায়। মঠে বয়ে গেল আনন্দপ্রবাহ।...

জীর্ণদেহ ও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি ফিরেছেন। মঠে এসেই কাপ্তেন সেভিয়ারের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে মিসেস সেভিয়ারকে এই দুর্বহ শোকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তিনি অবিলম্বে মায়াবতী যাবার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। টেলিগ্রাম ক'রে দিলেন সেখানে। স্বামী শিবানন্দ ও শিষ্য সদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে ২৭শে

ডিসেম্বর যাত্রা ক'রে ২৯শে পৌঁছলেন কাঠগোদামে। হিমালয়ে ঐ সময় মহা প্রাকৃতিক দুর্যোগ— ঝড় জল তুষার ও করকাপাত। স্বামীজী সে-সব অগ্রাহ্য ক'রে ৩রা জানুআরি (১৯০১) মায়াবতী পৌঁছলেন। আশ্রমটি দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হ'ন। সেভিয়ার-দম্পতি বুকের রক্ত দিয়ে স্বামীজীর পরিকল্পিত ঐ হিমালয়ের আশ্রমটি গড়ে তুলেছেন। সেভিয়ারের দেহও ঐ আশ্রমের নীচে অনতিদূরে দাহ করা হ'য়েছিল। স্বামীজীকে পেয়ে মিসেস সেভিয়ার কতকটা সান্ত্বনা পেলেন। ১৩ই জুলাই স্বরূপানন্দ স্বামীর জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হ'ল। পরদিন ছিল মিঃ সেভিয়ারের জন্মদিন। বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স ৫৬ বৎসর হত।

স্বামীজী পনর দিন রইলেন মায়াবতীতে। মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গে কথাবার্তা ছাড়াও আশ্রমিক সাধুদের সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা হত। আশ্রমে বসেই চিরতুষার-মণ্ডিত অভ্রভেদী শৃঙ্গরাজি দর্শন ক'রে তিনি ধ্যান-মগ্ন হ'য়ে থাকতেন। একদিন বলেছিলেন মিসেস সেভিয়ারকে, "জীবনের শেষভাগটা কাজকর্ম ছেড়ে এখানে এসে থাকব। গ্রন্থরচনা ও সঙ্গীতালাপ নিয়ে কাটাব।"...

মায়াবতীতে বসে তাঁকে দেশ-বিদেশের বহু কাজের নির্দেশ দিয়ে প্রচুর চিঠিপত্র লিখতে হয়েছিল। প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য তিনটি সুচিন্তিত সন্দর্ভও তিনি রচনা করলেন—'আর্য ও তামিল জাতি,' 'সামাজিক সমস্যা-সভার অধিবেশনের প্রত্যুত্তর', 'থিওসফি সম্বন্ধে মন্তব্য'। তা ছাড়া ঋগ্বেদের 'নাসদীয় সূক্তের' একটি মনোজ্ঞ অনুবাদও তিনি এখানে করেছিলেন। স্থানের উচ্চতার দরুন মায়াবতীতে অত্যধিক শ্বাসকষ্ট হ'য়ে তিনি হাঁপানিতে খুবই পীড়িত হ'লেন। ঐ দুর্যোগের মধ্যেই ১৮ই জানুআরি তিনি মায়াবতী ত্যাগ ক'রে চতুর্থ দিনে সমতল ভূমিতে পিলিভিত নামক স্থানে ট্রেন ধরলেন। কিন্তু তিনি

তাঁর সঙ্গী গুরুভ্রাতা শিবানন্দকে বললেন, "মহাপুরুষ, এখন তুমি আমাদের ছেড়ে বেলুড় মঠের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে যাও।" ঐ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন, "বেলুড় মঠের প্রত্যেক সন্ন্যাসী ভারতের চতুর্দিকে ধর্মপ্রচার ক'রে আর লোক শিক্ষা দিয়ে বেড়াবে এবং শেষকালে অন্ততঃ দু'হাজার টাকা মঠের ধনভাণ্ডারে জমা দেবে।" স্বামী শিবানন্দ বিনীতভাবে স্বামীজীর নির্দেশ পালনে সম্মতি জানালেন। স্বামীজী বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করলেন ২৪শে জানুআরি (১৯০১)।

মঠে এসে তিনি গঠনমূলক কাজে লেগে গেলেন। ইতোমধ্যে মঠে কয়েকটি নূতন ব্রহ্মচারী যোগদান করেছে। তিনি নিয়মিত দৈহিক ব্যায়ামচর্চা প্রবর্তন করলেন, শাস্ত্রাদি পাঠের উপর জোর দিলেন, ধ্যান ভজন চলতে লাগল পূর্ণোদ্যমে। খুব ভোরে ঘণ্টা দেওয়া হ'ত। সকলেই ধ্যানঘরে গিয়ে ধ্যানে বসতেন। শারীরিক অসুস্থতা ছাড়া অন্য কারণে নির্দিষ্ট সময়ে কেউ ধ্যান করতে না গেলে, তার জন্য সেদিন মঠে আহার বন্ধ—মাধুকরী ভিক্ষার ব্যবস্থা। এমন কি প্রবীণ সন্ন্যাসীদের জন্যও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হত না। কঠিন নিয়ম। কিন্তু স্বামীজী তা প্রবর্তন করলেন। নেতার আদেশ সকলেই মেনে নিলেন।...

* * *

এদিকে পূর্ববঙ্গের ভক্তগণ স্বামীজীকে তথায় নিয়ে যাবার চেষ্টা নানাভাবে করছেন। তাঁদের আগ্রহ দেখে তিনি ১৮ই মার্চ কয়েকজন সন্ন্যাসীকে নিয়ে ঢাকা যাত্রা করলেন। বিপুল সম্বর্ধনা হ'ল। স্থানীয় লোকদের আন্তরিকতা স্বামীজীকে মুগ্ধ করল। তিনি তথায় দুটি বক্তৃতা দেন। তাছাড়া বহু লোক তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে মানুষের ভিতর ভগবানকে দর্শন করার নূতন অনুপ্রেরণা লাভ করে।

এক বিশেষ দিনে তিনি লাঙ্গলবন্ধে গিয়ে সহস্র সহস্র যাত্রীদের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করেন। প্রবাদ যে পরশুরাম ঐ তীর্থে স্নান ক'রে মাতৃবধজনিত পাপ হ'তে মুক্তি পেয়েছিলেন। ঢাকা থেকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহীভক্ত নাগ মহাশয়ের জন্মভূমি নারায়ণগঞ্জ শহরের নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রামে গিয়েছিলেন। ঢাকায় অবস্থান কালে স্বামীজী হাঁপানিরোগে অসহ্য কষ্ট পেয়েছেন। একদিন শরীর সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে বলেছিলেন, "যাক্, মৃত্যুই যদি হয় তাতেই বা কি আসে যায়? যা দিয়ে গেলুম তা দেড় হাজার বছরের খোরাক (চিন্তা জগতে)।"

ঢাকা থেকে স্বামীজী চট্টগ্রামের নিকটবর্তী চন্দ্রনাথতীর্থ দর্শন ক'রে আসামের গোয়ালপাড়া ও গৌহাটী হ'য়ে কামাখ্যা-তীর্থ দর্শনে গেলেন। ঐ অসুস্থ শরীরেও স্থানীয় লোকদের বিশেষ আগ্রহে গৌহাটীতে তিনি তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। গৌহাটী ও কামাখ্যাতে তাঁর শরীর অত্যন্ত খারাপ হ'ল—বহুমুত্রের সঙ্গে হাঁপানি। অনেকে শিলং যাবার পরামর্শ দিলেন। তাই স্বামীজী শিলং-এ এলেন। পার্বত্য শীতল রমনীয় স্থানে এসে তিনি আনন্দিত হ'লেন। আসামের চীফ কমিশনার স্যার হেনরী কটন স্বামীজীর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে স্থানীয় সিভিল সার্জনের চিকিৎসাধীনে রাখেন। নিজে দু'বেলা খোঁজ খবর নিতেন, অনেক আলাপ-আলোচনাও হত। ফলে কটন সাহেব স্বামীজীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। তাঁর অনুরোধে অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বামীজী "ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শ" সম্বন্ধে একটি গভীর চিন্তাপূর্ণ মনোজ্ঞ বক্তৃতা দানে সকলকে মুগ্ধ করেন। কটন সাহেব সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "এই একটি লোক দেখলুম, যিনি ভারতের অভাব অভিযোগ ঠিক ঠিক বুঝেছেন এবং প্রকৃতই এ দেশের কল্যাণ কামনা করেন।"

শিলংএ কয়েকদিন বাস করেও অসুখের বিন্দুমাত্র উপশম হ'ল না। তাই মে মাসের মধ্যভাগে তিনি বেলুড় প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি বেলুড় মঠের দ্বিতলে গঙ্গার ধারে আলো-বাতাস-যুক্ত একটি ঘরে প্রায় সাত মাস ছিলেন।* বেশী চলা ফেরা করতে পারতেন না। পা ফুলে গিয়ে শোথের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। কবিরাজী চিকিৎসা হ'ল—জল ও নুন একেবারে বন্ধ। তিনি চিকিৎসার নিয়ম মেনে নিলেন। দু'মাসের অধিককাল ঐ চিকিৎসায় কিছু উপকার হ'ল। ঐ অবস্থায়ও তিনি বাগানে নিত্য কাজ করতেন। পালিত গরু ছাগল হাঁস কুকুর হরিণ ও সারসের দেখাশুনা ছাড়াও তাদের সঙ্গে খেলা ক'রে অনেক সময় কাটাতেন। ছাগশিশু মটরুর গলায় ঘুঙুর পরিয়ে দিয়েছিলেন। মটরু নাচতে নাচতে তাঁর সঙ্গে ঘুরত। তিনিও বালকের মতো তার সঙ্গে খেলা ক'রতেন।...

নূতন 'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা' কেনা হ'য়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই সব বইগুলি তাঁর পড়া হ'য়ে গেল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহুলোক স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসত। তিনি কাউকেই ফেরাতেন না। এ বিষয়ে তিনি চিকিৎসকের নির্দেশ পুরাপুরি পালন করতে পারতেন না।

* * *

সে বৎসর বেলুড় মঠে স্বামীজী যথাশাস্ত্র প্রতিমায় ৺দুর্গাপূজা করলেন। সন্ন্যাসীদের ঐ পূজা করার অধিকার নেই। সেজন্য শ্রীশ্রীসারদা দেবী তাঁর

* বেলুড় মঠের দোতলায় স্বামীজী যে ঘরটিতে থাকতেন, এখনও সে ঘরটি তেমনি রক্ষিত আছে। ঘরে তাঁর ব্যবহৃত লোহার খাট টেবিল চেয়ার লেখার উপকরণ, একখানি আরামকৌচ, কাপড়চোপড় রাখার আলমারি; মেজেতে কার্পেট পাতা—তিনি সেখানে বসে ধ্যান জপ করতেন। তাঁর ব্যবহৃত তানপুরা পাখোয়াজ পরিব্রাজক জীবনের লম্বা লাঠি, বড় আয়না, একটি আলনা ও অন্যান্য জিনিস সবই সজ্জিত আছে। দেয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বড় প্রতিকৃতি। তিনি বড় খাট কদাচিৎ ব্যবহার করতেন। মেঝেয় বা ছোট ক্যাম্প-খাটটিতেই শুতেন। বর্তমানে সে ঘরটি মন্দিরে পরিণত হ'য়েছে। নিত্য পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত হয়। দেশ দেশান্তরের যাত্রীরা বেলুড় মঠে ঐ ঘর দর্শন ও তথায় শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

নামে পূজার সংকল্প করার বিধান দিলেন। পূজার পূর্বদিন শ্রীমা'কে মঠের অনতিদূরে নীলাম্বর বাবুর বাগান-বাড়ীতে আনা হ'ল। তাঁর উপস্থিতিতে মহা সমারোহে সাত্ত্বিক পরিবেশের মধ্যে তিন দিন পূজা হ'ল। 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' রবে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত। নবতের মধুর তানে ও ঢাক ঢোলের গম্ভীর শব্দে ভাগীরথী বক্ষ প্রকম্পিত। বেলুড় বালী উত্তরপাড়া ও দক্ষিণেশ্বরের বহু ব্রাহ্মণ পূজায় নিমন্ত্রিত হ'য়েছিল। দরিদ্রনারায়ণদের পরিতোষপূর্বক খাওয়ানো উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল।

৺দুর্গা পূজার পরে স্বামীজী প্রতিমায় লক্ষ্মীপূজা ও শ্যামাপূজাও করলেন। বেলুড়মঠে দুর্গাপূজাদি অনুষ্ঠানের ফলে প্রাচীনপন্থীরাও বুঝলেন, স্বামীজী মনেপ্রাণে ও কার্যে কতটা হিন্দু। বিরুদ্ধ সমালোচকদেরও বিদ্বেষ ভাব দূর হ'ল। স্বামীজী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী হ'য়েও শাস্ত্রবিহিত বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা-উপাসনার যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর শ্রীগুরুদেবের পদাঙ্কই তিনি করেছেন অনুসরণ। তিনি কিছু নষ্ট করতে আসেন নি, পূর্ণই ক'রে গেছেন।...

৺শ্যামা পূজার পর তিনি তাঁর জননীর অভিপ্রায় অনুসারে কালীঘাটে ৺কালীমন্দিরে যান। ছেলেবেলায় এক কঠিন অসুখের সময় তাঁর মা কালীঘাটে পূজা দিয়ে তাঁকে শ্রীমন্দিরে গড়াগড়ি দেওয়াবার মানত করেছিলেন; কিন্তু তা করা হয় নি। স্বামীজীর অসুস্থ শরীর দেখে তাঁর মা সেই মানতের কথা স্মরণ ক'রে পুত্রকে নিয়ে গেলেন কালীঘাটে। স্বামীজী আদিগঙ্গায় স্নান ক'রে আর্দ্র বস্ত্রে শ্রীমন্দিরে এসে ৺মাকালীর পূজাদি সমাপন করলেন। দেবীর সামনে তিনবার গড়াগড়ি দিলেন, সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রে নাটমন্দিরে ব'সে হোম ক'রলেন। স্বামীজী কালীমাতাকে দর্শন করতে এসেছেন শুনে বহুলোক সমবেত হ'য়েছিল শ্রীমন্দিরে।

বেলুড়ে ফিরে এসে স্বামীজী বলেছিলেন, "কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখলুম। আমায় বিলাত ফেরত জেনেও মন্দিরে যেতে কোন বাধা দেয়নি। বরং পরম সমাদরে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে পূজাদি করতে সাহায্য ক'রেছিল।"...

মঠের জমি ভরাট করবার জন্য সাঁওতালরা কাজ ক'রছে। স্বামীজী ঐ সরল সাঁওতালদের খুব ভালবাসতেন এবং অতি অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতেন তাদের সঙ্গে। তাদের সুখদুঃখের কথা শুনতেন। একদিন তাদের পরিতোষ-পূর্বক খাওয়াবার ইচ্ছা হ'ল স্বামীজীর। সাঁওতাল-সর্দার কেষ্টার কাছে সে প্রস্তাব উত্থাপন ক'রতেই কেষ্টা বলল, "আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন খাই না—এখন যে বিয়ে হ'য়েছে। তোদের ছোঁয়া নুন খেলে যে জাত যাবে রে বাপ্।"—স্বামীজী বললেন, "নুন কেন খাবি ? নুন না দিয়ে তরকারী রেঁধে দেবে—তা হ'লে খাবি তো ?" কেষ্টা তাতে রাজী হ'ল। তদনুসারে স্বামীজী লুচি তরকারী মিঠাই মণ্ডা দই ইত্যাদি দিয়ে সাঁওতালদের পরিতোষপূর্বক ভোজন করিয়ে বলেছিলেন, "এরা যে নারায়ণ, আজ আমি নারায়ণের ভোগ দিলুম।"

পরে শিষ্য শরৎ চক্রবর্তীকে বললেন, "এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এমন সরল চিত্ত, এমন অকপট ভালবাসা আর দেখিনি।" পরে মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন,..."আহা, দেশের গরিবদুঃখীদের জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর মুদ্দফরাস একদিন কাজ বন্ধ ক'রলে শহরে হাহাকার রব উঠে, হায়, তাদের সহানুভূতি ক'রে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে! এই দেখ্ না, হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ-অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া খৃষ্টান হ'য়ে যাচ্ছে। মনে করিস্ নি

কেবল পেটের দায়ে খৃষ্টান হয়। আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি, 'ছুঁসনে ছুঁসনে', । দেশে কি আর দয়া-ধর্ম আছে রে বাপ্! কেবল ছুৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা, মার লাথি। ইচ্ছা হয় তোদের ছুৎমার্গের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে এখনই যাই, 'কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীন দরিদ্র আছিস' ব'লে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না।...আমি দিব্যচক্ষে দেখছি এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম, একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চালন না হ'লে কোনও দেশ কোন কালে কোথাও উঠেছে দেখেছিস্? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ দিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—নিশ্চিত জানবি।"

স্বামীজীর আহ্বানে দেশবাসী সাড়া দিয়েছিল। গরিবদের দুঃখমোচন, ছুৎমার্গ পরিহার ও পতিতদের সামাজিক নির্যাতন থেকে রক্ষা করার কাজে দেশবাসী হ'য়েছিল সজাগ। মানুষকে তার হৃত-অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার যে কাজ স্বামীজী আরম্ভ ক'রেছিলেন, তাঁর দেহত্যাগের সঙ্গেই তা বন্ধ হ'য়ে যায় নি।...

১৯০১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে ভারতের সকল প্রান্ত থেকে সমাগত প্রতিনিধিদের অনেকেই স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। স্বামীজী তাঁদের সঙ্গে যে সকল দেশহিতকর গঠনাত্মক কাজের আলোচনা করেন, একটি আদর্শ বেদ-বিদ্যালয়-স্থাপন তার অন্যতম। ঐ বেদবিদ্যালয়ে বিশিষ্ট আচার্যগণ প্রাচীন আর্যঋষিদের আদর্শানুয়ায়ী বেদ উপনিষদ, বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র, আর্যসংস্কৃতি ও সংস্কৃত সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষা দেবেন। তথায় শিক্ষালাভান্তে কৃতী ছাত্রগণ দেশবিদেশে উপনিষদের ধর্ম প্রচার করবে।

স্বামীজী-পরিকল্পিত পূর্ণাঙ্গ বেদ-বিদ্যালয় এখনো স্থাপিত হয় নি। যদিও বেলুড় মঠে এবং ভবানীপুর গদাধর আশ্রম প্রভৃতি বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে যোগ্য অধ্যাপকদের কাছে বেদ উপনিষদ ও বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র পাঠের ব্যবস্থা হয়েছে।

গঙ্গাতীরে কলিকাতার নিকটে বেলুড় মঠের মতো মেয়েদের জন্যে একটি মঠস্থাপনের ইচ্ছাও স্বামীজীর ছিল। "ঐ মঠ গার্গী মৈত্রেয়ী এবং তাদের চেয়েও আরো উচ্চভাবাপন্ন নারীকুলের আকরস্বরূপ হবে।" ঐ মেয়েমঠের সন্ন্যাসিনীরাও এষণাত্রয় ত্যাগ ক'রে—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"-ব্রতে জীবন উৎসর্গ ক'রে ত্যাগ বৈরাগ্য তপস্যা কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা ও সেবাধর্মের আদর্শে জীবন তৈরী ক'রে দেশহিতকর কর্মে, বিশেষ ক'রে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে করবে আত্মনিয়োগ।

স্বামীজী যদিও ঐ স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে পারেন নি, তথাপি ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চেষ্টায় গঙ্গার পূর্বকূলে দক্ষিণেশ্বর কালী-মন্দিরের অদূরে শ্রীসারদামঠ নামে একটি স্ত্রীমঠ ও 'সারদা মিশন' নামে একটি পৃথক রেজিষ্টার্ড বডি স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে ঐ যুগ্মপ্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীগণ স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার ও অন্যান্য নারীকল্যাণকর কার্যে ব্রতী আছেন।

* * *

১৯০১ সালের শেষ ভাগে জাপানের দুজন মহান নাগরিক স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এক জন সে দেশের এক বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ রেঃ ওদা। অন্য জন জাপানের বিখ্যাত দার্শনিক ও শিল্পী মিঃ ওকাকুরা। তাঁরা জাপানে পরিকল্পিত পরবর্তী ধর্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য স্বামীজীকে বিনীত আমন্ত্রণ জানান। তাঁদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হ'য়ে স্বামীজী তাঁদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। মিঃ ওকাকুরা স্বামীজীর সঙ্গলাভের জন্য বেলুড়

মঠেই বাস করতেন। তাঁদের অন্তরঙ্গতা খুবই মর্মস্পর্শী ছিল। তাঁরা পরস্পরকে এত ভালবাসতেন, যেন দু'টি ভাই দীর্ঘদিন পরে পৃথিবীর দু'প্রান্ত হ'তে এসে মিলিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ভগবান্ তথাগত ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হ'ত। ওকাকুরার বিশেষ অনুরোধে স্বামীজী বোধগয়া দর্শনে যেতে সম্মত হ'লেন এবং ১৯০২ জানুআরি মাসে সেখানে গেলেন। পরে দুজনেই এলেন কাশীতে। পূর্ব ব্যবস্থামত স্বামীজী কাশীতে গোপাললাল ভিলায় অবস্থান করেন। মিঃ ওকাকুরা স্বামীজীর কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলেন ভারতের বিভিন্ন বৌদ্ধতীর্থ দর্শনে। স্বামীজী তাঁর সঙ্গে একজন অভিজ্ঞ সাধুকে দিলেন পথ-প্রদর্শকরূপে।

স্বামীজীর আগমনে বিশেষ সাড়া পড়ে গেল কাশীধামে। প্রতিদিন বহু পণ্ডিত গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। ভিঙ্গার মহারাজা স্বামীজীকে কাশীতে একটি মঠ স্থাপনের অনুরোধ জানান এবং কিছু অর্থসাহায্য দিতেও প্রতিশ্রুত হন *।...

স্বামীজী-প্রচারিত "দরিদ্রনারায়ণ সেবা"-আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল যুবক কাশীতে একটি ক্ষুদ্র আর্তসেবা-কেন্দ্র স্থাপন ক'রে পথে ঘাটে পরিত্যক্ত দুঃস্থ ও পীড়িতদের এনে সযত্নে ঔষধ-পথ্যাদি দিয়ে সেবা করছিল। স্বামীজীর আগমনসংবাদে সেই যুবকদল তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার কথা জানাতেই স্বামীজী বিশেষ আনন্দ প্রকাশ ক'রে বললেন, "বৎসগণ, এই হচ্ছে প্রকৃত মানবধর্ম। তোমরা ঠিক পথই অনুসরণ করছ। আশীর্বাদ করি ভগবান তোমাদের সহায় হোন। সাহসে বুক বেঁধে অগ্রসর হও। তোমরা

---

* স্বামীজী রাজার প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে বেলুড় মঠে ফেরার পরে, তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দকে কাশীতে পাঠান মঠস্থাপনের জন্য। স্বামী শিবানন্দ কাশীতে এসে ১৯০২ সালে স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বেই বর্তমান কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রে স্বামীজীর ইচ্ছা পূর্ণ ক'রেছিলেন।

দরিদ্র বলে হতাশ হয়ো না। টাকা আসবে। তোমাদের এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের ভিত্তির উপর ভবিষ্যতে এত বড় কাজ হবে, যা তোমরা কল্পনাও করতে পার না।”...

স্বামীজী ঐ প্রতিষ্ঠানের—Poor Men's Relief Association (দরিদ্র-দুঃখ-মোচন-সঙ্ঘ) এই নাম বদলে নূতন নাম রাখলেন “রামকৃষ্ণ হোম অব সার্ভিস।” যুবকদের উৎসাহ বর্ধনের জন্যে তিনি তাদের প্রথম রিপোর্টে সাধারণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা ক'রে একখানি আবেদনপত্রও লিখে দিলেন। স্বামীজীর স্নেহপুষ্ট কাশীর ঐ সেবানিকেতনটি বর্তমানে “রামকৃষ্ণ মিশন হোম অব সার্ভিস” নামে সমগ্র উত্তর-প্রদেশের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ সেবাশ্রমে পরিণত।

কাশীর জল হাওয়াতে স্বামীজীর স্বাস্থ্যের অতি সামান্যই উন্নতি হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের কয়েকদিন পূর্বে তিনি বেলুড় মঠে ফিরে এলেন। ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্য বিশেষ খারাপ হ'ল। পা ফুলে গিয়েছে, সর্বাঙ্গে জলের সঞ্চার হয়েছে, এক পা চলারও সামর্থ্য নেই। তিনি শয্যা গ্রহণ করতে বাধ্য হ'লেন। উৎসবের আয়োজন চলেছে, কিন্তু স্বামীজীর অসুস্থতার জন্য মঠবাসীদের মনে আনন্দ নেই।

সাধারণ উৎসবের দিন যত বেলা বাড়তে লাগল, মঠপ্রাঙ্গন মুখরিত হ'য়ে উঠল উৎসব-কোলাহলে। প্রায় ত্রিশহাজার লোকের সমাগম হয়েছে। বহু নরনারী প্রসাদ পাচ্ছে। মুহুর্মুহুঃ শ্রীগুরু মহারাজের জয়ধ্বনি উঠছে। স্বামীজী আর স্থির থাকতে পারলেন না। অতি কষ্টে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়ালেন এবং বিহ্বলনেত্রে তাকিয়ে রইলেন সমবেত ভক্তমণ্ডলীর দিকে। শ্রীরামকৃষ্ণের নামে এত লোকের সমাগম! বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলেন না। সেবক তাঁর মাথায় হাওয়া করতে লাগল।...অপরাহ্নে ভিড় একটু কম হ'তে

তাঁর ঘরের দরজা জানালা খুলে দেওয়া হ'ল। তিনি ঘরে ব'সেই দেখতে লাগলেন উৎসবের শেষ দৃশ্য।

পঁচিশ

মার্চ মাস এই ভাবেই কেটে গেল। আর তিনটি মাস তিনি ছিলেন এ মর্ত্যধামে। শরীর কখনো একটু সুস্থ কখনো অসুখের বাড়াবাড়ি। শয্যাশায়ী অবস্থায়ও কিন্তু ভারতের পুনর্জাগরণের চিন্তাটি সর্বদা তাঁর মনকে ব্যস্ত রাখত। ১১ই জানুআরি ১৮৯৫, শিকাগো থেকে স্বামীজী জনৈক মান্দ্রাজী শিষ্যকে লিখেছিলেন, "...আমার যতদিন না দেহত্যাগ হচ্ছে, সদা সর্বদা কাজ ক'রে যাব। আর মৃত্যুর পরেও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করতে থাকব।...বড় বড় কাজ কেবল পূর্ণ স্বার্থত্যাগের দ্বারাই হ'তে পারে। উঠ, জাগো।...*

স্বামীজীর কাজ ছিল চিন্তাজগতে। তিনি জগতের কল্যাণের জন্য যে সকল চিন্তা রেখে গিয়েছেন, তা কার্যকরী না হ'য়ে নষ্ট হ'বে না। পরবর্তীরা স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তাঁর আরব্ধ কর্ম তুলে নেবে নিজেদের

* স্থূলদেহ ত্যাগের পরেও তিনি জগতের কল্যাণকর কাজ করছেন সূক্ষ্ম দেহে। এত বড় জীবকল্যাণ-প্রেরণা শ্রীরামকৃষ্ণই উদ্বুদ্ধ ক'রেছিলেন বিবেকানন্দের প্রাণে; যিনি দেহ ভুলে জগৎ ভুলে নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হ'য়ে থাকার প্রার্থনা ঠাকুরের কাছে জানিয়েছিলেন কাশীপুর উদ্যানে।

হাতে। 'মৃত্যুর পরও' তাঁর অলক্ষ্য হস্ত জ্বালিয়ে দেবে বিভিন্ন দেশে শতশত প্রাণে আলোক-বর্তিকা। তাঁর কর্ম চলবে। *

স্বামীজী প্রস্তুত হচ্ছেন মহাপ্রস্থানের জন্য। কিন্তু তখনো তিনি তাঁর মহান্ গুরুদেবেরই মতো প্রার্থীদের কাউকে ফেরাননি। শেষ দিন পর্যন্ত লোকশিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর প্রাণে যে আগুন জ্বলেছিল, সে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন বহু প্রাণে। তিনি বলতেন, "যদি দেশের লোকের আত্মাকে প্রবুদ্ধ করবার জন্য শত শত বার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হয়, তাতেও আমি পশ্চৎপদ নই।"

ক্রমে জাগতিক ব্যাপারে তিনি উদাসীন হ'লেন। গভীর ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে থাকতেন। কাজকর্মের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, "এ সব ব্যাপারে আমি আর মাথা ঘামাতে চাই নে।" তাঁর অন্তর্মুখ ভাব দেখে গুরুভ্রাতারা শঙ্কিত হ'লেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাটি তাঁদের মনে হ'ত— "ও যখন নিজের স্বরূপ জানতে পারবে, তখন আর এ দেহ রাখবে না।" একদিন জনৈক গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বামীজী, আপনি কে, তা কি

* ১৯২১ সালে স্বামীজীর জন্মোৎসবের দিন সস্ত্রীক মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, মিঃ মহম্মদ আলি প্রভৃতি কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে বেলুড় মঠ দর্শন ক'রতে আসেন। তাঁরা স্বামীজী যে ঘরে থাকতেন, সে ঘরে গিয়ে তাঁর ব্যবহৃত জিনিষপত্র সশ্রদ্ধ ভাবে দেখলেন। জনতার বিশেষ আগ্রহে মহাত্মাজী স্বামীজীর ঘরের পাশের বারান্দা থেকে হিন্দীতে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তাতে অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি ব'লেছিলেন, "... আমি এখানে অসহযোগ আন্দোলন বা চরকা প্রচার ক'রতে আসিনি। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্যই আজ এখানে আসা। আমি স্বামীজীর পুস্তকাবলী বেশ ভাল ক'রে প'ড়েছি। তার ফলে পূর্বে দেশের প্রতি আমার যে ভালবাসা ছিল তা আরও অনেক বেড়েছে।...যুবকদের কাছে আমার এই অনুরোধ। স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে বাস করতেন এবং যেখানে দেহত্যাগ ক'রেছেন, সে স্থানের ভাবধারা অন্ততঃ কিছু গ্রহণ না ক'রে শূন্য হাতে আজ ফিরে যেও না।"

স্বামীজীর সমসাময়িক বা পরবর্তী ভারতের মুখ-উজ্জ্বলকারী সন্তানদের উপর স্বামীজীর জীবন ও বাণীর প্রভাব কতটা পড়েছিল, তা মহাত্মাজীর উক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

বুঝতে পেরেছেন?" তিনি তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "হাঁ, পেরেছি।"...যে অনুভূতির দ্বারে চাবি দিয়ে রেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, এখন সময় বুঝে তা খুলে দিয়েছেন।

দেহত্যাগের এক সপ্তাহ পূর্বে স্বামীজী জনৈক শিষ্যকে একখানি পঞ্জিকা আনতে বলেন। তিনি মন দিয়ে পাঁজিখানির পাতা উল্‌টে উল্‌টে দিন দেখতে লাগলেন—মনে হ'ল যেন কোন কার্যবিশেষের জন্য শুভদিন নির্বাচন ক'রছেন। পরে নিজের ঘরেই রেখে দিলেন পাঁজিখানি। তাঁর দেহান্ত হ'লে পাঁজি দেখার অর্থ সকলেই বুঝেছিল।...

দেহত্যাগের তিন দিন পূর্বে বিকালে মঠের জমিতে বেড়াতে বেড়াতে বর্তমান বেলুড় মঠে স্বামীজীর সমাধিমন্দিরের স্থানটি দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন, "আমার শরীর গেলে এখানে সৎকার করবি।"

শেষের ক'দিন তাঁকে খুবই সুস্থ মনে হ'ত—সদা প্রফুল্ল। তাঁর দেহও যেন জ্যোতির্ময় হ'য়ে গিয়েছিল। কেউ বুঝতে পারেনি শেষদিনটি এত নিকটে।

১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই, শুক্রবার। তিনি খুব ভোরে ভোরেই উঠেছেন। সকালে চা খেতে খেতে গুরুভাইদের সঙ্গে কত গল্প করলেন—কত পুরাতন কথা। বেলা প্রায় ৮টার সময় তিনি ঠাকুরঘরে গিয়ে সব দরজা জানালা বন্ধ ক'রে ভিতর থেকে খিল দিয়ে ধ্যানে বসলেন। ১১টা পর্যন্ত গভীর ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তাঁকে এত অধিক সময় ধ্যান ক'রতে দেখে গুরুভ্রাতারা বিশেষ চঞ্চল হ'লেন। তিনি একটি শ্যামাসঙ্গীত গাইতে গাইতে মন্দির হ'তে নেমে উঠানে পাইচারি করতে লাগলেন। তখন তাঁর মধ্যে একটা অদ্ভুত রূপান্তর ঘটেছিল। স্বামী প্রেমানন্দ কাছেই ছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন স্বামীজী অস্ফুটস্বরে ব'লছেন, "যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত,

তো বুঝতে পারতো বিবেকানন্দ কি ক'রে গেল!" শুনে প্রেমানন্দ বিশেষ বিচলিত হ'লেন; কিন্তু স্বামীজীর গম্ভীর ভাব দেখে কোন প্রশ্ন ক'রতে সাহস করলেন না।...

শারীরিক অসুস্থতার জন্য স্বামীজীর আহারের পৃথক ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সে দিন তিনি সকলের সঙ্গে ব'সে আনন্দ ক'রে খেলেন, এবং ব'লেছিলেন, শরীর বেশ সুস্থ আছে। আহারের পর একটু বিশ্রাম ক'রেই ১টার সময় ব্রহ্মচারীদের ব্যাকরণ পড়াতে বসলেন এবং একটানা তিনঘন্টা ধ'রে পড়ালেন। বিকালে স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে বেলুড় বাজার পর্যন্ত বেড়িয়ে এলেন। ব'ললেন, শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ ক'রছেন। বেদবিদ্যালয়-স্থাপন সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হ'ল। প্রেমানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, "বেদপাঠে কি উপকার হবে?" স্বামীজী বললেন, "ওতে আর কিছু না হোক, কুসংস্কার-গুলো তো দূর হ'বে?"

সন্ধ্যার পূর্বে মঠে ফিরে এসে স্বামীজী সকলের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা ব'ললেন। সন্ধ্যা সাতটা। আরাত্রিকের ঘণ্টা বেজেছে। স্বামীজী দ্বিতলে নিজের ঘরে গিয়ে গঙ্গার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালেন। সামনে গঙ্গার অপর পারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহ যেখানে দাহ করা হ'য়েছিল সেই শ্মশান। সেবক ব্রহ্মচারীকে বাইরে ব'সে জপ ক'রতে ব'লে নিজে জপমালা হাতে নিয়ে পূর্ব মুখে জপে বসলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ব্রহ্মচারীকে ডেকে ঘরের দরজা জানালা খুলে দিয়ে তাঁর মাথায় বাতাস ক'রতে বললেন। তিনি জপের মালা হাতে নিয়ে বাঁ পাশ ফিরে শুলেন। মনে হ'ল, তিনি ধ্যানমগ্ন হয়েছেন। ঘণ্টাখানেক পরে তিনি পাশ ফিরলেন—তখনও হাতে জপমালা। একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। একটু অস্ফুট করুণ শব্দ হ'ল, হাতটি কেঁপে উঠল। আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটি হেলে পড়ল।

একপাশে।...ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ—মুখে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ। তখন রাত্রি ৯টা ১০ মিনিট। *

সেবক ব্রহ্মচারী ছুটে নীচে গেল সকলকে খবর দিতে। সবেমাত্র প্রসাদ পাবার ঘণ্টা পড়েছে। তাড়াতাড়ি এলেন সকলে। নাড়ী পাওয়া গেল না। শ্রীরামকৃষ্ণের নামকীর্তন হ'তে লাগল। গঙ্গার ওপারে ডাক্তার ডাকতে পাঠান হ'ল। কলিকাতায়ও খবর দেওয়া হ'ল গুরুভাইদের।

রাত্রি সাড়ে দশটার পর ডাক্তার এসে নানা কৃত্রিম উপায়ে চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা ক'রলেন। কিন্তু কিছুই ফল হ'ল না। মধ্যরাত্রির পর ডাক্তার বললেন, স্বামীজী মহাসমাধি লাভ করেছেন।...

সকালে মঠে বহু লোকের সমাগম হয়েছে। দলে দলে নরনারী আসছে স্বামীজীর শেষদর্শনলাভের জন্য।...বেলা দু'টার পরে স্বামীজীর পূত দেহ খাটে ক'রে নীচে নামানো হ'ল। শেষকৃত্যাদি সমাপনান্তে স্বামীজীর দেহ নব গৈরিক বস্ত্র ও পুষ্পমাল্যাদিতে ভূষিত ক'রে শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে ধূপ ধুনা দ্বারা আরাত্রিক করা হ'ল। গুরুভ্রাতৃগণ, সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী শিষ্যবৃন্দ এবং ভক্ত নরনারী স্বামীজীকে প্রদক্ষিণ ক'রে তাঁর পাদপূজা ক'রলেন। অনন্তর শ্রীগুরুমহারাজ ও স্বামীজীর জয়ধ্বনি সহ শোভাযাত্রা ক'রে স্বামীজীর দেহ আনা হ'ল মঠের দক্ষিণপূর্ব কোনে বিল্ববৃক্ষের পাশে

* স্বামী সারদানন্দ ২৪শে জুলাই (১৯০২) তারিখে সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ডাঃ লোগনকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে দেখা যায়, স্বামীজী ৪ঠা জুলাই, শুক্রবার রাত্রি ৯টা ১০ মিঃ-এর সময় দেহত্যাগ করেন। (মায়াবতী, অদ্বৈতাশ্রম-প্রকাশিত স্বামীজীর ইংরাজী জীবনী—চতুর্থ সংস্করণ ৭৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

এবং তাঁরই নির্দিষ্ট স্থানে গঙ্গাতীরে চন্দনকাষ্ঠাদি দ্বারা চিতাশয্যা রচিত হ'ল। বেদ মন্ত্রপাঠ ও স্তবাদি গানের মধ্যে সমাপ্ত হ'ল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। *

বিবেকানন্দের আত্মা দেহ-পিঞ্জর-মুক্ত হ'য়ে মিলেছে অসীমের সঙ্গে। তিনি জগতের জন্য রেখে গিয়েছেন বেদান্তের বাণী—মানবত্মার অমরত্ব ও একত্বের বাণী।

ভারতবাসীকে তিনি বলেছেন, "হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী; ভুলিওনা—তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিওনা—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হ'তেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত,...ভুলিও না—নীচজাতি মুর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের

* ১৯০২, ৪ঠা জুলাই শুক্রবার স্বামীজী শরীর ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স ৩৯ বৎসর ৫ মাস ২৩ দিন। তিনি ঢাকাতে বলেছিলেন, "আর বড় জোর এক বৎসর আছি।" অন্য সময়ে বলেছেন, "আমি চল্লিশ পেরুচ্ছি না।" ৬অমরনাথ তাঁকে ইচ্ছামৃত্যুবর দিয়েছিলেন।

পরদিন স্বামীজীর দেহের ভস্মাস্থি রক্ষিত হল ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য। ঐ ভস্মাস্থি বেলুড় মঠে নিত্য পূজা করা হয়। স্বামীজীর চিতাশয্যার উপরেই তাঁর সমাধি-মন্দির নির্মিত হয়েছে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে সেই রাত্রে ধ্যানকালে স্বামীজীর পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলেন, "শশী শশী, আমি শরীরটা থুতুর মত ফেলে দিয়েছি।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সেই রাত্রে এলাহাবাদে ব্রহ্মবাদিন ক্লাবের ঠাকুর ঘরে বসে ধ্যান করছেন। ধ্যানে তাঁর দর্শন হ'ল—ঠাকুরের কোলে স্বামীজী বসে আছেন। ..পরদিন তার-যোগে বেলুড় মঠ হ'তে স্বামীজীর দেহত্যাগের খবর পেয়ে বুঝতে পারলেন ঐ দর্শনের অর্থ।

দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিনরাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥১

মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥২

মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ। অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥৩

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥৪

ঋগ্বেদ ১।৯০।৬-৯

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বামীজীর জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনা-পঞ্জী

১৮৬৩, ১২ই জানুআরি (১২৬৯, ২৯শে পৌষ), পৌষ-সংক্রান্তি, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি, সোমবার সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে (৬টা ৪৯ মিঃ-এ) জন্ম।

১৮৮১, নভেম্বর মাসে সিমুলিয়া পল্লীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দর্শন।

১৮৮১, পৌষ মাসে কোন একদিন রামচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে গাড়ী ক'রে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণতলে আগমন।

১৮৮৪, প্রারম্ভে বি-এ পরীক্ষার স্বল্পকাল পরেই স্বামীজীর পিতৃবিয়োগ।

১৮৮৫, ১১ই ডিসেম্বর কণ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে আগমন। গুরুসেবায় স্বামীজীর আত্মনিয়োগ।

১৮৮৬, ১৬ই আগষ্ট (৩১শে শ্রাবণ, ঝুলনপূর্ণিমার রাত্রে) ১টা ৬ মিঃ-এ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধি লাভ।

১৮৮৬, বড়দিনের সময় যুবক ভক্তদের কয়েকজনকে নিয়ে আঁটপুরে বাবুরামের বাড়ীতে গমন এবং সঙ্ঘবদ্ধ হবার-সংকল্প গ্রহণ।

১৮৮৭, জানুআরি মাসের কোন সময়ে বরাহনগর মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ।

১৮৮৮, বরাহনগর মঠ হ'তে পরিব্রাজকরূপে নিষ্ক্রমণ। কাশী অযোধ্যা আগ্রা বৃন্দাবন হাতরাস হৃষিকেশ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে কয়েক মাস প্রব্রজ্যায় কাটিয়ে বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন।

১৮৯০, জানুআরি মাসে পুনরায় প্রব্রজ্যায় নিষ্ক্রমণ এবং প্রায় চার মাস পরে প্রত্যাবর্তন করেন বরাহনগর মঠে।

১৮৯০, জুলাই মাসে স্বামীজী বরাহনগর মঠ হ'তে দীর্ঘ প্রব্রজ্যায় বহির্গত হ'লেন এবং হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন তীর্থে, বিভিন্ন স্থানে নিঃসম্বল অবস্থায় পরিভ্রমণ করেন।

১৮৯৩, ৩১শে মে বোম্বাই হ'তে জাহাজে আমেরিকায় ধর্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য যাত্রা।

১৮৯৩, ১৬ই জুলাই, প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম ক'রে কানাডা রাজ্যের বঙ্কুবর বন্দরে অবতরণ ক'রে ট্রেনে শিকাগো উপনীত হন।

১৮৯৩, ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার ধর্মমহাসভার উদ্বোধন হয় এবং স্বামীজী তথায় বক্তৃতা করেন। ২৭শে পর্যন্ত ঐ ধর্মসম্মেলন চলেছিল। তিনি বিভিন্ন দিনে বারটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঐ সম্মেলনের পরে স্বামীজী আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ ক'রে বহু বক্তৃতা দেন।

১৮৯৫, আগষ্টের গোড়ার দিকে আমেরিকা হ'তে বেদান্ত প্রচারের জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। এবং প্রায় তিন মাস কাল বিভিন্ন স্থানে বহু বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

১৮৯৫, শেষের দিকে ইংলণ্ড হ'তে আমেরিকা যাত্রা করেন। এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে নিউয়িয়র্কে বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন ক'রে নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানে পুনরায় তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ হয়।

১৮৯৬, ১৫ই এপ্রিল নিউইয়র্ক হ'তে দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড-যাত্রা। এবং ৪ মাস বেদান্তপ্রচারের পরে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ ক'রে পুনরায় ইংলণ্ডে প্রায় তিন মাস বক্তৃতাদি প্রদান।

১৮৯৬, ২৮শে মে প্রফেসার ম্যাক্সমূলারের সহিত সাক্ষাৎ।

১৮৯৬, ১৬ই ডিসেম্বর লণ্ডন ত্যাগ এবং ৩০শে ডিসেম্বর নেপলস্ হ'তে জাহাজে ভারত-অভিমুখে যাত্রা।

১৮৯৭, ১৫ই জানুআরি কলম্বোতে অবতরণ। বিপুল সম্বর্ধনা।

১৮৯৭, ৬ই ফেব্রুয়ারী—মাদ্রাজে আগমন। অগ্নিময়ী বক্তৃতা প্রদান।

১৮৯৭, ২০শে ফেব্রুয়ারী জাহাজে ক'রে খিদিরপুর তথা কলিকাতায় পদার্পণ। ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিরাট অভিনন্দন।

১৮৯৭, ১লা মে জগতের কল্যাণের জন্য 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা।

১৮৯৭, ৬ই মে আলমোড়া যাত্রা। হিমালয়ে মঠ-স্থাপনের আয়োজন।

১৮৯৭, ৯ই আগষ্ট আলমোড়া ত্যাগ ক'রে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব ও কাশ্মীর সফরে যাত্রা। বিভিন্ন স্থানে ৫ মাস কাল বক্তৃতা প্রদান।

১৮৯৮, ৩রা ফেব্রুয়ারী বেলুড়ে গঙ্গার পশ্চিম তীরে মঠের জন্য জমি ক্রয়।

১৮৯৮, ৩০শে মার্চ গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের নিয়ে দার্জিলিং যাত্রা করেন।

১৮৯৮, ১১ই মে দ্বিতীয়বার আলমোড়া যাত্রা। ১০ই জুন আলমোড়া হ'তে পাশ্চাত্য শিষ্যাদের নিয়ে কাশ্মীর যাত্রা—৺অমরনাথ দর্শন, ৺ক্ষীরভবানীতে দৈববাণী শ্রবণ।

১৮৯৮, ১৩ই নভেম্বর ৺কালীপূজার দিনে বাগবাজারে 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা। স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তন।

১৮৯৮, ৯ই ডিসেম্বর বেলুড়ে নূতন জমিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজানুষ্ঠানের পরে বেলুড়মঠ স্থাপন।

১৮৯৯, ২রা জানুআরি নীলাম্বর বাবুর বাগান-বাড়ী হ'তে নূতন মঠ-বাড়ীতে স্থায়ীভাবে মঠ স্থানান্তরিত হয়।

১৮৯৯, ২০শে জুন কলিকাতা হ'তে জাহাজে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে-গমন। ৩১শে জুলাই লণ্ডনে অবতরণ এবং ১৬ই আগাষ্ট আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা।

১৯০০, ২০শে জুলাই আমেরিকা ত্যাগ ক'রে ইউরোপ যাত্রা, এবং প্যারিসে বৃহৎ ধর্মেতিহাস-সম্মেলনে যোগদান ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থান দর্শনানন্তর ভারত-যাত্রা। ১৯০০, ৯ই ডিসেম্বর রাত্রে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন।

১৯০০, ২৭শে ডিসেম্বর মায়াবতী যাত্রা, ১৫ দিন মায়াবতী বাসের পর ২৪শে জানুআরি (১৯০১) মায়াবতী হ'তে বেলুড়মঠে পুনরাগমন।

১৯০০, ১৮ই মার্চ পূর্ববঙ্গ-যাত্রা। ঢাকা ৺চন্দ্রনাথ তীর্থ, ৺কামাখ্যা ও শিলং-সফর শেষ ক'রে মে মাসের মধ্যভাগে বেলুড় মঠে আগমন।

১৯০১, অক্টোবর মাসে বেলুড় মঠে প্রতিমায় ৺দুর্গা দেবীর আরাধনা, ৺লক্ষ্মীপূজা ও ৺কালীপূজা সমাপন।

১৯০২, জানুআরি মাসে বোধগয়া দর্শন ক'রে কাশীধামে আগমন। ১৯০২ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের পূর্বে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন।

১৯০২, ৪ঠা জুলাই শুক্রবার রাত্রি ৯টা ১০ মিনিটের সময় স্বামীজী মহা-সমাধি লাভ করেন।

এ গ্রন্থপ্রণয়নে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছি।

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (শ্রীম কথিত) বিবিধ খণ্ড।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ)

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত।

৩। পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

৪। ভারতে বিবেকানন্দ (উদ্বোধন কার্যালয়-প্রকাশিত)।

৫। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা (স্বামী বিবেকানন্দ-জীবনী-অংশ)

স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত।

৬। The Master as I saw Him, By Sister Nivedita.

৭। The life of Vivekananda and the Universal Gospel,

By Romain Rolland.

৮। The life of Swami Vivekananda (in one vol.)

By His Eastern and Western Disciples.

Published by, Advaita Ashrama, Mayavati.

৯। স্বামী বিবেকানন্দ, দুই খণ্ডে—শ্রীপ্রমথনাথ বসু প্রণীত।

১০। পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, ভাববার কথা—

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত।

এ ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন-প্রকাশিত অন্যান্য বহু গ্রন্থের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে।